বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

নিরাপদ কারাগার

দুইখন্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শুভম

SUVOM

বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

নিরাপদ কারাগার

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

আশ্চর্য এক লোক এই সালভাদর মারানজানা।
এমন মানুষ জীবনে দেখেনি রানা।
মাফিয়া-চীফ হিসেবে যেমন তার নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই,
তেমনি মৃতা স্ত্রীর আগের ঘরের ছেলের প্রতি
তার মমতা ও দুর্বলতারও বুঝি তুলনা হয় না।
রানাকে ধরে এনেছে সিসিলিতে, যেমন করে হোক
ইসরায়েলী কারাগার থেকে উদ্ধার করে
নিয়ে আসতে হবে তার ছেলেকে।
নইলে?
নইলে পাহাড়ের ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে
কয়েকশো ফুট নিচে ফেলে দেয়া হবে
রানার একান্ত প্রিয় জন্মান্ধ এক মেয়েকে।
বাধ্য হয়ে রাজি হলো রানা। কিন্তু মনে মনে ও
কি প্রতিজ্ঞা নিল, তা জানল না কেউ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SUVOM

মাসুদ রানা

নিরাপদ কারাগার

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 7099 2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২
পঞ্চম প্রকাশ: ১৯৯৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
NIRAPAD KARAGAR
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

বত্রিশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

নিরাপদ কারাগার-১ ৫—৯৪
নিরাপদ কারাগার-২ ৯৫—১৮৪

Rana- 99,100

নিরাপদ কারাগার

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীল ছবি প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা হংকং সম্রাট*কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয় শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা রোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী*দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ* নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

নিরাপদ কারাগার-১

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২

এক

স্পেন। কেপ ডি গাটার কাছে বিশাল এক জলাভূমি। পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা।

চারদিকে দু'দশ মাইলের মধ্যে কোথাও জন বসতির চিহ্ন নেই। গোটা এলাকার ওপর থকথকে কাদা আর পানি, তার ওপর নলখাগড়ার ঝোপ আর মাথা সমান লম্বা ঘাসের বন। শুকনো ডাঙা বলতে কদাচ দেখা যায় ছোট পরিখা বা বিলের পাড়, কোন কোনটা কাশবন দিয়ে ঘেরা, এবং সারি সারি মাটির ঢিবি। জলার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে উঁচু-নিচু একটা মেঠো পথ, কাঁকর বিছানো, কোথাও জলমগ্ন, কোথাও শুকনো খটখটে। বিলের পাড়গুলো পিকনিক স্পট হিসেবে বেশ জনপ্রিয়, কিন্তু পিকনিকের মৌসুম এখনও শুরু হয়নি। গোটা জলাভূমিই এখন পানি আর পাখির দখলে। হাজার হাজার ফ্লেমিঙ্গো, পানকৌড়ি, বুনো আর বেলেহাঁসে গিজগিজ করছে।

ফিরতে দেরি হচ্ছে লিলি আলবিনোর, পরিখার পাড়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল রানা। অকস্মাৎ একটা মৃদু ঝাঁকি। ফুটো হয়ে গেল ওর হান্টিং জ্যাকেটের ডান আস্তিন। লাফ দিয়ে ছয় ফিট শূন্যে উঠল থার্মোস ফ্লাস্ক। ওর ডান গোড়ালিতে এক দলা কাদা ছিটিয়ে দিল তিন নম্বর বুলেট। অবশ্য তার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেছে ওর শরীরে। পরিখার ভেতর নলখাগড়ার ঝোপ, নিরাপদ আশ্রয়, ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে তার ভেতর মাথা দিয়ে পড়ল ও।

আস্তে করে ঘোলা পানির ওপর মাথা তুলল রানা। নিচের কালো কাদার ভেতর ডেবে যাচ্ছে পা দুটো। কাঁধ আর গলা পানির নিচে, চারদিকে তাকিয়ে দিশেহারা ভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করল ও।

জ্যান্ত হয়ে উঠেছে গোটা বিল—পাখা ঝাপটে ঘাসবন থেকে উঠে এসেছে সচকিত বুনো হাঁসেরা, রাগী কর্কশ স্বরে ডাকছে। বালিয়াড়ির ওপার থেকে একযোগে আকাশে উঠেছে হাজার হাজার ফ্লেমিঙ্গো পাখি, তাদের পাখা ঝাপটাবার শব্দে আকাশ-বাতাস মুখরিত।

কে হতে পারে লোকটা? ভাবল রানা। ছুটি কাটাতে এসে একই জায়গায় বেশ কয়েক দিন ধরে রয়েছে ও, খবর পেয়ে উ সেনের কোন কর্সিকান ভক্ত প্রতিশোধ নেবার জন্যে স্নাইপার পাঠিয়েছে? নাকি কোসা নোস্ট্রার ষড়যন্ত্র? কিংবা মাফিয়া নয়তো? অপেক্ষা করছে রানা, কিন্তু ওই তরফ থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার শান্ত হয়ে এল জলাভূমি।

ওর নাকের কাছ থেকে তিন ফিট সামনে, পরিখার কিনারায় ফুটো হয়ে যাওয়া

থার্মোস ফ্লাস্কটা পড়ে রয়েছে, ফুটো থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে ধূমায়িত কফি, বাকি সব কিছু শান্ত এবং স্বাভাবিক। খোলা পিকনিক বাস্কেট, মাটিতে নিভাঁজ করে বিছানো সাদা চাদর, সালাদ, স্যান্ডউইচ, ঠাণ্ডা চিকেন রোস্ট, কোকাকোলার বোতল, যেটা রানা এই মাত্র খুলেছে, এবং লিলি আলবিনোর ইজেল, যাতে ওয়াটার কালারের কাজটা মাত্র অর্ধেক শেষ করেছে লিলি—সব যেমন ছিল তেমনি আছে। বিশ কি বাইশ ফিট দূরে, পরিখার উঁচু পাড়ের ওপর, রঙের খালি কৌটার পাশে সতরঞ্জির ওপর পড়ে রয়েছে কার্টিস ব্রাউন ডাবল ব্যারেল সিক্সটিন বোর শটগান। কিন্তু বুনো হাঁস মারতে ভাল্লুক মারার টোটা আনেনি রানা।

তবু নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। স্যাঁৎ করে ছুটে গিয়ে ওটা উদ্ধার করে নিয়ে আসার সম্ভাবনা যাচাই করল ও। বিপদের আশঙ্কা আছে, কিন্তু একেবারে নিরস্ত্র থাকার চেয়ে একটা ঝুঁকি নিয়ে দেখা যেতে পারে। সতর্কতার সাথে সামনের নলখাগড়ার ঝোপ সামান্য একটু ফাঁক করে এগোতে যাবে, এই সময় আবার গুলি। শটগানের স্টকে নিটোল একটা ফুটো তৈরি করল বুলেট। আওয়াজ শুনে আগেই বুঝতে পেরেছে রানা, এটা একটা থ্রী-নট-থ্রী নাম্বার ফোর মার্ক ওয়ান লী এনফিল্ড সার্ভিস রাইফেল, মান উন্নত করার পর ইদানীং আবার ব্রিটিশ আর্মির স্নাইপার এবং ইরা (আই. আর. এ.) অপারেটররা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। সন্দেহ নেই, একজন এক্সপার্টের হাতে রয়েছে রাইফেলটা। সন্তর্পণে নলখাগড়ার ঝোপের ভেতর আরও ঢুকে এল রানা। এখন শুধু অপেক্ষা, কারণ পরবর্তী পদক্ষেপ স্নাইপার লোকটাকেই নিতে হবে।

নিজের জন্যে যতটা না তার চেয়ে লিলির জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে রানার। ছবি আঁকার মাঝখানে রঙ শেষ হয়ে যাওয়ায় বাংলোয় ফিরে গেছে সে, রঙ নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফেরার কথা তার। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। ফেরার সময় পাঁচ মিনিট আগেই পেরিয়ে গেছে। যে-কোন মুহূর্তে রাস্তায় দেখা যেতে পারে ল্যান্ডরোভার। কি করবে তখন লোকটা? লিলিকেও গুলি করবে?

একটু মাথা তুলে চারদিকে তাকাল আবার। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই। এমন কি সার সার ঢিবির ধারে, অগভীর পানিতে ফিরে এসেছে ফ্লেমিঙ্গোরাও। লম্বা গলার এক ঝাঁক হাঁস, ইংরেজী ভি অক্ষরের মত একটা মালা তৈরি করে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। তাদের ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল। ঘাসের ডগায় বাতাস লাগায় মৃদু খস খস একটা আওয়াজ হচ্ছে। তাছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ বা নড়াচড়া নেই।

দূরে কোথাও গুড়ু গুড়ু মেঘ ডাকল একটু। আশ্চর্য হলো না রানা, সেই সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ আর ঘাম ঝরানো গরম লক্ষ্য করে বৃষ্টি আশা করছে ও।

ওর ডান দিকে, চল্লিশ কি পঞ্চাশ গজ দূরে, হঠাৎ দুলে উঠল ঘাসবন, ঝটপট ঝটপট পাখা ঝাপটে, সেই সাথে তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে বুনো একটা হাঁস লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শূন্যে। তার মানে, যতটা আন্দাজ করেছিল ও, তার চেয়ে কাছে রয়েছে লোকটা। দুঃসংবাদ, সন্দেহ নেই। তবে, সান্ত্বনা এইটুকু যে ওর বাঁ দিকের রাস্তা ধরে ফিরে আসবে লিলি। বাঁ দিক থেকে এসে, পরিখার কিনারা ঘেঁষে ডান দিকে খানিকদূর গিয়ে আবার বেঁকে অন্য দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। লোকটাকে

জলাভূমি ত্যাগ করতে হলে হয় পিছিয়ে গিয়ে ডান দিকের রাস্তায় উঠতে হবে, নয়তো পরিখার অর্থাৎ রানার সামনে দিয়ে এগোতে হবে। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মাথাটা আরও একটু তুলল রানা, কান দুটো সজাগ। দূর থেকে ভেসে আসা একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল ও।

ডান দিক থেকে বাঁ দিকে তাকাতেই জলমগ্ন রাস্তার ওপর ল্যান্ডরোভারটাকে দেখতে পেল রানা। হুইলের সামনে বসে রয়েছে লিলি। পানি থেকে উঠে এল গাড়ি, সোজা এগিয়ে আসছে লম্বা পরিখার কিনারা ঘেঁষে। নিশ্চয়ই গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে স্নাইপার, কাজেই সুযোগটা নিল রানা। নলখাগড়ার ঝোপ থেকে বেরিয়ে এক লাফে তীরে উঠে ছুটল ও, ছোঁ দিয়ে তুলে নিল শটগান, আবার ছুটতে শুরু করে হাত নাড়ল লিলিকে উদ্দেশ্য করে—প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে এই বুঝি ধাক্কা দিল বুলেট!

সত্যি বড় বিচিত্র ব্যাপার। ওর শরীরের বাঁ দিকে খানিকটা কাদা ছুঁড়ে দিল একটা বুলেট, দ্বিতীয় বুলেটটা ডান দিকের হাঁটুতে কাদা লেপে দিল। পলকের জন্যে লিলির মুখটা দেখতে পেল ও, চোখ দুটো বিস্ফারিত, চেহারায় হতভম্ব ভাব, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড় করাল গাড়ি। এমনি সময় ছুটে এল তৃতীয় বুলেট, ফুটো করে দিল উইন্ডস্ক্রীন।

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল লিলি। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। তার পিছনে, গাড়ির ডোর প্যানেলে এসে লাগল আরও একটা বুলেট। খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলল রানা, পরিখার কিনারা থেকে তাকে নিয়েই লাফ দিল নিচের লম্বা ঘাস আর নলখাগড়া লক্ষ্য করে। দু'জনেই তলিয়ে গেল পানির নিচে, তারপর মাথা তুলল পানির ওপর। আরও একটা বুলেট ছুটে এসে লাগল গাড়ির গায়ে। রানাকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে লিলি, ভিজে চুলগুলো লেপ্টে গেছে মুখের সাথে।

থরথর করে কাঁপছে লিলি। রানার জ্যাকেটের সামনেটা মুঠো করে চেপে ধরল সে। 'রানা! এসব কি ঘটছে!'

লিলির হাত ধরে নলখাগড়ার ভেতর আগের জায়গায় ফিরে এল রানা। মাথার ওপর দিয়ে, ঝোপের ডগা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল আরও একটা বুলেট, সাথে সাথে মাথা নিচু করে নিল লিলি। তারপর আবার পানির ওপর মাথা তুলল সে, পচা লতাপাতায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে সুন্দর মুখ। পকেট থেকে একজোড়া ওয়াটারপ্রুফ কার্টিজ বের করে শটগানটা লোড করল রানা।

'হাতের টিপটা বড় সুন্দর ওর, তাই না?'

'ফর গডস সেক, রানা!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লিলি, 'এসবের অর্থ কি? কে ও? তোমাকে...'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল রানা। 'দিলে তো বিপদে ফেলে! এমন একটা প্রশ্ন করলে, যার উত্তর আমার জানা নেই। লোকটা প্রফেশন্যাল, এইটুকু বলতে পারি। কিন্তু মজার কথা কি জানো, লোকটা ইচ্ছে করলে এর মধ্যে আট দশ বার খুন করতে পারত আমাকে, কিন্তু করেনি! কেন বলতে পারো?' লিলির চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস লক্ষ্য করে হাসল রানা। 'কঠিন প্রশ্ন। এর উত্তরও আমার জানা

নেই।'

এমন ভাবে হাঁ করে তাকিয়ে আছে লিলি, রানা যেন মঙ্গলগ্রহের মানুষ, এই প্রথম দেখছে তাকে। বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো। তার সুরেলা কণ্ঠস্বর বিকৃত, কর্কশ শোনাল কানে, 'তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, রানা! লোকটা তোমাকে খুন করার চেষ্টা করছে, অথচ তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বেশ উপভোগ করছ ব্যাপারটা!'

'সারাটা বিকেল বোর ফিল করেছি আমরা, অস্বীকার করতে পারো?'

আবার গুলি হলো। ইজেলের ডান পায়াটা দু'টুকরো হয়ে গেল মাঝখান থেকে, পরিখার ভেতর পানিতে পড়ে গেল সেটা।

'শালা শিল্প বোঝে না,' বলল রানা। 'পেইন্টিংটা আমার ভারি পছন্দ হয়েছিল। শেষ হলে একটা দেখার মত জিনিস হত। ব্যাকগ্রাউন্ডে যেভাবে ব্লু ছড়াচ্ছিলে, চোখ জুড়ানো···'

ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল লিলি, আতঙ্কে নীল হয়ে আছে মুখ, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে। 'প্লীজ, রানা! কিছু একটা করো! আমার ভয় করছে!'

খুদে বোমার মত বিস্ফোরিত হলো কোকাকোলার বোতলটা, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচের টুকরো, কালচে দাগ ফুটল সাদা চাদরে।

'উঁহুঁ, এটা খারাপ! মেনে নেয়া যায় না!' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'মাত্র দুটো বোতল, আমার ভাগেরটাই ভেঙে দিল ব্যাটা! দেখো, কেমন অবাক করে দিই তোমাকে। নাও, ধরো এটা।'

লিলির হাতে শটগানটা ধরিয়ে দিয়ে গা থেকে হান্টিং জ্যাকেট খুলে ফেলল রানা।

একটা ঢোক গিলল লিলি, চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'কি করতে চাও?'

বলল রানা। শুনে আগের চেয়ে একটু শান্ত হলো লিলি। কিন্তু এখনও সে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। তার নাকের পাশে একটা চুমু খেয়ে অভয় দিল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'যা বললাম করতে পারবে তো?'

'বোধহয়···,' ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠল পরমুহূর্তে, '···পারব।'

শটগানের মাজলে জ্যাকেটটা পরিয়ে নিল রানা, তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে ঝোপের ওপর তুলল সেটা। সাথে সাথে গুলি হলো। শটগানের মাজল থেকে জ্যাকেটটাকে ছিনিয়ে নিল বুলেট। এক সেকেন্ড পর যন্ত্রণা কাতর আর্তনাদ করে উঠল রানা।

ঝট্ করে লিলির দিকে ফিরল ও। ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে আধ কোমর নোংরা পানিতে দাঁড়িয়ে আছে সে। ফিসফিস করে বলল রানা, 'ইয়েস!'

চিৎকার করে উঠল লিলি, পড়িমরি করে ঢাল বেয়ে উঠে পড়ল পরিখার কিনারায়, হোঁচট খেল, আবার উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল ল্যান্ডরোভারের দিকে। আবার গুলি। লিলির কয়েক ফিট সামনে লাফিয়ে উঠল একটা নুড়ি পাথর, চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল লিলি, হু হু করে কেঁদে ফেলল। রানার বেশ কিছুটা ডান দিকে, ঝোপের ভেতর কি যেন নড়ে উঠল, কয়েক সেকেন্ড পর পরিখার কিনারায়, কাঁকর বিছানো পথে বুট জুতোর আওয়াজ। চট্ করে জ্যাকেট পরে নিল রানা।

'কি হলো?' ফরাসী ভাষায় জানতে চাইল লোকটা। এগিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ।

ঝোপের ভেতর কাদা-পানিতে কাত হয়ে পড়ে আছে রানা। একটা চোখ খোলা, নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে সামনের পথের ওপর। ওখান দিয়েই যেতে হবে লোকটাকে।

একটু পরই তাকে দেখতে পেল রানা। ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখটা সরু, বিশ বাইশ বছর বয়স, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। তাকিয়ে আছে পরিখার দিকে। পরনে রিফার জ্যাকেট, শরীরের পাশে ঝুলে থাকা বাঁ হাতে ধরা রয়েছে লী এনফিল্ড রাইফেলটা। সতর্কতার সাথে, চেহারায় উদ্বেগ আর অস্থিরতার ভাব নিয়ে এগোচ্ছিল, ঝোপের ভেতর রানাকে কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত হলো হাঁটার গতি। লিলির দিকে এগোল।

ঝোপের ভেতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রানা। কোনরকম ব্যস্ততা নেই, ধীরে ধীরে পরিখা থেকে উঠে এল ও। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে ওর, দু'হাত দিয়ে ধরে আছে শটগান, গুটি গুটি এগোচ্ছে। পরমুহূর্তে কি ঘটল বলতে পারবে না ও, হয় লিলির মুখের ভাব লক্ষ্য করে, অথবা শটগান কক করার ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেয়ে, স্থির হয়ে গেল যুবক।

ফরাসী ভাষায় বলল রানা, 'লক্ষ্মী ছেলের মত ছেড়ে দাও রাইফেলটা। তারপর ঘাড়ের পেছনে হাত তোলো।'

যুবকের ডান কাঁধ উঠতে শুরু করতেই বুঝল রানা, গুলি করতে যাচ্ছে ও। ব্যাপারটা দুঃখজনক বলে মনে হলো ওর। কোমরের কাছ থেকে গুলি করার জন্যে ঝুঁকে থাকা অবস্থায় ঘুরল যুবক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, আশা করল সুবুদ্ধির উদয় হবে। কিন্তু যখন দেখল রাইফেলের ট্রিগারের ওপর চেপে বসেছে আঙুল, আঙুলের ডগা সাদা হয়ে যাচ্ছে, তখন আর দেরি করল না, টিপে দিল দুটো ট্রিগারই।

ঘুরল যুবক, ঘুরেই দেখল, তার মুখের ওপর চলে এসেছে শটগানের ডাবল ব্যারেল। গুলি করল সে। প্রায় একই সাথে গর্জে উঠল রাইফেল এবং শটগান। জোড়া গুলির ধাক্কায় মাটি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল যুবক, পরিখার কিনারার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল নলখাগড়া আর ঘাসের ভেতর। রানার কানের পাশ ঘেঁষে ছুটে গেছে রাইফেলের বুলেট।

আবার জ্যান্ত এবং মুখর হয়ে উঠেছে জলাভূমি। আকাশ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে ঝাঁক ঝাঁক হাঁস আর পাখিতে। পাখা ঝাপটাবার শব্দে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। আগের সেই জায়গাতেই নিরেট পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে লিলি, মুখের চেহারা সাদা, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে লাশটার দিকে। একটা পা ছাড়া যুবকের গোটা শরীর ডুবে গেছে পানিতে।

অপ্রীতিকর একটা কাজ সারতে হবে এখন, তাই লিলির দিকে ফিরে বলল রানা, 'ল্যান্ডরোভারে উঠে বসো।'

চোখ ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল লিলি। বোকার মত তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড, যেন রানার কথা হয় শুনতে পায়নি, না হয় বুঝতে পারেনি। কিন্তু কথাটা

আবার যখন বলল রানা, দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে, অস্বাভাবিক জেদের সুরে বলল, 'না, তোমার সাথে থাকব আমি!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যা ভাল বোঝো!'

শটগানটা আবার লিলির হাতে ধরিয়ে দিল রানা। ঢাল বেয়ে নেমে গেল পরিখার ভেতর। হাঁটু সমান পানিতে দাঁড়িয়ে লাশের এক পা ধরে তুলে আনল উঁচু পাড়ে। নিজের অজান্তে আতঙ্কের একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল লিলির গলার ভেতর থেকে। যুবকের মুখের অবস্থা দেখে লিলিকে দোষ দিতে পারল না রানা। চোখ, নাক, কপাল নেই বললেই চলে। বীভৎস!

লাশের শরীর থেকে জ্যাকেট খুলে নিয়ে সেটা সার্চ করল রানা। ওর দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে মৃদু শিসের মত আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। সার্চ করতে বেশি সময় লাগল না, কারণ পকেটগুলোয় কিছুই নেই। পিছিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল ও।

'কে ও, রানা?'

'তা জানলে তো···'

'কিন্তু এসবের নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে!' রাগের সাথে বলল লিলি। 'লোকটা তোমাকে খুন করার চেষ্টা করছিল—কেন? কার কি করেছ তুমি?'

'দুঃখিত,' শান্তভাবে বলল রানা। 'হ্যাঁ, অর্থ নিশ্চয়ই একটা আছে, কিন্তু সেটা যে কি তা এই মুহূর্তে আমার জানা নেই। কার কি করেছি?' মাথাটা একদিকে একটু কাত করে স্মরণ করার ভান করল রানা। 'কই, কারও পাকা ধানে মই দিয়েছি বলে তো মনে পড়ছে না! বিশ্বাস করো, তুমি যেখানে আমিও সেখানে।'

'বাজে কথা!' আতঙ্ক কাটিয়ে উঠছে লিলি। গত পনেরো মিনিটের টেনশন তার ভেতর থেকে উথলে বেরিয়ে আসছে। জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটো, প্রায় রণরঙ্গিনী মূর্তি। 'আমি বিশ্বাস করি না! লোকটা যখন গুলি করছিল, তুমি একটুও ভয় পাওনি—কেন? মনে হলো,এ-ধরনের মারাত্মক পরিস্থিতিতে এর আগেও পড়েছ তুমি, এসব তোমার কাছে ডাল-ভাত!' শটগান ধরা হাতটা মাথার ওপর তুলে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'এটা যেভাবে ব্যবহার করলে, মনে হলো, তুমি একজন পাকা খুনী!' হাঁপাচ্ছে সে। 'এসবের অর্থ কি, রানা?'

তিক্ত একটু হাসল রানা। 'বুদ্ধিমতী! তোমার বিশ্লেষণে যুক্তি আছে, কিন্তু অন্য যুক্তি দিয়ে এটাকে আরেকভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। তোমাকে তো আমি বলেইছি, আমি একজন ট্যুরিস্ট, ছুটি কাটাতে এসেছি। খুনী-টুনী কিছু নই। ঘর থেকে বেরুলে বিপদ হতে পারে, তাই আত্মরক্ষার কিছু কৌশল রপ্ত করে নিয়েছি—এর ভেতর আর কিছু নেই।'

লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, কাঁধে তুলে নিল সেটা, তারপর উঠে দাঁড়াল।

দ্রুত জানতে চাইল লিলি, 'কি করবে ওকে নিয়ে? পুলিসে খবর দেবে না?'

'পুলিস?' হেসে উঠল রানা। 'পাগল হলে নাকি?'

ঝুঁকে পড়ে লী এনফিল্ড রাইফেলটা তুলে নিল রানা, পরিখার কিনারা ধরে ল্যান্ডরোভারের দিকে এগোল। ওর ডান দিকে লম্বা ঘাসের ভেতর খানিকটা ফাঁক

দেখা গেল, ঘন কালো দুর্গন্ধময় কাদা রয়েছে সেখানে। গভীরতা পাঁচ ফিটও হতে পারে, আবার পঞ্চাশ ফিট হওয়াও বিচিত্র নয়। উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে লাশটা ফেলে দিল সেই কাদায়। ধীরে ধীরে ডুবে গেল লাশ। দু'একটা বুদ্বুদ উঠল কি উঠল না, কিন্তু জলাভূমির গ্যাসের উৎকট ঝাঁঝ ঢুকল নাকে। লাশের দিকে লী এনফিল্ড রাইফেলটাও ছুঁড়ে দিল রানা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে লিলি, শটগানটা দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরা। চেহারায় বিহ্বল ভাব। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ড্রামের মত গুড় গুড় করে উঠল মেঘ। এবার মাথার ওপর। সেই সাথে ঝম ঝম করে নামল মুষলধারে বৃষ্টি।

বৃষ্টিটা যেন সুইচের কাজ করল, সাথে সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল লিলির শরীরে, রানার মাথার ওপর দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে ছুটে গেল শটগানটা। ঘাসবনে পড়ল সেটা। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল লিলি। থর থর করে কেঁপে উঠল তার পিঠ। এগিয়ে এসে তার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

'সব ঠিক আছে, লিলি,' নরম সুরে বলল ও। 'যা ঘটেছে ভুলে যাও। চলো, ফিরে যাই।'

এক হাতে লিলির কোমর পেঁচিয়ে ধরে ল্যান্ডরোভারের দিকে এগোল রানা।

ট্র্যানজিসটর অন করে মাদ্রিদ রেডিও ধরল রানা। গান-বাজনা নয়, লেকচার ঝাড়ছে, কাজেই সেট অফ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, ফ্লাস্ক থেকে কাপে কফি ঢেলে নিয়ে বেরিয়ে এল টেরেসে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি। ঝম ঝম শব্দকে চাপা দিয়ে গুরুগম্ভীর মেঘ ডাকছে মাঝে মধ্যে।

ঐতিহ্যবাহী স্পেনীয় প্যাটার্নে তৈরি এই ভিলা। বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে আর কোন বাড়িঘর বা জনবসতি নেই। নির্জন, নিরিবিলি পরিবেশ, সেজন্যেই ভিলাটা পছন্দ হয় রানার, কাজেই দু'মাসের জন্যে ভাড়া নিতে ইতস্তত করেনি ও। জায়গাটা আলমেরিয়া থেকে কেপ অফ গাটার দিকে যেতে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে। ঘোড়ার খুরের আকৃতি নিয়ে নিচে একটা ছোট বে রয়েছে, তার একশো ফিট ওপর পাথরের মাথায় এই ভিলা।

দুই মাসের ছুটির সাতাশ দিন পার করে দিয়েছে রানা। প্রায় রোজই সকাল সন্ধে এই টেরেসে বসে সূর্যের উদয়াস্ত দেখে ও, একঘেয়ে লাগে না। বে-র বাইরে আলো রয়েছে এখনও। খুব বেশি দূরে নয়, স্থানীয় জেলেদের নৌকোগুলো দেখা যাচ্ছে, জাল গুটিয়ে নিচ্ছে তারা। সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে, পাঁচ-সাত মাইল দূরে ভাল দৃষ্টি চলে না, কিন্তু আবছাভাবে দেখা গেলেও লাইনারটাকে চিনতে ভুল হলো না রানার। লাইনারের ওদিকেই মহাদেশ আফ্রিকা।

এই মুহূর্তে সতর্ক, সচেতন হয়ে আছে রানা। বিকেলের অপ্রত্যাশিত ঘটনাটাই এর জন্যে দায়ী। ছুটি কাটাতে এসে সত্যিই কি তাহলে কোন জটিল বিপদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে ও?

কোন আওয়াজ হয়নি, চোখের কোণ দিয়ে কিছু দেখতেও পায়নি রানা, তবু সন্দিগ্ধ মনের নির্দেশে ঘাড় ফেরাল ও। দেখল, ঘরের ভেতর থেকে এগিয়ে এসে

দোরগোড়ায় দাঁড়াল লিলি। কাঁচের দরজা খুলে তাকাল রানার চোখে। কাঁধে জড়ো হয়ে আছে ঘন কালো একরাশ চুল। পরনে লিনেনের একটা কাফতান, সেটা এতই লম্বা যে তার খালি পায়ের ওপর ঘষা খাচ্ছে। কফির কাপে একটা চুমুক দিল লিলি, কিন্তু চোখের দৃষ্টি স্থির, লক্ষ্য করছে রানাকে। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আবার বাইরের বৃষ্টি, সাগর এবং আবছা অন্ধকারের দিকে তাকাল রানা। অনুভব করল, পাশে এসে দাঁড়িয়েছে লিলি।

'তোমার রান্নার হাতটা দারুণ,' বলল রানা। 'স্বাদটা অনেক দিন লেগে থাকবে মুখে।' লিলির গলার দিকে চোখ পড়ল, একটু ঝুঁকে নকল হীরের নেকলেসটা দেখল ও। 'সুন্দর! কই, আগে তো এটা দেখিনি!'

'কাল আলমেরিয়ায় গেলাম না, জুয়েলারীর পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেয়ে কিনে নিলাম,' বলল লিলি। 'জালুচির পার্টিতে হারিয়ে যাওয়া হ্যান্ডব্যাগে ঠিক এই রকম একটা নকল হীরের নেকলেস ছিল কিনা!'

মৃদু শব্দে হেসে উঠল রানা। 'সেই চমৎকার সন্ধেটার কথা মনে করিয়ে দিলে তো!'

'ভেবে পাই না, সব কিছুতেই এত মজা কি করে পাও তুমি!' সাগরের দিকে পিছন ফিরে রেলিঙে ভর দিল লিলি। 'চমৎকার সন্ধে, তাই না? আমার বাইশ বছরের জীবনে এই রকম ডাহা মিথ্যে বলতে শুনিনি কাউকে।'

হাসতে গিয়েও, হঠাৎ নিকট অতীতের ঘটনাটা বিশদ মনে পড়ে যাওয়ায়, হাসির ভাবটুকু রানার চেহারা থেকে মুছে গেল।

সেই সন্ধ্যায় আলমেরিয়ার এক পার্টিতে প্রথম লিলিকে দেখে রানা। পার্টিটা ছিল এক ইতালিয়ান চলচ্চিত্র প্রযোজকের। লোকটা নাকি ওয়েস্টার্ন ধাঁচের একটা ছবি বানাবার কাজে হাত দিয়েছে। রানাকে পার্টিতে নিমন্ত্রণ করা হয়নি বটে, কিন্তু একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার, যার সাথে সী বীচের ধারে ছোট্ট একটা বারে পরিচয় হয়েছিল ওর, জোর-জার করে ওকে টেনে নিয়ে যায় ওখানে। স্ক্রিপ্ট রাইটার লোকটা খোশ-মেজাজী, কথায় কথায় অট্টহাসি ছাড়ে, দু'মিনিটেই অচেনা মানুষকে আপন করে নেবার অদ্ভুত গুণ আছে তার। অনেকটা গায়ে পড়েই রানার সাথে পরিচয় করে সে, এবং হঠাৎ একদিন কোথাও কিছু নেই, পার্টিতে যেতে হবে বলে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে বাধ্য করে ওকে। বিশেষ পার্টি, নিমন্ত্রিতরা ইচ্ছে করলে সাথে করে বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে যেতে পারে, যিনি পার্টি দেন তিনি অপরিচিত অতিথি দেখে আশ্চর্য হন না, কাজেই যেতে কোন বাধা ছিল না রানার।

কিন্তু পার্টিতে গিয়ে প্রথম থেকেই অস্বস্তি বোধ করছিল রানা। নিমন্ত্রিতরা প্রায় সবাই শো-বিজনেসের সাথে জড়িত—সুন্দর চেহারা, স্মার্ট, সুবেশ। কিন্তু কি এক অজানা কারণে রাতের ওই সময়েও প্রায় সবাই সান গ্লাস পরে ছিল। রূপসী মেয়েগুলো, দেখেই বোঝা যায়, সুখের পায়রা।

স্ক্রিপ্ট রাইটার লোকটা ওকে পার্টিতে নিয়ে এসে একটা মেয়ের সাথে কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল, পরে কোথাও আর তার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না রানা। অচেনা পরিবেশ, ভাল লাগছিল না ওর। ভাবছিল, রাইটারের জন্যে আরেকটু অপেক্ষা করে দেখবে, তাকে না পেলে কেটে পড়বে এক ফাঁকে।

অতিথিরা সবাই সবার সাথে কুশল বিনিময় করছে, নতুন যারা তারা পরিচিত হচ্ছে হোস্টের সাথে, কিন্তু হলরুমের এক কোণে সোফায় বসে আছে রানা, হোস্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে এমন কেউ নেই ওর। দু'একজন মুখে হাসি নিয়ে এক আধবার তাকাল ওর দিকে, কিন্তু ওর তরফ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে কেউ আর আগ্রহ দেখাল না।

হলরুমের একধারে বার, কাউন্টারের ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে সুদর্শন এক যুবক। রানা অনুমান করল, এই যুবকই বোধহয় ইতালিয়ান প্রযোজক, হোস্ট। যুবকের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সোনালী চুল, পরনে ধবধবে সাদা স্যুট। কেন যেন, চেহারাটা চেনা চেনা লাগল রানার। হয়তো সুন্দর সুপুরুষ অথচ চেহারায় মেয়েলি একটা লাজুক ভাব আছে বলেই। আজকাল আফটার শেভ অ্যাডভার্টাইজমেন্টে এ ধরনের পুরুষের ছবি প্রায়ই দেখা যায়।

রাইটারের জন্যে আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। ডিনারের সময় হয়ে এসেছে, পাশের কামরায় সাজানো হয়েছে ডিনার টেবিল, আর একটু পরই একসাথে বসবে সবাই, টেবিল ভর্তি অপরিচিত লোকের সাথে খেতে বসতে হলে অস্বস্তির আর সীমা থাকবে না। চারদিকে শেষ একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, কারও দিকে না তাকিয়ে এগোল দরজার দিকে।

ঠিক এই সময় উত্তেজিত চাপা একটা গুঞ্জন। ঘাড় ফেরাল রানা, দেখল, হলরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী এক মেয়ে, অস্থিরভাবে এদিক ওদিক, এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। মেয়েটার চেহারায় একাধারে বিস্ময়, অবিশ্বাস, এবং হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে। কয়েকটা মেয়ে এবং পুরুষ দ্রুত এগোল তার দিকে। তাদের একজনকে বলতে শুনল রানা, 'সেকি! কি বলছ! তোমার হ্যান্ডব্যাগ চুরি গেছে!'

কথাটা শুনে হলরুমের সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল জটলাটার দিকে। মেয়েটা একটা সোফা দেখাল, বলল, 'ওখানে বসেছিলাম আমি, হ্যান্ডব্যাগটা ছিল আমার পাশে—বারে যাব বলে উঠতে গিয়ে দেখি, নেই!' রানা এতক্ষণ যে সোফায় বসে ছিল, তার পাশের সোফাটা দেখাল মেয়েটা। রানার মনে পড়ল, মেয়েটাকে ওখানে বসে থাকতে দেখেছিল ও।

একজন মধ্য বয়স্ক লোক বলল, 'দেখো কোথাও হয়তো ভুল করে ফেলে রেখে এসেছ!'

'অসম্ভব!' সাথে সাথে প্রতিবাদ জানাল মেয়েটা। 'এক মিনিট আগেও আমার পাশে ছিল ওটা।' পাশে দাঁড়ানো একটা মেয়েকে দেখাল সে। 'ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না, হ্যান্ডব্যাগটা আমার হাতে দেখেছে কিনা!'

পাশের মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ, লাল রঙের হ্যান্ডব্যাগ—চামড়া দিয়ে তৈরি। তাজ্জব ব্যাপার! চোখের পলকে জিনিসটা গায়েব হয়ে গেল। ছি, ছি! নিশ্চয়ই কেউ সরিয়েছে!'

'এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা সবাই আমার মেহমান, কাজেই হুট্ করে কেউ এমন কিছু বোলো না যাতে তাঁদেরকে অসম্মান করা হয়,' বারের ওদিক থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল সোনালী চুলের যুবক, হোস্ট। লম্বা পা ফেলে দ্রুত

এগিয়ে এল সে জটলার দিকে। সোজা এগিয়ে এসে সুন্দরী মেয়েটার সামনে দাঁড়াল সে। 'ভাল করে শুনি ব্যাপারটা, বলো।'

ঘটনাটা আবার ব্যাখ্যা করল মেয়েটা। সবশেষে বলল, 'আমার ভুল হবার প্রশ্নই ওঠে না। এখানে আমার পাশে যে হ্যান্ডব্যাগটা ছিল তা অনেকেই দেখেছে।'

'তার মানেই, চুরি গেছে ওটা!' তিক্ত সুরে মন্তব্য করল পাশের মেয়েটা।

রাগে, অপমানে কালো হয়ে গেল হোস্টের চেহারা। কয়েক সেকেন্ড কথাই বলতে পারল না সে। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল, 'আমার অতিথিদের চোর বলে সন্দেহ করা হবে সেটা যেমন আমার অভিপ্রেত নয়, তেমনি আমার একজন অতিথির একটা জিনিস চুরি যাবে সেটাও আমি মেনে নিতে পারি না। এর একটা সুরাহা হওয়া দরকার।' চিন্তিত দেখাল তাকে, ভাবছে এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়।

মেহমানরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। প্রায় সবাই সবার পরিচিত হলেও, এই পরিস্থিতিতে কে কাকে সন্দেহ করছে বলা মুশকিল। ইতিমধ্যে হলরুমের চারদিকে তল্লাশী চালাবার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লাল হ্যান্ডব্যাগের কোন হদিস এখনও পাওয়া যায়নি।

নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথা বলছে সবাই। হঠাৎ রানা আবিষ্কার করল, হলরুমের ভেতর একমাত্র সে-ই শুধু একধারে একা দাঁড়িয়ে আছে, তার আশপাশে কোন লোকজন নেই। পরমুহূর্তে লক্ষ্য করল ও, ছোট ছোট অনেকগুলো জটলা থেকে কেউ কেউ আড়চোখে তাকাচ্ছে ওর দিকে, চোখাচোখি হলেই ফিরিয়ে নিচ্ছে দৃষ্টি। চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা। বোঝাই যায়, একধারে দাঁড়ানো লোকটাকে কেউ চেনে কিনা জিজ্ঞেস করছে পরস্পরকে।

সবাই যে রানার দিকে তাকাচ্ছে, সেটা সোনালী চুলের যুবক হোস্টেরও চোখে ধরা পড়ল। দূর থেকে সরাসরি রানার দিকে তাকাল সে। ধীরে ধীরে তার দুই ভুরুর মাঝখানে একটা ভাঁজ ফুটে উঠল। বোধহয় স্মরণ করার চেষ্টা করছে, রানাকে কোথাও দেখেছে কিনা। কিংবা, কেউ তার সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে কিনা। পাশে দাঁড়ানো দু'জন লোককে কি যেন জিজ্ঞেস করল সে। তারা একযোগে মাথা নাড়ল। যুবক হোস্টের চেহারায় চিন্তার ছাপ আরও গভীর হয়ে ফুটল। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানার দিকে এগোল সে। ইতিমধ্যে হলরুমের সবার দৃষ্টি এসে পড়েছে রানার ওপর। এই পার্টিতে সে-ই একমাত্র অচেনা অতিথি।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল যুবক। অত্যন্ত মার্জিত কণ্ঠে বলল, 'আমি জোসেফ জালুচি, আপনি···?'

'মাসুদ রানা।'

রানা আর কিছু বলল না দেখে যুবক জানতে চাইল, 'কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

হলরুমের ভেতর পিন-পতন নিস্তব্ধতা।

চেহারা থেকে অস্বস্তির ভাব গোপন করে রানা বলল, 'করুন।'

'আপনাকে বোধহয় আগে কোথাও দেখিনি আমি,' খানিক ইতস্তত করে বলল

জোসেফ জালুচি। 'এই পার্টিতে নিশ্চয়ই কেউ আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'একজন স্ক্রিপ্ট রাইটার, মিস্টার জন মারফি। কিন্তু আমাকে এখানে নিয়ে এসে কোথায় যে তিনি গেলেন···'

'জন মারফি?' ভুরু কুঁচকে উঠল জোসেফ জালুচির। 'এই নামের কাউকে তো আমি চিনি না!'

বিব্রত বোধ করল রানা। 'সেকি!'

রানাকে খুঁটিয়ে দেখল জোসেফ জালুচি। তারপর হলরুমের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'জন মারফি নামে কাউকে চেনেন কেউ? স্ক্রিপ্ট রাইটার।'

সবাই চুপ।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'লোকটা গায়েব হয়ে যাবার পর আমারও একটু সন্দেহ হয়েছে,' বলল ও। 'হয়তো আমার মত সে-ও নিমন্ত্রিত নয়। সেটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে ভেবেই কেটে পড়েছে।'

ইঙ্গিতে হলরুমের দরজাটা দেখিয়ে জোসেফ জালুচি একটু ভারী গলায় জানতে চাইল, আপনি বোধহয় চলে যাচ্ছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ—কাউকে চিনি না, অস্বস্তি বোধ করছিলাম, তাই···'

দু'একজন করে এগিয়ে এসে ওদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অতিথিরা। সবাই ওদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। সবার দৃষ্টি রানার ওপর। একজন বিদেশী লোক, লক্ষ্য করল সবাই। পার্টিতে আসার অজুহাত হিসেবে যা বলছে সেটা তেমন বিশ্বাস্য নয়।

খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল জোসেফ জালুচি, 'ট্যুরিস্ট?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে এসেছেন?'

'বাংলাদেশ।'

পিছনের জটলা থেকে কে যেন অস্ফুটে বলল, 'দুনিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ!'

সাথে সাথে অন্য একটা চাপা ধমকের সুর শোনা গেল, 'এই, চুপ!'

'আলমেরিয়ায় কোথায় উঠেছেন আপনি?' জানতে চাইল জোসেফ জালুচি। 'এখানে আপনার পরিচিত কেউ আছে কি?'

আলমেরিয়ায় রানার পরিচিত কেউ নেই, বিশেষ করে সেজন্যেই এখানে ছুটি কাটাতে আসা। চেনা জগৎ থেকে দূরে সরে এসে সময়টা নিরিবিলিতে কাটাতে না পারলে ছুটি উপভোগ্য হয় না। 'এখান থেকে মাইল ত্রিশেক দূরে,' গলার সুর শুনে বোঝা গেল, প্রশ্নটা করায় অসন্তুষ্ট হয়েছে রানা। 'একটা ভিলায় আছি। না, আলমেরিয়ায় আমার পরিচিত কেউ নেই, কিন্তু জানতে পারি এসব প্রশ্ন কেন···?'

রানাকে বাধা দিয়ে জোসেফ জালুচি রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'আপনি কিছু মনে না করলে আপনাকে আমরা একটু সার্চ করে দেখতে চাই।'

সাথে সাথে জবাব দিল রানা, 'আমি মনে করব।'

'এ অন্যায়!' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল সুন্দরী মেয়েটা, যার হ্যান্ডব্যাগ চুরি গেছে। 'একজন ভদ্রলোককে এভাবে অপমান করার কোন মানে হয় না!'

'তুমি চুপ করো!' বলল জোসেফ জালুচি। 'ভদ্রলোককে আমরা অপমান করছি না। একটা দামী জিনিস চুরি গেছে, এবং এখানে একমাত্র এই ভদ্রলোককেই আমরা কেউ চিনি না। আমি জিজ্ঞেস করার আগেই ওর উচিত ছিল পকেটগুলো আমাদেরকে দেখানো।'

'কি আশ্চর্য! এটা কোন যুক্তি হলো!' আবার প্রতিবাদ জানাল মেয়েটা। 'তোমরা কেউ ওকে সন্দেহ করছ, এই ধারণাটাই তো অপমানকর! যাই হোক, হ্যান্ডব্যাগটা যখন আমার, আমি বলছি, সেটার জন্যে কাউকে অস্থির হতে হবে না। ধরে নাও, সেটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, আবার খুঁজে পেয়েছি!'

শান্ত কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বলল জোসেফ জালুচি, 'তা হয় না, লিলি। এটা আমার পার্টি। এখান থেকে কারও কিছু চুরি গেলে সেটা আমার অপমান।' রানার দিকে ফিরল সে। হ্যান্ডব্যাগটা আপনি যদি নিয়ে থাকেন, দয়া করে সেটা বের করে দিন। তা না হলে আপনাকে আমরা সার্চ করতে বাধ্য হব।'

'সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আমাকে বলুন, মি. জালুচি!' কর্কশ, মোটা একটা কণ্ঠস্বর, পিছন থেকে এল।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। একচুল নড়ল না কেউ। হলরুমের ভেতর ভারী হয়ে আছে নিস্তব্ধতা। নিজের অজান্তে মনে মনে শিউরে উঠল রানা। অসংখ্য কাটাকুটির দাগে ভরা বীভৎস, প্রকাণ্ড একটা মুখ। প্রফেশন্যাল বক্সার ছিল এক কালে, সন্দেহ নেই, এবং সেই সাথে দ্রুত অনুমান করে নিল রানা, অন্তত পঞ্চাশটা লড়াইয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছে এই গরিলাটাকে। কাঁধের ওপর দিয়ে রানাকে তাকাতে দেখেই শার্টের আস্তিন গুটাতে শুরু করল লোকটা। রানার তুলনায় প্রস্থে তিনগুণ বড় সে।

'জোসেফ! মাইককে সরে যেতে বলো!' প্রায় চিৎকার করে উঠল মেয়েটা, কিন্তু এবার তার গলা কেঁপে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, ভয়ে।

রানার কাঁধে টোকা দিল জোসেফ জালুচি, ঝট্ করে ফিরে তাকাল রানা। 'আপনার জন্যে এখানে আমরা সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। আপনি যদি বাধা দেন, মাইক আটানা আপনাকে জোর করে সার্চ করবে।' এক সেকেন্ড বিরতি নিয়ে আবার বলল সে, 'আমার ধারণা হ্যান্ডব্যাগটা আপনার কোটের পকেটে পাওয়া যাবে।'

জালুচি থামতেই রানার শিরদাঁড়ার ওপর মোটা আঙুল দিয়ে একটা খোঁচা মারল মাইক আটানা। 'ভাল চাও তো বের করে দাও ওটা!'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। গরিলার ঠিক হাঁটুর নিচে ঝেড়ে লাথি চালাল ও।

ছিটকে দেয়ালের ওপর মাথা দিয়ে পড়ল গরিলা, কিন্তু গলা দিয়ে কোন কাতর শব্দ বেরিয়ে আসতে না দেখে মনে মনে আশ্চর্য হলো রানা। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারল না ও, হাতে জরুরী আরও কাজ রয়েছে। পিছন থেকে ওর কাঁধ ধরল জালুচি, স্পর্শ পাওয়া মাত্র বিদ্যুৎ গতিতে কনুই চালাল রানা। আন্দাজ করল, পাঁজরের অন্তত তিনটে হাড়ে চিড় ধরে গেছে।

পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই রানার। মেঝে থেকে উঠেই

ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিল মাইক আটানা। এক পাশে সরে না গিয়ে তার নাক বরাবর একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে গতিটা রুদ্ধ করল রানা। তারপর শুরু হলো হৈ-চৈ, শোরগোল, ছুটোছুটি; দমাদম কিল-ঘুসি, চিৎকার—কখন পড়ে গেছে রানা নিজেই জানে না, কখন উঠেছে তাও জানে না। যখন হুঁশ ফিরল, বাড়িটার পাশের একটা গলিতে, পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, ওকে জড়িয়ে ধরে আছে সেই সুন্দরী মেয়েটা। লিলি।

'সত্যি, আমি দুঃখিত!' ব্যস্তভাবে, বোঝাবার সুরে বলল মেয়েটা। 'এর জন্যে আমিই দায়ী! ওরা যে আপনাকে এভাবে অপমান করবে, ভাবতেই পারিনি! বেশ করেছেন মাইক আটানার চেহারা বিগড়ে দিয়ে! খুব খুশি হয়েছি আমি! এককালে ইতালির বক্সিং চ্যাম্পিয়ান ছিল বলে গর্বে ওর পা পড়ে না মাটিতে! হ্যাঁ, আপনারও সাহস বটে! আপনি যখন পা চালালেন, ভয়েই মরে যাচ্ছিলাম! ধরে নিয়েছিলাম, ওখানে যারা ছিল তারা সবাই ধরে নিয়েছিল, আটানা আপনাকে মেরেই ফেলবে। ওর দুর্দশা দেখে থ হয়ে গেছে সবাই। যাক বাবা, খুব বড় একটা ফাঁড়া গেছে আপনার ওপর দিয়ে। আপনার কিছু একটা হলে খারাপ লাগত আমার—আমার কথা থেকেই তো গোটা ব্যাপারটার সূত্রপাত!' একটু থেমে আবার বলল সে, 'এই যা, পরিচয়টাই দেয়া হয়নি। লিলি আলবিনো। ডিজাইনের কাজ করি, স্রেফ পয়সার জন্যে। আমার শখ বলুন সাধনা বলুন, ওয়াটার কালার। আপনি···?'

'মাসুদ রানা,' সংক্ষেপে সারল রানা। 'ট্যুরিস্ট।'

'ব্যস, এইটুকু?'

'ব্যস, এইটুকু।'

চেহারাটা একটু গম্ভীর হলো লিলির।

'শোনো,' বলল রানা, 'আমি কিন্তু তোমার হ্যান্ডব্যাগটার কথা কিছুই জানি না···'

'সে তো সবাই জানে!' বলল লিলি। 'জালুচি আর আটানা জ্ঞান হারাবার পর আপনাকে সার্চ করা হয়। টের পাননি, কারণ আপনারও তখন জ্ঞান ছিল না। হ্যান্ডব্যাগটা আপনার কাছে পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে? গেল কোথায় সেটা?'

'কি করে বলব!' কাঁধ ঝাঁকাল লিলি। 'মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগের দিকে সাধারণত মেয়েদেরই নজর থাকে, এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম আমি জালুচিকে, কিন্তু বলার কোন সুযোগই দিল না আমাকে সে। যাক গে, আমি ওটার কথা ভুলে যেতে চাই। আপনার গাড়ি আছে?'

'সাদা একটা আলফা। নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও আছে।'

'কোথায় থাকেন আপনি, মানে জায়গাটার নাম?' ঠিকানাটা বলল রানা। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল লিলির। 'সে তো অনেক দূর! আপনার যা অবস্থা, গাড়ি চালিয়ে অতদূর যেতে পারবেন বলে তো মনে হয় না!' নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন চিন্তা করল সে, তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার চোখে। 'বাড়িতে আমি একাই থাকি, ইচ্ছে করলে রাতটুকুর জন্যে ওখানে থেকে যেতে পারেন।'

বুঝতে পারল রানা, ঘটনাটার জন্যে এখনও নিজেকে অপরাধী ভাবছে

মেয়েটা। সেজন্যেই অপরিচিত একজন বিদেশীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইছে। হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি চাপল। পাঁচিলে সেঁটে থাকা রানার পিঠ পিছলে নেমে যেতে শুরু করল নিচের দিকে। দ্রুত হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেলল লিলি।

'নিজের ডেরায় ছাড়া আমার ভাল ঘুম হয় না,' ক্লান্ত সুরে বলল রানা। 'গাড়িটা কোথায় দেখিয়ে দিলে আমি নিজেই ড্রাইভ করে ফিরে যেতে পারব।'

'হুঁ, পারবেন বৈকি!' কৃত্রিম রাগের সাথে বলল লিলি। 'তারপর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে রাস্তার ওপর মরে পড়ে থাকুন, সকালে খবরের কাগজে লাশের ছবি দেখে মাথার চুল ছিঁড়ি! ওসব হবে না। চলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, আবার জ্ঞান হারিয়ে আমাকে যেন বিপদে ফেলে দেবেন না!'

গাড়ি পর্যন্ত যাবার পথে লিলির ওপর শরীরের বেশিরভাগ ভর চাপিয়ে দিল রানা। তারপর গাড়িতে উঠেই ঢলে পড়ল সীটের ওপর।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল রানার, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। লিভিংরুমের কাবার্ডে কিছু পুরানো অয়েল পেইন্ট খুঁজে পেয়েছে লিলি, টেরেসে দাঁড়িয়ে তাই দিয়ে ছবি আঁকছে সে। প্রাকৃতিক দৃশ্যটা ভাল লেগেছে তারও। সেদিন সন্ধ্যায় ফিরতে চাইল বটে সে কিন্তু রানা একটু বাধা দিতেই রয়ে গেল। পরদিনও ঠিক তাই ঘটল। এইভাবে পনেরোটা দিন!

দিনগুলোর কথা অনেক দিন মনে থাকবে রানার, হেসে খেলে কিভাবে যে কেটে গেছে, টেরই পায়নি। মেয়েটা খেয়ালী, একটু উদ্ভটও, কিন্তু ওর সবচেয়ে বড় গুণ হলো যেমন ভালবাসতে জানে তেমনি ভালবাসা আদায় করতেও জানে।

'দাও,' রানার হাত থেকে কফির খালি কাপটা নিল লিলি। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল রানা। ঘরের ভেতর চলে গেল লিলি। একটু পরই কাপটা ভরে নিয়ে ফিরে এল সে। 'নাও।' এই পনেরো দিনেই রানার অভ্যেস, রুচি, পছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেছে মেয়েটা। লিলির হাত থেকে কফির কাপ নিয়ে একটা চুমুক দিল রানা, তাকাল অন্ধকার, বৃষ্টি আর সাগরের দিকে।

বুকের নিচে হাত ভাঁজ করে রেলিঙের দিকে পিছন ফিরল লিলি, হেলান দিল তাতে। 'তোমার সম্পর্কে আমি কি জানি, বলো তো?'

লিলির দিকে ফিরে মৃদু হাসল রানা। হাতের কাপটা দেখিয়ে বলল, 'অন্তত এইটুকু জানো যে ডিনারের পর যদি কফি খাই তো পরপর দু'কাপ খাই।'

'তুমি লেখো,' বলল লিলি, 'অন্তত তুমি আমাকে একটা রহস্য উপন্যাস দেখিয়েছ, যেটা আরেক নামে লেখা, কিন্তু বলেছ ওটা নাকি তোমারই লেখা, অনুবাদটাও নাকি তুমিই করেছ!'

'তবে কি আমি ধরে নেব আমার পরিচয়টা তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি?' হাসল রানা। 'দেখো, মিথ্যে বলার ইচ্ছে থাকলে আরও বিশ্বাস্য কোন পরিচয় দিতাম।'

'তোমার শরীরে অনেকগুলো ক্ষত চিহ্ন আছে। ওগুলো কিভাবে হলো? বুকে, পিঠে, কাঁধে, উরুতে...'

'বার্থ-মার্ক,' হালকা সুরে বলল রানা। 'যদি কিছু মনে না করো, তোমার কোথায় কি জন্মদাগ আছে তার একটা ফিরিস্তি দেব?'

কিন্তু লিলির কণ্ঠস্বরে কোন পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না। গম্ভীর, ভারী গলায় বলল সে, 'একজন বাঙালী, অথচ আমেরিকান, অ্যারাবিয়ান, বা সাউথ-ইউরোপীয়ান বলে সহজেই চালানো যায়। হাঁটা চলায় আচরণে একজন সৈনিক মনে হয়। কে তুমি, মাসুদ রানা? তোমার সত্যিকার পরিচয়টা আমি কি জানতে পারি না?'

'ভাবতেও পারিনি তুমি এতটা সন্দেহপ্রবণ!'

'বুঝতে পারি না কেমন মানুষ তুমি! যে আকারে তার চেয়ে তিন গুণ বড় একজন প্রফেশন্যাল হেভিওয়েট বক্সারকে মাত্র দু'সেকেন্ডে কাবু করে ফেলে!'

'বেচারী আটানা!' বলল রানা। 'আমার সাথে লাগতে যাওয়াই উচিত হয়নি ওর।'

এবার সত্যি সত্যি লিলি রেগে উঠল বলে মনে হলো। 'তুমি কি একবারের জন্যেও সিরিয়াস হতে জানো না?'

অস্থিরভাবে টেরেসের আরেক প্রান্তে সরে গেল লিলি, যেন দু'জনের মাঝখানে একটা ব্যবধান চাইছে। রানার দিকে পিছন ফিরে, ইজেলের সামনে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল সে, রঙ তুলির মাঝখান থেকে তুলে নিল সিগারেটের প্যাকেট। ধরাল একটা। হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে। লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া নিল সে, কিন্তু তারপরই অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখল সিগারেটটা। ঝট্ করে ঘুরল রানার দিকে। সরাসরি চ্যালেঞ্জের ভঙ্গি।

'ঠিক আছে, রানা, আজ বিকেলের ঘটনাটা ব্যাখ্যা করো!'

'কিছু জানলে তো!' সত্যি কথাটাই বলল রানা।

মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে লিলি। তা না; মুঠো পাকানো হাতটা দুম করে দেয়ালে ঠুকল সে। 'তোমার এসব বাজে কথা আমি আর শুনতে চাই না, রানা! ফর গডস্ সেক, ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে গেছে! মনে পড়লে এখনও কাঁপুনি উঠছে সারা শরীরে!'

লিলির একটা হাত ধরার জন্যে এগোল রানা। 'ভয় পাবার কিছু নেই, লিলি। নিশ্চয়ই কোথাও কেউ ভুল করেছে! কথা দিচ্ছি, আমি যতক্ষণ আছি, ভয়ের কিছু নেই তোমার।'

মুখটা সরাসরি রানার দিকে না ফিরিয়ে, তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল লিলি। এক মুহূর্ত পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল খোলা জানালার সামনে। সেই পরিচিত ভঙ্গিতে বুকের নিচে হাত দুটো বাঁধল আবার। বাইরে অন্ধকার এবং ঝমঝম বৃষ্টি।

'রেইন, রেইন, গো টু স্পেন, নেভার কাম মাই ওয়ে এগেন,' হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়ের গলা অনুকরণ করে বলল সে।

লিলির পিছনে এসে দাঁড়াল রানা, দু'হাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল। 'চলো, ঘরে যাই।'

'জানো, কোন্ জিনিসটা সবচেয়ে ভয় করছে আমার?'

'না। কোন্‌টা?'

'বিলের সেই লোকটাকে নয়,' বলল লিলি। 'তুমি বললে, লোকটা প্রফেশন্যাল। অথচ কোন পাত্তাই পায়নি সে। তোমার কাছে দাঁড়াতেই পারল না। তাকে নয়, রানা, তোমাকে! তোমাকেই আমার সবচেয়ে ভয় করছে!'

রানার দিকে খানিকটা ফিরল লিলি, মুখ তুলে তাকাল তার গালে আলতোভাবে একটা চুমু খেল রানা।

'চলো, ঘুমাতে যাই,' লিলির হাত ধরে টানল রানা।

মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, লিলির শরীরটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল সে, রানার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে ঢুকে পড়ল বেডরুমে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে রানা দেখল, আগেই উঠে পড়েছে লিলি। টেরেসের দিকের জানালাটা খোলা, ভোরের আবছা আলোয় নাইলনের পর্দাটা উড়ছে। বালিশের তলা থেকে রিস্টওয়াচ বের করল ও। সাড়ে ছ'টা।

বিছানা থেকে নেমে একটা বাথরোব খুঁজে নিয়ে কোমরে জড়াল ও, বেডরুম থেকে লিভিংরুমে চলে এল। এখানেও লিলির কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু কোথাও থেকে একটা গাড়ি স্টার্ট নেবার আওয়াজ ভেসে এল। টেরেসে বেরিয়ে এসে গাড়ি-পথের শেষ মাথার দিকে তাকাল ও।

গ্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আলফা। সেটার পাশেই স্ন্যাকস আর সোয়েটার পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিলি। তার পায়ের কাছে কালো একটা লেদার সুটকেস দেখল রানা, ড্রাইভারের সীটের ওপর আরও একটা সুটকেস তুলে রাখছে সে।

'গুড মর্নিং,' শান্ত ভাবে বলল রানা।

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল লিলি। ম্লান চেহারা, চোখের কোলে কালি, রাতে বোধহয় ভাল ঘুম হয়নি। রানার চোখে চোখ রেখে মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল সে, মনে হলো উত্তর না দিয়েই গাড়িতে উঠে বসবে। কিন্তু না, দ্বিতীয় সুটকেসটা গাড়িতে তুলে ঘুরে দাঁড়াল সে। হাত দুটো পিছনে বেঁধে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল গাড়ি-পথ ধরে।

লিভিংরুমে ফিরে এল রানা, ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালল কাপে।

জানালার সামনে এসে দাঁড়াল লিলি। তার দিকে ফিরে হাতের কাপটা একটু উঁচু করল রানা, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত করে তুলল মুখ। জানতে চাইল, 'চলবে?'

কিন্তু হাসল না লিলি। রানার মনে হলো, হয় হাসতে ভুলে গেছে মেয়েটা, নয়তো ওর ভেতর হাসি বলে কিছু অবশিষ্ট নেই আর।

'দুঃখিত, রানা,' বলল সে। 'আমি ভেবেছিলাম ঘুম ভাঙতে দেরি আছে তোমার!'

'সেকি, একটা চিরকুট পর্যন্ত নয়?'

বিচলিত, কাতর, বিষণ্ন শোনাল লিলির কণ্ঠস্বর। 'এ সব সহ্য করব, সে শক্তি

আমার নেই! বিশেষ করে গতকাল বিকেলের ঘটনাটা।' শিউরে উঠল সে। 'আমাকে ক্ষমা করো, রানা।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'জানি না। কিছু এসেও যায় না। হয়তো প্যারিসে। আলফাটা নিয়ে গেলে কিছু মনে করবে তুমি?'

রেগে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা। লাভ কি তাতে! বলল, 'নিয়েই তো যাচ্ছিলে, এখন আবার জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'ওটা আমি আলমেরিয়ায় রেখে যাব, স্টেশনে।'

'সাথে টাকা-পয়সা কি রকম আছে?'

'চলে যাবে।'

টেবিল থেকে মানিব্যাগটা তুলে নিল রানা, একশো ডলারের পাঁচটা নোট বের করে বারের ওপর রাখল। তর্ক না করে সহজভাবে এগিয়ে এসে টাকাটা তুলে নিল লিলি। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত ধরে কামরার চারদিকে চোখ বুলাল সে, তারপর উদাস, বিষণ্ন সুরে বলল, 'দিন ক'টা এখানে আমার সুখে কেটেছে। অনেক বছর পর সত্যিকার সুখ পেয়েছিলাম তোমার কাছে।'

'তুমি যাবার আগে, একটা কথা। সে-রাতে, জালুচির পার্টি থেকে বেরিয়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে নিজেকে তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, মনে পড়ে?—আসলে, জ্ঞান হারাইনি আমি। এই মুহূর্তে কেন যেন মনে হচ্ছে, কথাটা তোমাকে আমার জানানো উচিত।'

চোখে রাজ্যের বিষাদ নিয়ে তাকিয়ে থাকল লিলি। তারপর তিক্ত সুরে বলল, 'তুমি একটা জঘন্য লোক, মাসুদ রানা!'

ঘুরে দাঁড়াল লিলি, দ্রুত এগোল টেরেস ধরে। কাপে আরও খানিকটা কফি ঢালল রানা। লক্ষ করল, হাত দুটো কাঁপছে না। কোথাও, যেন হাজার মাইল দূরে, দড়াম করে বন্ধ হলো একটা দরজা। দুই সেকেন্ডের বিরতি। তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট নেবার শব্দ। চলে গেল লিলি।

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে গাড়িটার চলে যাওয়া দেখল রানা। নিঃস্ব লাগছে নিজেকে। বুকের ভেতর দম আটকানো কষ্ট। বিচ্ছেদ চিরকালই বেদনাদায়ক, কিন্তু তাই বলে এত তাড়াতাড়ি, এই রকম তিক্ততা সৃষ্টি করে চলে যাবে লিলি তা ভাবতেও পারেনি ও। পর মুহূর্তে ভাবল, বোধহয় নিজেকে সান্ত্বনা আর প্রবোধ দেবার জন্যেই—এত মন খারাপ করার কি আছে! কোন এক মনীষী এক সময় বলেছিলেন, একটা মেয়ে শুধুমাত্র একটা মেয়েই, তার বেশি কিছু না! কাপটা মুখের সামনে তুলল ও, দেখল, হাতটা এখন আর আগের মত স্থির নয়। বারের ওপর ঠুকে রেখে দিল কাপটা। ফিরে এল বেডরুমে। ওয়ারড্রোব থেকে বের করল এক জোড়া বেদিং শর্টস। টেরেসের শেষ মাথায় চলে এল ও, তিনশো সাতাশটা কংক্রিটের ধাপ টপকে নেমে এল নিচে, হন হন করে এগোল সৈকতের দিকে।

নিষ্প্রভ সকাল। দিগন্তরেখার ওপরে উঠে এসেছে সূর্য, কিন্তু মেঘের আবরণ ভেদ করে নিচে নামতে পারেনি রোদ। ছোট পাথুরে জেটির পাশেই বোট হাউস, সেদিকে এগোবার সময় বরফের মত ঠাণ্ডা লাগল পায়ের নিচে বালি। বিশেষ করে

এখানে আসার পর থেকে স্কিন ডাইভিং শুধু স্পোর্টস নয়, অনেকটা বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বনের মত হয়ে উঠেছে ওর কাছে। দরজা খুলে বোট হাউসের ভেতর ঢুকল ও। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সব যোগাড় করা আছে। নিজের কমপ্রেশার থেকে শুরু করে রিচার্জিং এয়ার বটল, অ্যাকুয়ামোবাইল, কিছুই বাদ পড়েনি।

কালো একটা ওয়েটস্যুট পরে নিল রানা, কারণ আকাশের অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে আজ সকালে সাগরের পানি হিম হয়ে আছে। পুরো চার্জ করা অ্যাকুয়ালাঙের স্ট্র্যাপে হাত গলিয়ে নিল ও, ফেস মাস্কটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

জেটির পাশে সৈকতে রয়েছে ওর আউটবোর্ড মোটর, কিন্তু সেদিকে এগোল না ও। মাস্ক পরে নিয়ে সোজা ডাইভ দিয়ে পড়ল সাগরে। তিন মিনিটের মধ্যে চলে এল বে-র প্রবেশ মুখে। প্রায় রোজ সকালে এ-ই করে ও, এক রকম অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে; তার অবশ্য একটা কারণও আছে। বে-র প্রবেশ মুখ থেকে শ'খানেক গজ বাইরের দিকে একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছে ও।

বাতাসের সাথে ঘন কুয়াশা ভেসে আসছে ওর দিকে, সেই সাথে ঝির ঝির বৃষ্টি শুরু হলো আবার। তবে স্রোত খুব একটা প্রবল নয়, কাজেই ঠিক জায়গা মত পৌঁছুতে তেমন বেগ পেতে হলো না ওকে। পানির নিচে ডুব দিল ও, এয়ার সাপ্লাই অ্যাডজাস্ট করার জন্যে থামল একটু, তারপর নেমে এল সোজা।

সকালটা ম্লান হওয়া সত্ত্বেও অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, পানিটা কাঁচের মত স্বচ্ছ বলেই বোধহয়। পঞ্চাশ ফিট নিচে নেমে এসে নিউট্রাল জোনে প্রবেশ করল রানা। আধো অন্ধকারে, আরও খানিক নিচের দিকে, অস্পষ্টভাবে দেখা গেল একটা জাহাজের স্টার্ন।

হাতটা শ্যাওলায় পিছলে যেতে পারে, তাই রেলটা শক্ত মুঠোয় ধরল রানা। কাউন্টারের ওপর লেখা নামটা পরিষ্কার পড়া যায় এখনও—এস.এস. ফিনবার। আবিষ্কার করার পরপরই চেক করেছিল ও, ক্লাইডেসাইড ফ্রেটার, তিন হাজার টনী। উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের গ্রীষ্মে মাল্টা কনভয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, স্টুকা ডাইভ বোম্বারের আক্রমণে ডুবে যায়।

একদিকে একটু কাত্ হয়ে আছে জাহাজটা, কিন্তু ফোরডেকে অ্যান্টি এয়ারক্র্যাফট গান জায়গা মত অক্ষত অবস্থায় আছে। সেদিকে এগোতে শুরু করে থামল রানা, রেলের পাশে ঝুলে থেকে আবার অ্যাডজাস্ট করে নিল এয়ার সাপ্লাই।

চোখের কোণে ধরা পড়ল ব্যাপারটা। পানিতে হঠাৎ একটা আলোড়ন। মুখ তুলে তাকাতেই দেখল, একটা অ্যাকুয়ামোবাইল নেমে আসছে, পিছনে ঝুলে রয়েছে দু'জন ডাইভার। ধীর গতিতে নেমে এসে রানার মাথার কাছ থেকে দশ কি পনেরো ফিট ওপরে থামল তারা। ডাইভারদের পরনে উজ্জ্বল কমলা রঙের ওয়েটস্যুট, কালো মাস্ক। তাদের একজন হাত নাড়ল, ডাইভ দিয়ে নেমে এল রেলের সামনে, রানার পাশে এসে থামল।

ঝুঁকে লোকটার মাস্কের আরও কাছে নিজের মাস্ক সরিয়ে আনল রানা। মাস্কের ভেতর মুখটা চেনা চেনা লাগল, যার কোন বোধগম্য অর্থ খুঁজে পেল না ও। ওর চোখে চোখ রেখে হাসল লোকটা, তারপর, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা

হাত তুলে বিদ্যুৎগতিতে রানার মুখ থেকে খুলে নিল এয়ার হোসটা।

সাথে সাথে পানির আরও নিচে তলিয়ে যেতে শুরু করল রানা। হাত-পা ছুঁড়ে পানির সাথে যুঝল ও, পতনটা রোধ করে উঠতে চেষ্টা করল ওপর দিকে, কিন্তু দ্রুত নিচে নেমে এসে ওর পায়ের গোড়ালি ধরে ফেলল লোকটা, টেনে আরও নিচে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে। একটা সুচ বিঁধল উরুতে।

মারা যাচ্ছে ও, বুঝতে পারল রানা। কিন্তু কেন, জানা নেই। সাঁৎ করে নেমে এল দ্বিতীয় ডাইভার, টেনে নিয়ে এল একটা স্পেয়ার অ্যাকুয়ালাঙ, রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সেটার এয়ার হোস। রূপালী বুদ্বুদ বেরিয়ে আসছে মাউথপীস থেকে। প্রতি মুহূর্তে আকারে বড় হচ্ছে সেগুলো। এক সময় মনে হলো রানার, বুদ্বুদগুলো গ্রাস করে ফেলেছে ওকে। এরপরই জ্ঞান হারাল ও।

ফুসফুসে ব্যথা, ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে রানার। মাথাটা ঘন ঘন এদিক ওদিক নাড়ছে ও। অনুভব করল, কে যেন বারবার চাপড় মারছে ওর দুই গালে। মনে পড়ে না, কিন্তু ধারণা করল, নিশ্চয়ই ওর গলার ভেতর থেকে চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল—কারণ, কে যেন হেসে উঠে বলল, 'ব্যাটা মরবে না!'

চোখ মেলল রানা। একটা বোটের ডেকে শুয়ে আছে ও। উজ্জ্বল কমলা রঙের ওয়েটস্যুট পরা জোসেফ জালুচি হুমড়ি খেয়ে রয়েছে ওর মুখের ওপর। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সোনালী চুলগুলো বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে, টপ টপ করে ফোঁটা পড়ছে রানার মুখে। বোটের ইঞ্জিনের সামনে বসে আছে, আরেকটা কমলা রঙের ওয়েটস্যুট পরে, মাইক আটানা।

'তোমার অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়, রানা!' ভুরু নাচিয়ে বলল জালুচি।

উঠে বসার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু বুকে সামান্য একটু ঠেলা দিয়ে আবার ওকে শুইয়ে দিল জালুচি। একটু পরই মাইক আটানার গলা শুনতে পেল রানা।

'আমরা পৌঁছে গেছি, মি. জালুচি।'

বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা সেসনা সী-প্লেন মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। সী-প্লেনের পোর্ট উইঙের নিচে দিয়ে এগোল বোট, তারপর একটা ফ্লোটের সাথে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। আবার উঠে বসার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু এবারও ওকে ঠেলা দিয়ে শুইয়ে রাখল জালুচি। তার হাতে একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ। রানার চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে হাসল সে।

'নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও, রানা। এয়ার-সিকনেসের শিকার যাতে না হও সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করব।'

ওষুধটা কড়া। চামড়া ভেদ করে ঢুকে গেল সুচ মাংসের ভেতর, অনুভব করল রানা, কিন্তু পরমুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

মনে হলো এক সেকেন্ড পরই আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে ও, কিন্তু বাস্তবে কেটে গেছে পাঁচ কি ছয় ঘণ্টা।

কোথায় রয়েছে ও, বুঝতে পারল না রানা। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে, শরীরটাকে দু'দিক থেকে ঠেক দিয়ে রেখেছে কারা, যেন, পাথুরে ধাপ বেয়ে সেই কত শত যুগ ধরে যেন নামছে তো

নামছেই রানা।

অবশেষে থামল ওরা। আলোর ছোট একটা বৃত্ত ছাড়া কিছুই দেখল না রানা। ঘুমের নেশা একটুও কাটেনি ওর, চেষ্টা করেও চোখ মেলে রাখতে পারছে না। চোখের পাতা মাঝে মধ্যে খুলছে বটে, কিন্তু সাথে সাথে জোড়া লেগে যাচ্ছে আবার। জালুচির মুখটা আকারে তিন গুণ বড় দেখতে পেল রানা, মনে হলো শূন্যে কোথাও থেকে ঝুলছে সেটা। কংক্রিটের মেঝে থেকে ম্যানহোলের লোহার ঢাকনি সরাল দু'জন লোক। নিচের গর্তটা অন্ধকার। নির্জন।

কষে একটা চড় মারল জালুচি রানার গালে। কিন্তু কোন ব্যথা অনুভব করল না রানা।

'কি হে, আমাদের সাথে এখনও আছ তো?' সকৌতুকে বলল জালুচি। পিছন ফিরল রানার দিকে। তারপর লোক দু'জনকে বলল, 'নামাও ওকে।'

বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করল না রানা। সে শক্তি নেই। একটা রশি দিয়ে লূপ তৈরি করে কায়দা করে বাঁধা হলো, তারপর ম্যানহোলের কিনারা দিয়ে ওকে নামিয়ে দেয়া হলো নিচের দিকে। দশ কি পনেরো ফিট অন্ধকারে নেমে এল রানা। ম্যানহোলের ঢাকনিটা আবার বসিয়ে দেয়া হলো গর্তের মুখে। পায়ের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে গেল দূরে।

প্রায় একই সময়ে এক সাথে দুটো ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল রানা। সকালে যে বেদিং শর্টস পরেছিল ও, পরনে এখনও সেটাই রয়েছে, শরীরের বাকি অংশে কোন আবরণ নেই। এবং, চারদিকে হাত বাড়াতে নিরেট পাথরের ঠাণ্ডা দেয়াল ছাড়া আর কিছু ঠেকল না আঙুলে।

ঠিক এই মুহূর্তে তাতে অবশ্য কিছুই এসে যায় না। কারণ, এখনও ওকে কিছু স্পর্শ করেনি। এক কোণে বসে পড়ল রানা। স্বল্প পরিসর, পা লম্বা করে বসার জায়গাও নেই। হাঁটু দুটো বুকে ঠেকিয়ে, ভ্রূণের ভঙ্গিতে নিজেকে গুটিয়ে নিল ও। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

দুই

সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা নিয়ে ঘুম থেকে জাগল রানা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেতে শুরু করেছে। অন্ধকার কোণে নিজেকে গুটিয়ে নিল ও। চৈতন্য ফিরে পেলেও, সাথে সাথে সচেতনতা ফিরল না। কেমন যেন দিশেহারা বোধ করছে ও। মাথার অনেক ওপরে, পাথুরে দেয়ালে একটা ফোকর, এক চিলতে হলুদ রোদ এসে ঢুকেছে ভেতরে। চোখের চারপাশ কুঁচকে সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর দু'পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু তাল হারিয়ে সাথে সাথে পড়ে গেল কঠিন মেঝেতে। এতক্ষণে জানল, ওর পায়ে পরানো রয়েছে লোহার বেড়ি। লোহার দুটো রিঙ পায়ে গলিয়ে একটা চেনের সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে। চেষ্টা করলে হয়তো দাঁড়াতে পারবে ও, কিন্তু হাঁটতে চাইলে চার ইঞ্চির

বেশি এগোতে পারবে না।

হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে শরীর। মাথাটাকে যথাসম্ভব স্থির রেখে গোটা ব্যাপারটা নতুন করে স্মরণ করার চেষ্টা করল ও। দুঃস্বপ্ন? পরমুহূর্তে ক্ষীণ একটু তিক্ত হাসি ফুটল ঠোঁটে। এই সময় মাথার ওপর কংক্রিটের সাথে ভারী লোহা ঘর্ষণের আওয়াজ হলো। চোখ তুলল রানা, দেখল, ম্যানহোলের ঢাকনিটা সরে গেছে।

গর্ত মুখে জালুচিকে দেখা গেল। নিচে অন্ধকার, রানাকে ভাল করে দেখার জন্যে খানিকটা ঝুঁকে পড়ল সে। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল আরও একটা মুখ। এটা একটা ক্ষতবিক্ষত মুখ। কর্কশ শোনাল মাইক আটানার হাসি।

'শ্লাকে দেখে পেচ্ছাব পেয়ে গেল আমার, মি. জালুচি!'

'হেই, রানা, তোমার অবস্থা খুব সুবিধের বলে তো মনে হচ্ছে না!' মুখের দু'পাশে ঝুলে পড়া সোনালী চুল নেড়ে হেসে উঠল জালুচি। 'খিদে পেয়েছে, তাই না? জানি, পেটে গরম কিছু পড়লে আবার তাজা হয়ে উঠবে। এই নাও, চেখে দেখো, তোমার রুচির সাথে মেলে কিনা।'

রশিতে বেঁধে বড় একটা বিস্কিটের টিন নামিয়ে দিল সে। টিনের ভেতর এক বোতল পানি, একটা প্লেটে ঠাণ্ডা স্টু। নাকে ঘ্রাণ ঢুকতে রানা বুঝল, অনেক দিনের পুরানো প্যাকেট থেকে খোলা নিচু মানের খাবার এটা।

অসহায় বোবা পশুর মত ঠাণ্ডা কোণে জড়সড় হয়ে বসে থাকল রানা।

ওপর থেকে আবার কর্কশ হাসি ভেসে এল আটানার। 'হ্যালো, তোমার মনের ভাবটা অন্তত জানাও আমাদের! দেখছ না, আমরা অপেক্ষা করছি?' ছর ছর করে প্রস্রাব করল সে রানার মাথায়।

প্লেটটা ছুঁড়ে মারল রানা, কিন্তু খাবার ফিরে এসে ওর মাথাতেই পড়ল সবটুকু।

'দেখব কোথায় থাকে তোমার এই জেদ,' ওপর থেকে বলল জালুচি। 'কাল, পরশু, তরশু, অথবা তার পরদিন, এই খাবার তোমাকে খেতেই হবে। তোমাকে আমরা মুঠোয় পেয়েছি, রানা!'

রানার কণ্ঠস্বর, ওর নিজের কানেই এমন শান্ত, এবং অনেক দূর থেকে ভেসে আসা বলে মনে হলো যে সেটাকে নিজের বলে চিনতেই পারল না ও। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'ব্যাপারটা কি, শুনতে রাজি আছি আমি।'

লোহার ঢাকনি দিয়ে গর্তমুখটা বন্ধ করে দেয়া হলো। দূরে মিলিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ। ঠাণ্ডা হিম দেয়ালে আবার হেলান দিল রানা। নগ্ন হাত দিয়ে মুখ মুছল। আলমেরিয়ায় সেদিন সন্ধ্যায় যা ঘটেছিল, তার প্রতিশোধ? না, তা কি করে হয়! ডাইভার, সী-প্লেন, এই গর্ত! সব মিলিয়ে বড় বেশি সাড়ম্বর আয়োজন।

এসবের নিশ্চয়ই গোপন কিছু তাৎপর্য আছে, আছে গভীর কোন উদ্দেশ্য। কিন্তু এর বেশি আর কিছু ভাবতে পারল না সে, ঘুমের নেশায় বন্ধ হয়ে এল চোখের পাতা।

৮

প্রায় সব মানুষই হামাগুড়ি দিয়ে কোন না কোন ধরনের বিবর থেকে বেরুবার

চেষ্টায় তাদের জীবন কাটিয়ে দেয়, কিন্তু রানার এই গর্তটা নিঃসন্দেহে অন্য আর সবার গর্তের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। নিরেট পাথরের তৈরি একটা গহ্বর এটা, পনেরো ফিট গভীর, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে মাত্র চার ফিট, দেয়ালগুলো মসৃণ। দেয়াল বেয়ে ওঠার কথা একবার ভেবেও দেখল না রানা, কারণ কোন ভাবেই তা সম্ভব নয়—বিশেষ করে পায়ে লোহার বেড়ি থাকা অবস্থায়। কোনাকুনিভাবে কোনরকমে শোয়া যায়, কিন্তু তাতেও পা দুটো পুরোপুরি মেলা সম্ভব নয়। গর্তের ভেতরটা এতই ঠাণ্ডা যে পা মেলার চেষ্টাই করেনি রানা, বুকে হাঁটু ঠেকিয়ে যতটা আঁটসাঁটভাবে সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে ও।

চাদর বা কম্বল নেই, নেই স্যানিটারী ব্যবস্থা। কাজেই তিন দিনের দিন ক্ষুদ্র পরিসরের ভেতর অসহ্য হয়ে উঠল দুর্গন্ধ। ওপরের সরু ফোকর গলে যে আলো আসে, সেটা লক্ষ্য করে সময়ের একটা হিসেব পায় ও। রোজই একবার করে খাবার-দাবার নামিয়ে দেয়া হয় রশি বেঁধে। কিন্তু সেই প্রথম দিনের পরে আর গর্তমুখে কাউকে দেখতে পায়নি ও। দু'একবার চিৎকার করে ডেকেছে বটে, কিন্তু কোন সাড়া পায়নি। পরিষ্কার বোঝা যায়, মানুষের কাছ থেকে ওকে দূরে সরিয়ে রাখাই ওদের উদ্দেশ্য।

রোজ সেই একই খাবার দেয়া হলো ওকে, এক বোতল পানি, খানিকটা স্টু। ঠিকই বলেছিল জালুচি—তিন দিনের দিন প্লেটটা সাফ করে ফেলল রানা।

কিন্তু একঘেয়েমিটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল। ওষুধের ক্রিয়া এখনও দূর হয়নি, কাজেই চোখে সারাক্ষণই ঘুম আছে, কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ঘুমাতেও পারে না ও। সমস্ত কষ্ট আর মানসিক যাতনা ভুলে থাকার জন্যে শেষ পর্যন্ত আত্মসম্মোহনের আশ্রয় নিল সে। তাতে কাজও হলো। এই নারকীয় পরিবেশেও মনের বল হারাল না ও।

অবশেষে আবার গর্তমুখে দেখা গেল জালুচিকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা, মুখ তুলে তাকাল ওপর দিকে। ওর হিসেব অনুসারে, ওকে গর্তে নামাবার পর থেকে পুরো এক হপ্তা কেটে গেছে।

'মাই গড!' নাক সিঁটকে বলল জালুচি। 'কি অসভ্য গন্ধ! অ্যাই, ওর ওপর পানি মারো!'

সাথে সাথে ঠাণ্ডা পানির একটা মোটা ধারা নেমে এল ওপর থেকে। ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল রানা, কিন্তু তবু পানির স্পর্শ পেয়ে নিজেকে আর আগের মত নোংরা বলে মনে হলো না। খানিক পর থেমে গেল পানি, গর্তের ভেতর ঝুঁকে ডগায় লুপ সহ একটা রশি নামাল জালুচি।

'ঠিক হ্যায়,' বলল সে। 'উঠে এসো, রানা।'

অন্ধকার থেকে উঠে এল রানা। দেখল, জায়গাটা একটা ভল্টের মত, পাথরের কয়েকটা পিলার ঠেক দিয়ে রেখেছে ছাদটাকে। দেয়ালগুলো পরিচ্ছন্নভাবে হোয়াইট ওয়াশ করা, সিলিঙের সাথে একটা ইলেকট্রিক বালব ঝুলছে। পাথরের কয়েকটা ধাপ উঠে গেছে ওক কাঠের একটা ছোট দরজার দিকে। রশির অপর প্রান্তটা ধরেছিল দু'জন হোঁৎকা চেহারার লোক। একই ধরনের পোশাক দু'জনের—ড্রেনপাইপ প্যান্ট, ভারী সোয়েটার। চেহারা দেখেই বোঝা গেল, নীচ

কাজ করার জন্যেই জন্ম হয়েছে এদের।

পিছনে মাইক আটানাকে নিয়ে সামনে এগিয়ে এল জালুচি। বোধহয় শ্যাম্পু করেছে, একরাশ সোনালী চুল মুকুটের মত দেখাচ্ছে মাথায়। পরনে কালো নাইলনের শার্ট, এঁটে বসে আছে শরীরে, গলার কাছটা খোলা। কোমরে জড়ানো চওড়া বেল্টে চকচকে পিতলের একটা চাকতি রয়েছে, ডায়ামিটারে চার ইঞ্চির কম হবে না। গলায় পরেছে সোনার একটা চেন, দু'প্রান্তের শেষ মাথায় একটা মটরশুঁটি আকারের বল, আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে সেটা।

'সুন্দরী, মিষ্টি দেখাচ্ছে তোমাকে, অনেস্টলি!' বলল রানা।

'কিন্তু আমি চাই তোমাকে যেন ঠিক তার উল্টোটা দেখায়!' সাথে সাথে জবাব দিল জালুচি। 'জুতিয়ে তোমার মুখের চামড়া খসিয়ে দিতে পারলে খুশি হতাম।'

মাইক আটানার দিকে তাকাল না সে, কিন্তু মাথাটা তার উদ্দেশেই ঝাঁকাল। দ্রুত সামনে এগিয়ে এল আটানা, তার চেহারায় নগ্ন উল্লাস ফুটে উঠল। কাছে এসে দুম করে ঘুসি মারল রানার পেটে। টলমল করে উঠল রানার শরীর, এই সময় ওর দুই গোড়ালির মাঝখানে চেনের সাথে একটা পা বাধিয়ে টান দিল আটানা, দড়াম করে পড়ে গেল রানা।

দ্রুত বলল জালুচি, 'মুখে যেন কোন দাগ না পড়ে!'

কথাটা মাইক আটানা শুনতে পেল কিনা বলতে পারবে না রানা। বাঘ যেমন রক্তের গন্ধ পেয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে, রানাকে অসহায় পেয়ে আটানাও তেমনি নির্মম হয়ে উঠল। বুট জুতো দিয়ে পর পর কয়েকটা লাথি মারল সে।

'ঠিক আছে,' বলল জালুচি। 'যথেষ্ট হয়েছে।' কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হচ্ছে না দেখে ঘাড় ধরে টেনে পিছিয়ে নিয়ে এল আটানাকে।

হোস পাইপের সাহায্যে আবার রানার ওপর পানি ছুঁড়ল ওরা। তারপর দু'জন লোক ওকে মাঝখানে নিয়ে জালুচি আর আটানাকে অনুসরণ করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। দরজা খুলল আটানা, সকালের উজ্জ্বল রোদে বেরিয়ে এল ওরা।

চিন্তা শক্তি এবং শরীরের বল ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছে রানা। বুঝতে পারল, মনের জোরে কোন ভাঙন ধরেনি বলে এত তাড়াতাড়ি ধকলটা কাটিয়ে উঠতে পারছে ও। দেখল, চারদিকে উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা মস্ত কাঁকর ছড়ানো উঠানে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। উঠানের শেষ মাথায় একটা গেট, ডান দিকে সিঁড়ি, ধাপে ধাপে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে দুর্গ প্রাচীরের গায়ে।

পায়ে বেড়ি থাকায় অনেক কষ্টে ওদের সাথে তাল রেখে ওপরে উঠল রানা। কিন্তু খানিকটা ওঠার পর চারদিকের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ও।

পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর, দূরে শান্ত নীল সাগর রোদে ঝলমল করছে, এবং ওদের মাথার আরও অনেক ওপরে আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাগানের মাঝখানে একটা দুর্গ।

লোহার গেট পেরিয়ে সেমি-ট্রপিক্যাল স্বর্গে প্রবেশ করার সময় উইস্টেরিয়া এবং আমন্ডের ঘ্রাণ পেল রানা। চারদিক থেকে পানির আওয়াজ আসছে, কৃত্রিম

ঝর্ণার কোন সংখ্যা সীমা নেই। কৃত্রিম জলপ্রপাতও দেখতে পেল রানা, পাম গাছের মাঝখান দিয়ে এক টেরেস থেকে আরেক টেরেসে নেমে আসছে।

আরেক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে চওড়া একটা টেরেসে উঠে এল ওরা, ঠিক এই পয়েন্টে দুর্গ প্রাচীর জাহাজের বো-র মত দুদিক থেকে এগিয়ে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। রঙচঙে সামিয়ানার নিচে একটা টেবিল সাজানো হয়েছে। সাদা লিনেনের টেবিল ক্লথ, তার ওপর সিলভার অয়্যার, একটা বালতিতে দু'বোতল ওয়াইন, সাদা কোট আর ট্রাউজার পরা একজন ওয়েটার ভাঁজ করা একটা হাতে ন্যাপকিন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দুর্গ প্রাচীরে দাঁড়িয়ে আছে তার মনিব। যেমন মোটা, তেমনি লম্বা। পরনে সাদা লিনেনের স্যুট, লম্বা কালো চুলে চিকন দু'একটা রূপালী ঝিলিক। লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। এতক্ষণে দেখল রানা, তার দু'হাতে দুটো ছড়ি রয়েছে, ছড়ি দুটোর ওপর শরীরের সম্পূর্ণ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অদ্ভুত একটা স্থির মুখাবয়ব। চোখ জোড়া ছাড়া মুখের বাকি অংশ যেন পাথরে খোদাই করা। ঘন ভুরুর ভেতর চোখের মণি দুটো দু'টুকরো আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে। রানার মনে হলো, মানুষের অন্তরের অন্তঃস্তল পর্যন্ত দেখতে পায় এই লোক। পাথুরে মুখে কোমল কোন ভাবের চিহ্নমাত্র নেই। এই মুহূর্তে রাজ্যের নির্লিপ্ত ভাব ছায়া ফেলেছে সেখানে, কিন্তু সেটা যে নেহাতই মুখোশ, এই নির্লিপ্ততার ভেতর চাপা রয়েছে হিংস্র একটা পশু, উপলব্ধি করতে অসুবিধে হলো না রানার। কিন্তু ওর অস্বস্তির কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন—চেহারাটা চেনা চেনা লাগল ওর। অথচ লোকটাকে আগে কোথায় দেখেছে, আদৌ দেখেছে কিনা, স্মরণ করতে পারল না।

একটানা বেশ কিছুক্ষণ দেখল লোকটা রানাকে। ঘন ভুরুর ভেতর চোখ জোড়ায় ভাবের এতটুকু ছায়া নেই। তারপর ধীরে ধীরে ছড়িতে ভর দিয়ে এগিয়ে এল সে, বসল একটা বেতের চেয়ারে। তার মাথা ঝাঁকানো লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে এল ওয়েটার, বালতি থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে গ্লাসে খানিকটা ওয়াইন ঢেলে ধরিয়ে দিল মনিবের হাতে। সাথে সাথে পরিচিত অ্যানিসের ঘ্রাণ পেল রানা।

হাতের গ্লাসটা রানার দিকে একটু তুলে লোকটা বলল, 'তোমার স্বাস্থ্য, মাসুদ রানা।' ভারী কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ ভঙ্গিটা পুরোপুরি আমেরিকান।

'একটু সাবধান হলে নিজের উপকার করবে তুমি,' বলল রানা। 'গরমের দিনে ও জিনিস খুব বেশি পেটে পড়লে লিভার ফ্রিজ হয়ে যাবে। অনেক তাগড়া জোয়ানকে দিনের পর দিন বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেছি আমি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল জালুচি, কিন্তু হাত নেড়ে তাকে বাধা দিল লোকটা। ঘন ভুরু জোড়ার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে রানার দিকে। কপালে ক্ষীণ একটা চিন্তার রেখা ফুটল। পরমুহূর্তে হাসল সে। প্রায় সবগুলো দাঁতই সোনা দিয়ে বাঁধানো। 'বাই গড, কোথায় রয়েছ সেটা তুমি বুঝে ফেলেছ! স্বীকার করো!'

'এ আর এমন কি কঠিন!'

পাথরে খোদাই করা মুখে বেমানান উজ্জ্বল হাসি ফুটল। নিজের উরুতে মস্ত এক চাপড় মারল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জালুচির দিকে। 'বলিনি, উপযুক্ত

লোককে বাছাই করেছি আমি?'

মটরশুঁটি আকারের সোনার বলটা আঙুল দিয়ে নাড়তে শুরু করে জালুচি বলল, 'বাচাল—ওর সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি।'

আবার রানার দিকে মনোযোগ দিল মোটা লোকটা। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে একটা ছড়ির ওপর রাখল ভাঁজ করা হাত দুটো। 'দাঁত ভাঙা জবাব দিয়ে আমার সম্মানটুকু রক্ষা করো, স্যার!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এই দুর্গের আর্কিটেকচার দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। প্রাচীরগুলো নরম্যান, সম্ভবত বারোশো শতাব্দীর। বাকি সব আরবীয়। তারপর ধরো, বাগান, মেইন পুলের ধারে প্যাপিরাস, আরেকটা আরবী নমুনা। তাছাড়া, যে ওয়াইন তুমি গিলছ জিবিব্বো, প্যানটেলারিয়া দ্বীপ থেকে আমদানী—অ্যানিসের ঝাঁঝ পাচ্ছি আমি।'

'এসব মিলিয়ে যোগফল কি দাঁড়াল?'

'সিসিলি,' মুখ তুলে সূর্যের দিকে এক নজর তাকাল রানা। 'দক্ষিণ উপকূলের কোথাও।'

'দক্ষিণ-পুব দিকে,' বলল সে। 'কাপো পাসারো।' প্রশংসা করার ভঙ্গিতে ওপর-নিচে মাথা দোলাল সে, ছোট্ট একটা চুমুক দিল গ্লাসে। জালুচির দিকে ফিরে বলল, 'অদ্ভুত, তাই না? একেই বলে ট্রেনিং পাওয়া মাথা।'

চেহারা দেখে মনে হলো জোর করে কেউ যেন কুইনাইন খাইয়ে দিয়েছে জালুচিকে। একটা লম্বা গ্লাস তুলে নিয়ে ওয়েটারের হাতে দিল সে, ওয়েটার সেটা ভরে দিল।

হো হো করে হাসল মোটা লোকটা। 'তোমার কৃতিত্বটাকে খাটো করে দেখছে জালুচি। কিন্তু ওকে দোষ দেয়া যায় না, কারণ আমেরিকার সবচেয়ে ভাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বেরিয়েছে ও।'

'তাই নাকি?' বিস্ময় ফুটে উঠল রানার চেহারায়। 'কিন্তু ওর আচার-আচরণ দেখলে তা মনে হয় না। আমি তো ধরে নিয়েছিলাম, ছাগল একটা।'

এমন ভাব করল জালুচি, যেন শুনতেই পায়নি। কিন্তু রানার কথা শেষ হতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মোটা লোকটা। তারপর হাসি থামিয়ে জানতে চাইল সে, 'তুমি জানো, আমি কে?'

'না।'

'সালভাদর, স্যার। সালভাদর মারানজানা!' রানার চেহারায় একটা প্রতিক্রিয়া আশা করে একটু বিরতি নিল সে, তারপর ছুরির মত ধারাল হাসি হেসে বলল, 'এখন তুমি আমাকে চেনো, তাই না?'

'মনে পড়েছে,' বলল রানা। 'নয় কি দশ মাস আগে আমেরিকার অনেকগুলো খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল তোমার ছবি। ক্যাপশন ছিল: এই লোককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।'

'আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাবার একটা দুঃখজনক ঘটনা ছিল ওটা।' মুহূর্তের জন্যে রেগে উঠল মারানজানা। কিন্তু রাগটা কৃত্রিম কিনা ধরতে পারল না রানা। 'সাইপ্রাসে জন্মগ্রহণ করলেও, জীবনের চল্লিশটা বছর আমি যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছি, মি.

রানা। সেখানে আইনসঙ্গত ব্যবসায়িক স্বার্থ ছিল আমার।'

'যেমন জুয়া, ড্রাগস, নারী-ব্যবসা?' বলল রানা। 'সিন্ডিকেট বা মাফিয়ার প্রথম কাতারের একজন লোক?'

মারানজানার চোখে রাগের উত্তপ্ত স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেল রানা। ঝট্ করে তাকাল জালুচির দিকে, গম্ভীর গলায় বলল, 'ফাইল!'

মারানজানার বেতের চেয়ারের পায়ায় হেলান দিয়ে রয়েছে একটা ব্রীফকেস, সেটা খুলে ভেতর থেকে একটা ফোল্ডার বের করল জালুচি, টেবিলে মারানজানার সামনে রাখল।

ফোল্ডারের ওপর একটা হাত রেখে মারানজানা বলল, 'মেজর মাসুদ রানা, তার বিশদ ইতিহাস।'

'আচ্ছা!'

হাত দিয়ে ঠেলে ফোল্ডারটা সরিয়ে দিল মারানজানা। 'ইতিমধ্যেই আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে।' বাক্স খুলে লম্বা একটা কালো সিগার বের করল সে। 'জন্ম, দেশ, বয়স, শখ-সাধ, অভ্যেস এসব খুঁটিনাটির মধ্যে আর গেলাম না। সময় কম, সংক্ষেপে শুধু জানিয়ে দিতে চাই, তোমার সম্পর্কে প্রায় সব খবরই যোগাড় করা গেছে।' সিগার ধরাল সে। 'তুমি একজন অল রাউন্ডার ইনভেস্টিগেটর, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সীর চীফ। মজার ব্যাপার হলো, সুপার পাওয়ারগুলো নিজেদের মধ্যে কোল্ড-ওয়রে মেতে থাকলেও, তোমার সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে ওরা কেউ কারও চেয়ে কম নির্লজ্জ নয়। সুযোগের ফায়দা লুটতে তুমিও কম যাও না—কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গালে চুমু খাচ্ছ, কখনও সোভিয়েত রাশিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরছ,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সী দু'হাতে টাকা কামাচ্ছে। আটকা পড়া লোককে উদ্ধার করে আনার ব্যাপারে তুমি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছ। বিশেষ করে রুমানিয়া থেকে একজন বিজ্ঞানীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসে, এবং ইসরায়েল থেকে একজন বিজ্ঞানীকে মস্কোয় পৌঁছে দিয়ে সি. আই. এ. এবং কে. জি. বি.-র অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছ তুমি। অতি সম্প্রতি জেফারসন নামে একজন আমেরিকান ইউ-টু পাইলটকে, স্পাই হিসেবে যার বিচার হতে যাচ্ছিল, টিরানার সিকিউরিটি প্রিজন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশংসা অর্জন করেছ।'

'আসল কথায় এসো।' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'কি বলতে চাও?'

'আগস্ট উনিশশো একাশি সাল,' রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি মারানজানা, বলে চলল, 'শরমিন, বাইশ, তোমার বন্ধুর বোন, স্কলারশিপ নিয়ে লেখাপড়া করছিল বোম্বেতে, ভারতীয় স্টুডেন্টদের একটা গ্রুপের সাথে কাবুলে গিয়েছিল সেখানকার একটা কলেজের আমন্ত্রণে। একজন রাশিয়ান সোলজারকে হত্যা করার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় শরমিনকে। শরমিন তার পিঠে পর পর তিনবার গুলি করেছিল।'

'ঠিক,' বলল রানা। 'সেই মুহূর্তে লোকটা তেরো বছরের একটা মেয়েকে রেপ করার চেষ্টা করছিল।'

'খবর পেয়ে, সরকারী অনুমতি ছাড়াই বেআইনীভাবে আফগানিস্তানে

অনুপ্রবেশ করো তুমি, এবং আন্ডারগ্রাউন্ড অর্গানাইজেশনের সাহায্য নিয়ে মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসো। আসার সময় পাকিস্তান-আফগানিস্তান বর্ডারে ছোটখাট একটা গান-ফাইটেও অংশ গ্রহণ করো।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'অনেক কিছুই জানো দেখছি।' মনে মনে স্বস্তি বোধ করছে রানা—লোকটা ওর আসল পরিচয় বা বি. সি. আই-র সাথে ওর সম্পর্কের কথা কিছুই জানে না।

'আরও আছে,' চোখ মটকে বলল মারানজানা। 'গত বছর···'

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে,' বলল রানা। 'এবার মতলবটা কি বলে ফেলো তাড়াতাড়ি।'

'বেশ,' ভারী কাঁধটা ঝাঁকাল মারানজানা। 'কিন্তু এমন কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো তোমার পেশা সংক্রান্ত নয়, অথচ আমাদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে-সম্পর্কে দু'একটা কথা না বললেই নয়।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জালুচির দিকে তাকিয়ে হাসল মারানজানা। 'তোমাকে দয়ার সাগর বললেও কম বলা হয়। নিজ কর্মচারী, বিপদগ্রস্ত বন্ধু-বান্ধব, পঙ্গু প্রতিবেশী—এদের জন্যে আলাদা বাজেট আছে তোমার। শুধু তাই নয়, এদের সর্বশেষ খবরাখবরও রাখো তুমি। মোট কথা, এদের জন্যে তোমার অন্তরে সত্যিকার দরদ আছে—মোটেও লোক দেখানো কিছু নয়। একটা মাত্র উদাহরণ দিই।···লন্ডনের টমসন ব্রেকের কথাই ধরো। তার মত দক্ষ স্টেনোগ্রাফার সারা লন্ডনে আর একজন ছিল কিনা সন্দেহ। তোমার অফিসে জয়েন করল, কাজও করল বছর খানেক, তারপর সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল—তোমার লন্ডন অফিসে বিস্ফোরিত হলো একটা বোমা। মারা গেল টমসন।' সিগারে টান দিল মারানজানা, কিন্তু ধোঁয়া বেরুল না দেখে তাতে আবার আগুন ধরাল সে। জানতে চাইল, 'কোথাও কোন ভুল করছি না তো?'

'বলে যাও,' বলল রানা।

'আগেই ক্যানসারে মারা গিয়েছিল টমসনের স্ত্রী, পরিবারে ছিল বুড়ি মা এবং অন্ধ এক মেয়ে, কিটি ব্রেক। কিটির তখন তেরো বছর বয়স। টমসন মারা যাওয়ায় কিটি এবং তার দাদী অন্ধকার দেখল চোখে। টমসন ভাল রোজগার করত বটে, কিন্তু বৃদ্ধা মা আর অন্ধমেয়ের চিকিৎসায় সব টাকা খরচ হয়ে যেত, সঞ্চয় বলতে কিছুই রেখে যেতে পারেনি। কোন ইনস্যুরেন্সও ছিল না যে থোক টাকা হাতে পাবে। যাই হোক, তুমি থাকায়, ওদেরকে কোন অসুবিধেতে পড়তে হলো না। বুড়ি এবং কিটির ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তুমি নিজের কাঁধে তুলে নিলে। লন্ডনের একটা ভাড়া বাড়িতে থাকে ওরা। তিন বছরে বুড়ি আরও বুড়ি হয়েছে, আর কিটি এখন রয়েল কলেজ অভ মিউজিকে পিয়ানো শিখছে। এখন তার বয়স ষোলো।' সিগারে আয়েস করে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'আমার তথ্যে কোন ভুল নেই তো?'

'বুঝলাম, অনেক খবরই রাখো তোমরা,' বলল রানা। 'কিন্তু এসবের মানে কি?'

'আটকে পড়া লোককে উদ্ধার করে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সী কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছে,' বলে চলল মারানজানা। 'ছোটখাট কাজ তাই

আর ছুঁতে চায় না সে। মাস তিনেক আগে একজন লোক ঢাকায় তোমার সাথে দেখা করে তোমাকে পাঁচ লাখ ডলারের একটা প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটা ছিল. ববি ইউজিন নামে এক মার্কিন নাগরিককে ইসরায়েল থেকে বের করে আনতে হবে। ববি সেখানে কারাদণ্ড ভোগ করছে। প্রস্তাবটা তুমি পায়ে ঠেল। এত টাকা কামিয়েছ যে পাঁচ লাখ ডলার তোমার কাছে কিছুই নয়!'

দীর্ঘ কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর হঠাৎ করেই গোটা ব্যাপারটা খাপে খাপে বসে গেল। 'তুমিই তাহলে···?'

রানাকে বাধা দিয়ে সালভাদর মারানজানা বলল, 'ববি ইউজিন আমার সৎ ছেলে, মি. রানা,' নরম সুরে বলল সে। 'আমার মৃতা স্ত্রীর ছেলে। স্বীকার করি, ছেলেটা বখে গেছে, আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না, কিন্তু তবু সে আমার প্রিয় স্ত্রীর একমাত্র সন্তান তো বটে! কিভাবে আমি তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি? বোধহয় আমার ওপর রাগ করেই, অথবা সঙ্গদোষে পড়ে, কিংবা জানি না কি কারণে প্যালেস্টাইন গেরিলাদের দলে নাম লেখায় সে। একজন আমেরিকান, আরবদের পক্ষ নিয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ভাবতে পারো?' দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল সে। 'জেরুজালেমে গিয়ে গেরিলা অপারেশনে অংশ নিয়েছিল সে, ওখানেই ধরা পড়ে। সামরিক আদালত যাবজ্জীবন দেয় ওকে।' সিগারের আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কি যেন ভাবল মারানজানা, তারপর আবার বলল, 'ও যাতে ক্ষমা পায় তার জন্যে আমার সাধ্যের বাইরেও চেষ্টা করেছি আমি, কিছুতেই কিছু হয়নি। ওর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অনেক প্রমাণ আছে, তাই শাস্তিটা পুনর্বিবেচনা করে দেখতেও রাজি নয় ইসরায়েল সরকার।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল সে। 'আমি আমার ছেলেকে ফেরত চাই।'

রাগে সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেল রানার। 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ গোটা ব্যাপারটা প্রথম থেকেই বানানো? কেপ ডি গাটার বিলে লী এনফিল্ড রাইফেলধারী সেই লোকটাকে তাহলে তুমিই পাঠিয়েছিলে?'

'তার কাজ ছিল তোমার মনে একটু ভয় ধরিয়ে দেয়া,' বলল মারানজানা। 'কিন্তু সে বোধহয় অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল!'

'আমার সাথে কেউ বাড়াবাড়ি করলে তার পরিণতি কি হয় তা নিশ্চয়ই জানা হয়ে গেছে?'

কপালে ভুরু তুলে গম্ভীর সুরে বলল মারানজানা, 'সত্যি কথা বলতে কি, তুমি আমাকে তাজ্জব করে দিয়েছ, মি. রানা। আমার জীবনে ওর মত ভাল স্লাইপার আমি আর দেখিনি।'

'এবং তারপরের ঘটনাগুলো? আমাকে গর্তে ফেলা হলো কেন?'

'ব্রেনওয়াশ টেকনিকের সাথে তোমার পরিচয় নেই, এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না। বিশেষ করে চাইনীজ পদ্ধতিটা তোমার অজানা থাকার কথা নয়। প্যাভলোভিয়ান কনসেপ্ট। সবচেয়ে আগে ব্যক্তির অহমে আঘাত করা। তার জীবনের সমস্ত শৃঙ্খলা এবং প্যাটার্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে আত্মবিশ্বাসের ভিত উপড়ে ফেলা। সম্ভব হলে তাকে মানবেতর পর্যায়ে নামিয়ে আনা।'

'বোঝা গেল, তুমি একটা বুদ্ধু! আমাকে ধরে আনলেই ল্যাঠা চুকে যেত, এত

আয়োজনের কোন দরকার ছিল না।'

'মুখ সামলে কথা বল, শালা! ঘুসি মেরে দাঁত ফেলে দেব!'

রাগের মাথায় খেয়ালই ছিল না রানার যে পায়ে বেড়ি পরানো রয়েছে, জালুচির দিকে এগোতে গিয়ে হোঁচট খেল সে, আরেকটু হলে আছাড় খেত।

'আমি শুধু প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম, আমার মুঠোর ভেতর তুমি একটা অসহায় পুতুল, মি. রানা,' বলল মারানজানা। 'তোমার ওপর যা করা হয়েছে, সে-সবের পেছনে এই একটাই উদ্দেশ্য ছিল। পালাবে, তার কোন উপায় তোমার নেই। আমি যতক্ষণ না মুক্তি দিই তোমাকে ততক্ষণ নিরাপদ আশ্রয় বলে কিছু নেই তোমার জন্যে। এখানে এমন কেউ নেই যাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো।'

'ইউ ক্যান গো টু হেল,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল রানা।

শান্তভাবে হাসল মারানজানা। 'আমার প্রস্তাব একবার তুমি প্রত্যাখ্যান করেছ, ইচ্ছে করলে দ্বিতীয়বারও প্রত্যাখ্যান করতে পারো। কিন্তু আমি জানি, তা তুমি করবে না। কেন করবে না, সেটা এখন দেখাব তোমাকে।' হাত বাড়িয়ে ছোট একটা হ্যান্ডবেলের বোতামে চাপ দিল সে।

একমুহূর্ত পরই দেয়ালের গায়ের গেট খুলে ভেতরে ঢুকল লিলি আলবিনো, এগিয়ে এসে মারানজানার পাশে দাঁড়াল সে। চেহারায় কোন ভাব নেই। পরনে সিল্কের মিনি ড্রেস, রঙটা অলিভ গ্রীন, বুকের কাছে অনেকটা খোলা।

'আমাদের লিলি ভারি সুন্দর দেখতে, তাই না, মি. রানা?'

ঝুঁকে পড়ে মারানজানার নাকের পাশে চুমু খেল লিলি। আদর করার ছলে লিলির স্কার্টের কিনারা দিয়ে ভেতরে একটা হাত গলিয়ে দিল মারানজানা, মৃদু চাপড় দিল উরুর ওপর। অপর হাত দিয়ে ফোল্ডারটা টেনে নিয়ে খুলল সে।

'দশই আগস্ট, সকাল সাড়ে দশটায় লিলিকে নিয়ে আলমেরিয়া থেকে ফিরল সাবজেক্ট। টেরেসে প্রেম করল ওরা। বিকেল সাড়ে চারটে, সুইমিং পুল থেকে লিলিকে নিয়ে ফিরল সাবজেক্ট। টেরেসে প্রেম করল ওরা। আরও শুনতে চাও? শুধু রিপোর্ট নয়, সেই সাথে পরিষ্কার ফটোও আছে আমাদের কাছে।' হাসি ভরা মুখ তুলে লিলির দিকে তাকাল মারানজানা। লিলির উরুর মাংস হালকাভাবে খামচে ধরল সে। 'আমাদের এই লিলি এসব জিনিস খুব উপভোগ করে!'

'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তুমি,' বলল রানা। 'আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না।'

'নিশ্চয়ই আসবে!' ইঙ্গিত পেয়ে একজন ঠেলে নিয়ে এল হুইল চেয়ারটা। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে সাহায্য না করে উপায় নেই তোমার। বিশ্বাস না হয়, এসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।' হুইল চেয়ারে উঠে বসল মারানজানা।

শান্ত চোখে লিলির দিকে একবার তাকাল রানা। শান্তভাবেই ফিরিয়ে নিল দৃষ্টি। তারপর অনুসরণ করল মারানজানার হুইলচেয়ারকে। বাকি সবাই ওর পিছু নিল। বাগানের ভেতর দিয়ে শেষ মাথার একটা গেট পর্যন্ত এল ওরা। হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল রানার কান। কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে। বাজনাটা সাথে সাথে চিনতে পারল ও।—চাইকোস্কির দি সীজনস। গলার ভেতরটা শুকিয়ে গেল ওর। ঝিম ঝিম

করে উঠল মাথা। মারানজানাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল ও, সবার আগে পৌঁছে গেল গেটের পাশে লোহার বার লাগানো জানালার সামনে।

'টমসন ব্রেকের অন্ধ মেয়ে কিটি, মি. রানা,' নরম সুরে বলল মারানজানা। 'এই মুহূর্তে লন্ডনে পড়াশোনা করার কথা ওর। উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাও।'

আগেই তাকিয়েছে রানা, দেখতে পেল বড় একটা লাইব্রেরীর মাঝখানে রয়েছে গ্র্যান্ড পিয়ানোটা, সেটার সামনে বসে আছে কিটি। তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে সে।

শান্ত প্রকৃতির, একহারা গড়নের মেয়ে কিটি। মাথায় ঘন কালো একরাশ চুল। কিটির চোখের মণি দুটোও কালো। শুধু দৃষ্টিতে রাজ্যের শূন্যতা দেখে বোঝা যায়, সে অন্ধ।

বছরে দু'একবারের বেশি কিটিকে দেখতে যেতে পারে না রানা। অবশ্য লন্ডনে গেলে কিটির সাথে দেখা না করে ফেরে না ও। সেন্ট জন'স উডে ভাড়া করা একটা বাড়িতে বুড়ি দাদী-মার সাথে থাকে সে, তার দাদী-মাও চোখে ভাল দেখতে পায় না, তাই সংসারের কাজে সাহায্য করার জন্যে একটা মেইড সারভেন্ট রাখতে হয়েছে।

শেষবার কিটিকে দেখেছে রানা নয় মাস আগে, ওদের রয়েল কলেজ অভ মিউজিকে স্টুডেন্ট কনসার্ট প্রতিযোগিতায়। ওখানে বাজাবার সময় কিটির চেহারায় যে ধ্যান-মগ্নতা লক্ষ্য করেছিল রানা, এখানেও সেই আত্মস্থ ভাব লক্ষ্য করল ও।

লাইব্রেরীর একটা দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল বিশাল এক মেয়েলোক, হাতে চেন, পাশে একটা কালো ডোবারম্যান পিনশার। দ্রুত এগিয়ে কিটির পাশে চলে এল কুকুরটা, কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাজনা থামিয়ে কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল কিটি।

'অবিশ্বাস্য!' অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল মারানজানার চেহারায়। 'প্রাউ পাসোডেনা ছাড়া আর কাউকে সহ্যই করতে পারে না জানোয়ারটা! অথচ!'

'আমাদের এই ডোবারম্যানের প্রিয় হবি কি জানো, রানা?' ঠোঁটে এক চিলতে হাসি নিয়ে বলল জালুচি। 'লোকের হাত ছিঁড়ে নেয়া। তোমাকে একটা সু-পরামর্শ দিই—ওর কাছ থেকে একশো গজ দূরে থেকো।'

প্রাউ পাসোডেনার বয়স হবে ষাট, বুড়ো ঈগলের মত চেহারা, মাথায় খয়েরী রঙের চুল, চাঁদির কাছে মুকুটের আকৃতিতে খোঁপা করা। পরনে কালো আলখেল্লা ধরনের ঢোলা পোশাক, তার ওপর সাদা অ্যাপ্রন। মেয়েলোকটার পা দুটো একটু বাঁকা। এই মেয়েলোক কখনও যদি কোন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থেকে থাকে, নিশ্চয়ই গার্ড হিসেবে ছিল।

কিটিকে কি যেন বলল পাসোডেনা, সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল কিটি। তার হাত ধরে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে গেল বুড়ি।

শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা, 'কিভাবে নিয়ে এলে ওকে?'

'তোমার সাথে ছুটি কাটাতে এসেছে ও। ব্যবস্থা করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি আমাদের। কিটির দাদী-মা তোমার একটা মেসেজ পেয়েছিল টেলিফোনে,

ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে গেল। বুড়ি নিজে হ্রিথরো এয়ারপোর্টে এসে পুতনীকে তুলে দিয়েছে প্লেনে। গত কাল পাল্মার্মো এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে ওর প্লেন, সেখানে হাজিরা দেয় জালুচি, কিটিকে জানায় বিশেষ একটা জরুরী কাজে কোথাও গেছ তুমি, তাড়াতাড়িই ফিরবে।' মোটা ঠোঁট ফাঁক করে হাসল মারানজানা। 'সব বোঝা গেছে, স্যার?'

জ্যান্ত একটা হিংস্র পশুর মত শরীরের ভেতর প্রচণ্ড রাগ মোচড় খাচ্ছে, কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রাখল রানা। 'হুঁ।'

'পরস্পরকে আমরা যদি বুঝতে পারি, তাহলে কোথাও আর কোন গোলমাল থাকে না!' হাত তুলে দুর্গ প্রাচীরটা দেখাল মারানজানা। 'পাঁচিলের ওই মাথা থেকে চারশো ফিট নিচে সৈকত। লম্বা একটা ড্রপ। ওখান থেকে কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে নিচে পড়তে বেশ অনেকটা সময় লাগবে তার, কি বলো?' মুখে নতুন একটা সিগার গুঁজল সে। সাথে সাথে লাইটার জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিল জালুচি। নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল মারানজানা। 'তবে সে যদি অন্ধ হয়, কিছুটা অন্তত বাঁচোয়া! সে তো আর দেখতে পাবে না চার ফিট নাকি চোদ্দ হাজার ফিট নিচে পড়তে যাচ্ছে!'

ডাইভ দিল রানা, কিন্তু লোহার বেড়িতে পা বেধে যাওয়ায় আছাড় খেয়ে পড়ল মারানজানার ছড়ি জোড়ার সামনে। ভোজবাজির মত জালুচির হাতে বেরিয়ে এল একটা ছোট্ট পিস্তল। সেটা রানার বুক লক্ষ্য করে ধরল সে।

ছড়ির ডগা দিয়ে রানার পেটে মৃদু একটা খোঁচা দিল মারানজানা। বিষণ্ণ চোখে তাকাল পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লিলির দিকে। লিলির চেহারায় ভাবের কোন প্রকাশ নেই। 'আমার সম্পর্কে ওকে কিছু বলো তুমি, লিলি।'

আদুরে ভঙ্গিতে হেসে উঠে লিলি বলল, 'ওরেব্বাপ! অত কথা আমি গুছিয়ে বলতে পারব না!'

কাঁধ ঝাঁকাল মারানজানা, নিষ্ঠুর চেহারায় আবার বেমানান হাসি দেখা গেল। 'নিজের গীত নিজেই গাই তাহলে! তুমি ঠিকই বলেছ, মি. রানা! সারাটা জীবন আমি অপরাধ জগতে বিচরণ করেছি। আল কাপুনি, ও' বানিয়ন, ফ্র্যাংক নিটি, লেগস ডায়মন্ড—এদের সবাইকে আমি চিনতাম। এরা সবাই অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে, কিন্তু আমি আজও দিব্যি বেঁচে আছি। কেন, জানো? কারণ, যখন যা বলি, সেটা করে দেখাই আমি। কখনও আপস করি না, পিছপা হই না, পরাজয় স্বীকার করি না। কোন কাজ যখন করি, লক্ষ্য রাখি তাতে যেন কোন খুঁত না থাকে। সেজন্যে যতই মূল্য দিতে হোক, দিই। যতই নিষ্ঠুর হতে হোক, হই। বুঝেছ?'

থামল মারানজানা, নিস্তব্ধতা ভারী হয়ে উঠল, তারপর আবার শুরু করল সে, 'যাকে বলে সোসাইটি গার্ল, বোস্টনে আমার স্ত্রী ছিল তাই। খ্যাতি, মান-সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং ধন-সম্পদ, সবই ছিল অঢেল। যখন বলল, আমাকে বিয়ে করতে চায়, আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। আমাদের বিবাহিত জীবনটা…'

কর্কশ মুখে একটা হাত দুলিয়ে নিল মারানজানা। 'তার এই ছেলেটা বরাবরই একটা সমস্যা ছিল। কিন্তু সে মারা যাবার আগে আমি তাকে কথা দিয়েছি, ববির জন্যে সাধ্যমত করব আমি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, কঠোর এক টুকরো হাসি

দেখা গেল মুখে। 'আগেই বলেছি, ছেলেটা আমাকে দু'চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ওর মাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করব, ইসরায়েলের কারাগার থেকে তাকে আমি যেভাবে হোক উদ্ধার করে আনবই।' কণ্ঠে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা ফুটে উঠল। 'আমার হয়ে কাজটা করে দিচ্ছ তুমি। এতে কোন ভুল নেই।'

ঠিক এই মুহূর্তে বলার মত কিছু নেই রানার, চুপ করেই থাকল ও। একটা বৃত্ত রচনা করে হুইল চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিল মারানজানা, জালুচিকে বলল, 'ঠিক আছে, নিয়ে এসো ওকে।' হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে চলল লিলি আলবিনো।

রানাকে ধরে দাঁড় করাল আটানা। সোয়েটার পরা দুই হোঁৎকা ওকে দু'পাশ থেকে ধরল, ওকে মাঝখানে রেখে হাঁটিয়ে নিয়ে এল আগের জায়গায় সামিয়ানার নিচে। মারানজানা আগেই ফিরেছে। টেবিলের ওপর তার সামনে এক গ্লাস ওয়াইন।

গ্লাসে কয়েকটা চুমুক দিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'আমি স্পষ্ট ভাষায় আবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার নির্দেশ অমান্য করার চেষ্টা করলে পাঁচিলের ওপর থেকে নিচের সৈকতে পড়ে যাবে অন্ধ মেয়েটা। চারশো ফিট মনে আছে তো?'

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে মাথাটা ওপর-নিচে একটু দোলাল রানা।

'আমার বক্তব্য পরিষ্কার বুঝেছ?'

'পরিষ্কার,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'ভেরি গুড,' আটানার দিকে ফিরল সে। 'খুলে দাও বেড়ি।'

নিঃশব্দে রানার পায়ের বেড়ি খুলে দিল আটানা। পা দুটো মুক্ত হলেও নিজের জায়গা থেকে একচুল নড়ল না রানা। জানতে চাইল, 'এরপর?'

'এরপরের ব্যাপার সম্পূর্ণ তোমার ওপর নির্ভর করছে। যা যা চাইবে তুমি, সব পাবে। টাকা, ইকুইপমেন্ট, লোকবল। শুধু মুখ ফুটে চাইতে হবে। ইসরায়েলি পুলিস ববিকে যেখানে রেখেছে—জায়গাটার প্ল্যান, ম্যাপ, এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য, যা আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, সব তোমার বেডরুমে পাবে। আর, জজবা নামে এক লোক তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'কে সে?'

'জেলখানার নাম নাখাল, সেখান থেকে পনেরো মাইল দূরে ছোট একটা উপকূল শহর আছে। এই শহরে থাকে লোকটা, মদ কেনাবেচার ব্যবসা করে।'

'শুধু মদ?'

'না, না। আফিম, নারী ইত্যাদির ব্যবসাও তার আছে। লোকটার কাছ থেকে অনেক সাহায্য পাবে তুমি।'

এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল রানা, একটা গ্লাসে খানিকটা পানি ঢালল। তাকাল মারানজানার দিকে। 'কি রকম সময় পাচ্ছি?'

'দুই হপ্তা।'

'সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব?' গ্লাসে চুমুক দিল রানা।

চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটিয়ে মাথা ঝাঁকাল মারানজানা। 'সম্পূর্ণ।'

'নিজের ইচ্ছে মত তৈরি করতে পারব টীম?'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। ঠোঁটে বাঁকা একটু হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জালুচি।

ইঙ্গিতে সোয়েটার পরা লোক দু'জনকে দেখাল মারানজানা, বলল, 'বোরো আর গাটো অত্যন্ত শক্তিশালী লোক, সাহসও আছে; আর জালুচি···'

'জালুচি?' বাধা দিল রানা। 'ওর মেয়েলি ঢঙের চুলই তো আমার পছন্দ নয়! তাছাড়া, সব কিছুতে প্রথম হতে চায় ও, আগে থাকতে চায়—আরেকটা মেয়েলি স্বভাব।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ও। 'এ-ধরনের মোমের পুতুলকে দশ ফুট লম্বা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ছুঁতেও রাজি নই আমি। হয় আমার নিজের টীম, না হয় প্ল্যান বাতিল!'

রানার কথায় মজার ব্যাপার কি ছিল রানা নিজেও তা বুঝতে পারল না, কিন্তু মারানজানা হো হো করে হেসে উঠল। সযত্নে জালুচির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকল সে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, মি. রানা। তোমার শর্ত শিরোধার্য।'

'গুড,' বলল রানা। 'এবার পথ দেখিয়ে কেউ নিয়ে চলো আমাকে। শাওয়ার সেরে আমি ঘুমাব।'

'অবশ্যই,' বলল মারানজানা। 'কিন্তু তোমার যাবার আগে জরুরী দুটো কাজ সারতে হবে।' জালুচির দিকে ফিরল সে। 'দেখো তো, লন্ডন থেকে কলটা এল কিনা।'

ফোনের রিসিভার তুলে ইতালিয় ভাষায় সংক্ষেপে কথা বলল জালুচি। তারপর মারানজানার দিকে ফিরে বলল, 'বুড়ি নেই, মার্কেটিং করতে বেরিয়েছে, কিন্তু মেইড সারভেন্টকে পাওয়া গেছে লাইনে।' কথা শেষ করে রানার দিকে রিসিভারটা বাড়িয়ে ধরল সে।

'কিটির দাদীর জন্যে একটা মেসেজ দাও মেইড সারভেন্টকে, মি. রানা,' বলল মারানজানা। 'বুড়িকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেলে রাখার কোন মানে হয় না, কি বলো?'

ঠাণ্ডা চোখে মারানজানার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর জালুচির হাত থেকে ছোঁ মেরে রিসিভার নিয়ে মেইড সারভেন্টের সাথে কথা বলল এক মিনিট। কথা শেষ করে খটাস করে রেখে দিল রিসিভার। 'এখন আমি যেতে পারি?'

'এক মিনিট,' বলল মারানজানা। জালুচির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সে। আবার ফোনের রিসিভার তুলে নিল জালুচি, তারপর ইন্টারকমের একটা বোতামে চাপ দিল। 'তোমার কর্মচারীর মেয়ে কিটি, মি. রানা। খামোকা বেচারীকে দুশ্চিন্তায় ফেলার দরকার কি? আমি জানি, তুমি এখন কায়রোয় আছ! জরুরী ব্যবসায়িক কাজে আটকা পড়ে গেছ ওখানে। তবে চেষ্টা করছ হপ্তাখানেকের মধ্যেই যাতে ফিরতে পারো।'

জালুচি আবার রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ফোনের রিসিভার। সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ও হাত বাড়াচ্ছে না দেখে জালুচি বলল, 'সিনর মারানজানার মাথায় কেমন উদ্ভট সব স্যাডিস্টিক চিন্তা-ভাবনা আসে, তার প্রমাণ তো আগেই পেয়েছ তুমি। কাজেই, আমার পরামর্শ, গোয়ার্তুমি দেখাতে গিয়ে নিজের ক্ষতির

পরিমাণ শুধু শুধু বাড়িয়ো না!'

মারানজানার চোখে চোখ রেখে হাত বাড়িয়ে রিসিভার নিল রানা। কানের কাছে রিসিভারটা নিয়ে যাবার আগেই কিটির ক্ষীণ যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। গলায় খুশি খুশি ভাব এনে কিটির সাথে কথা বলল ও। 'কিটি? আমি রানা।'

আনন্দে উত্তেজনায় বকবক করে একটানা অনেক কথা বলে গেল কিটি। শান্ত মনোযোগের সাথে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মারানজানা আর জালুচি। সংক্ষেপে, গুছিয়ে কয়েকটা কথা বলল রানা। ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিল যোগাযোগ। রিসিভারটা নামিয়ে রাখার সময় লক্ষ্য করল, হাতটা একটু একটু কাঁপছে। 'এবার আমি যেতে পারি?' কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল ও।

'অবশ্যই, মি. রানা!'

ঘুরে দাঁড়াবার কথা রানার, কিন্তু তা না ঘুরে মারানজানার দিকে এগোল সে। পিছন থেকে সাথে সাথে হাত পড়ল ওর কাঁধে। 'ওদিকে নয়!' বলল আটানা।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। আধপাক ঘুরেই আটানার তলপেটে হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল ও। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে গেল আটানার, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। হাঁটু দিয়ে তার মুখে আবার মারল রানা। সিঁড়ির ওপর গিয়ে পড়ল প্রকাণ্ড শরীর, ধাপগুলোর ওপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে গেল নিচে। পরমুহূর্তে ঝট্ করে ফিরল রানা, কিন্তু লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেছে জালুচি, চেহারায় ঠিক কৌতুক নয় তবে কৌতুকের কাছাকাছি একটা ভাব ফুটে উঠেছে।

'তোমাকেও দেখে নেব আমি, বাস্টার্ড, কিন্তু আজ নয়!' ঘুরে দাঁড়াল রানা, দ্রুত নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। হঠাৎ ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছে ও।

তিন

বড়সড় সৌখিন বাথরুম। সোনালী সিংহের মুখ থেকে চকচকে কালো পাথরের টাবে পানি পড়ছে। হাত ডুবিয়ে পরখ করল রানা, একটু একটু গরম। টাবে নেমে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে থাকল ও। প্রায় ঘণ্টাখানেক।

যেভাবেই হোক কিটিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝল, কাজটা করার চেয়ে বলা সহজ। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় মারানজানা যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে ওকে। কিন্তু তার মানে আসলে গোপন জায়গা থেকে সারাক্ষণ নজর রাখা হয়েছে ওর ওপর, এবং এই দুর্গ থেকে কারও পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

গোসল সেরে দাড়ি কামাল রানা। কোমরে একটা তোয়ালে জড়িয়ে নিয়ে ফিরে এল বেডরুমে। সাদা ওভারঅল পরা এক সিসিলিয়ান গ্রাম্য মেয়েলোককে দেখল ও, হাতের কাপড়চোপড় বিছানার ওপর নামিয়ে রাখছে। রানাকে ঢুকতে দেখে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

আন্ডারওয়্যার, স্ল্যাকস, শার্ট, জুতো—নিখুঁতভাবে ফিট করল সব। এ-ধরনের ছোটখাট তথ্য যোগান দিতে নিশ্চয়ই কোন অসুবিধে হয়নি লিলির। তার কথা মনে পড়ে যেতে নিজের ওপর একটু রাগ হলো রানার, কেউ বোকা বানালে অনেকেরই এই রকম নিজের ওপর রাগ হয়। তবে লিলিকে নিয়ে কয়েক সেকেন্ডের বেশি মাথা ঘামাল না ও। চিন্তা করার মত আরও অনেক জরুরী বিষয় রয়েছে।

টেরেসে বেরিয়ে এল ও। দেখল, এরই মধ্যে একটা ড্রিঙ্ক-ট্রলি রেখে যাওয়া হয়েছে। তাতে নানা ধরনের ড্রিঙ্কস। মারানজানা, অথবা লিলি, সমস্ত ব্যাপারেই খেয়াল রেখেছে। একধারে একটা লোহার তৈরি টেবিল, তার ওপর একটা ম্যানিলা ফোল্ডার পড়ে থাকতে দেখল রানা। হাতে একটা কোক নিয়ে টেবিলের সামনে আরাম কেদারায় বসল ও। ফোল্ডারটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করল ভেতরের জিনিসগুলো।

জায়গাটার নাম তাদমোর, কারাগারটা সেখানেই। বহু যুগ আগে সামরিক দুর্গ হিসেবে এটাকে তৈরি করেছিল ইতালিয়ানরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রথমে জার্মানরা পরে ব্রিটিশরা এটা দখল করে নেয়। তার মানে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত এটাকে সামরিক কাজেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর দুর্গটা সামরিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, সেই থেকে এটাকে সাজাপ্রাপ্ত এবং বিপজ্জনক রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ কারাগার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফোল্ডারের সব জিনিস দেখে শেষ করতে পারেনি রানা, এই সময় রোগা-পাতলা এবং তাল গাছের মত লম্বা এক লোককে পেছনে নিয়ে টেরেসে উঠে এল জালুচি। সাদা লিনেনের স্যুট পরে আছে তালগাছ, কিন্তু তার তোবড়ানো চেহারার সাথে এই সুবেশ মানায়নি। লোকটার চোখ দুটো ছোট ছোট, দৃষ্টি দেখে মনে হয় সারাক্ষণ কি যেন মতলব ভাঁজছে। লম্বাটে হাড় ঠেলে বেরিয়ে আসা মুখে হিটলারী গোঁফ জোড়াও মানায়নি তাকে।

'এই যে কৃমিটাকে দেখছ, রানা, এর নাম ফেনিটো জজবা,' ইঙ্গিতে লোকটাকে দেখিয়ে বলল জালুচি। 'ব্যাটা তোমার উপকারে লাগতেও পারে, নাও পারে।'

দু'হাত দিয়ে একটা স্ট্র হ্যাট ধরে আছে জজবা। নির্লজ্জের মত হে হে করে একটু হাসল সে। রানার চেহারায় এই হাসির কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না।

ট্রলির দিকে তাকাল জালুচি, যেন রানার অনুমতি পেলেই এক গ্লাস মদ ঢেলে খেতে পারে—এমনি ভাব। একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমরা কথা বলো, আমি আসছি ঘুরে।'

জালুচি বেরিয়ে যেতে আবার জজবার দিকে ফিরল রানা। লোকটা আগের মতই হে হে করে হাসল একটু।

'নাখালে তোমার নাকি একটা মদের দোকান আছে?'

'জী, স্যার!' সাথে সাথে জবাব দিল জজবা। বিনয়ে বিগলিত দেখাল তাকে। উচ্চারণের ভঙ্গি শুনে বোঝা গেল ইংরেজী সে ভালই বলতে পারে।

'আর কি করো তুমি?'

'সব করি, স্যার। দুটো পয়সা বেশি আয় করার জন্যে সবই করি।'

'সিগারেট স্মাগলিং? হিরোইন? মেয়েমানুষ?'

উত্তর না দিয়ে হাতের হ্যাটটা দ্রুত নাড়াচাড়া করতে শুরু করল জজবা। কিন্তু কথা না বললে কি হবে, তার চোখে একটা ভাষা ফুটে উঠল—অনেকটা কৌতুকের, কিছুটা স্বীকারোক্তির, খানিকটা ক্ষমা প্রার্থনার।

আরাম কেদারায় হেলান দিল রানা। ইঙ্গিতে ফোল্ডারটা দেখিয়ে জানতে চাইল, 'এটা পড়েছ?'

'দরকার নেই, স্যার।'

'ঠিক আছে, কি জানো বলো।'

'নাখাল থেকে কারাগারটা মাইল পনেরো দূরে, স্যার। একেবারে সাগর ঘেঁষা একটা পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটার নাম তাদমোর। ওটা একটা দুর্গ, স্যার। ইতালিয়ানরা তৈরি করেছিল···'

'এসব আমি জানি,' অধৈর্যের সাথে বলল রানা। 'কারাগারে বন্দীদের সংখ্যা কত?'

'পাঁচশো।'

'গার্ড?'

'পাহারা দেয় সেনাবাহিনীর লোকেরা। কর্নেল খানজুমের অধীনে সাধারণত ছয়শো ট্রুপস থাকে তাদমোরে।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল জজবা। 'মানুষ নয়, স্যার! জানোয়ার!' চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। 'কর্নেল খানজুমের কথা বলছি, স্যার! ভারি বদ! বন্দীদের নিজের হাতে মারধর করে, ন্যাংটো করে গরম পানিতে চোবায়—তেল আবিব থেকে অর্ডার এলে নিজের হাতে খুনও করে!'

খানিকক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করল রানা। বর্ণনা শুনে কোনরকম উৎসাহ বোধ করল না ও। বন্দীর চেয়ে গার্ডের সংখ্যা বেশি। ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস্যও নয়।

'গার্ডদের সংখ্যা সম্পর্কে ঠিক জানো তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল জজবা। 'বেশিরভাগ রাজনৈতিক বন্দী, স্যার। এদের কেউ কেউ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, কিংবা এককালে ছিল। এদের কমুনিস্ট বা দেশদ্রোহী আরব বলে সন্দেহ বা অভিযুক্ত করা হয়েছে। আর তাদমোর কারাগারে আরবের যম হলো কর্নেল খানজুম।'

অন্যমনস্ক দেখাল রানাকে। খানিক পর মুখ তুলে তাকাল ও। 'মারানজানার সৎ ছেলে, ববি ইউজিন—তাকে ওরা যাবজ্জীবন দিয়েছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'তার বয়স এখন বিশ, ক'বছর জেল খাটতে হবে তাকে?'

'যাদেরকে যাবজ্জীবন দেয়া হয়, সাধারণত তিন বছরের বেশি জেল খাটতে হয় না তাদের,' বলল জজবা। 'কারণ, ওই তিন বছর শেষ হবার আগেই বেশির ভাগ কয়েদী মারা যায়। পায়ে চেন বাঁধা অবস্থায় রোজ আঠারো ঘণ্টা লোনা জলাভূমিতে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় তাদের। দুপুরের প্রচণ্ড গরমের সময়ও বিশ্রাম নিতে দেয় না কর্নেল খানজুম। পোকা-মাকড়ের মত মানুষ মরে ওখানে।'

ফোল্ডারের ভেতর দুর্গের একটা প্ল্যান এবং আশপাশের এলাকার একটা ম্যাপ

পাওয়া গেল। ভাঁজ খুলে সেগুলো টেবিলের ওপর বিছাল রানা। দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল জজবা।

সাগরের দিক ছাড়া দুর্গের বাকি তিন দিকের পাঁচিল চল্লিশ ফিট উঁচু, সেই সাথে কড়া প্রহরা এবং ফ্লাডলাইটের নিখুঁত আয়োজন। সাগরের দিকে পাঁচিল নেই, তার কারণ দুর্গের ঠিক ওই অংশ থেকে পাহাড়ের গা সোজা নেমে গেছে একশো পঞ্চাশ ফিট নিচের সৈকতে। এই পাহাড়ের খাড়া পাঁচিল বেয়ে কোনভাবেই ওঠা বা নামা সম্ভব নয়, অন্তত আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি। সম্ভবত চেষ্টা করেও দেখেনি কেউ। জজবা বলল, 'ওটা বেয়ে দুর্গে ওঠার আশা ছেড়ে দিন, স্যার।'

'সম্ভব নয়, ঠিক জানো?'

'জানব না মানে! বাইরের লোক একমাত্র আমিই তো ঘন ঘন দুর্গের ভেতর যাই-আসি।'

'বুঝলাম না।'

'হে, হে,' সবিনয় হাসল জজবা। 'অফিসার্স মেসে মদ আর স্পিরিট লাগে কিনা, আমিই ওসব সাপ্লাই দিয়ে থাকি!'

'ইসরায়েলি সৈনিকরা মদ খেতে পারে, কিন্তু এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ কারাগারে ডিউটি করার সময়ও?'

'তাদমোরে ওদের সাত খুন মাফ, স্যার! কর্নেল খানজুম নিজে একজন পাঁড় মাতাল, মেয়ে শিকারী...'

বাধা দিল রানা, 'কিভাবে সাপ্লাই দাও মদ?'

'মিলিটারি ট্রেনে করে ওদের যাবতীয় সাপ্লাই পাঠানো হয়, মদ নিয়ে এই অধম তাতেই উঠি।'

'ট্রেন সোজা দুর্গের ভেতর...'

রানার কথা শেষ হবার আগেই বলল জজবা, 'হ্যাঁ, সোজা দুর্গের ভেতর গিয়ে থামে ট্রেন, কিন্তু তাতে আপনার কোন সুবিধে হবে না, স্যার। ট্রেন থামার সাথে সাথে ট্রেনিং পাওয়া কুকুর নিয়ে হাজির হয় আর্মড গার্ডরা, গোটা ট্রেনের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করে ওরা। সাপ্লাই ছাড়া এই ট্রেনে করে শুধু নতুন বন্দী কিংবা সৈনিকদের নিয়ে আসা হয়।'

ভুরু কুঁচকে প্ল্যানটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'মিলিটারি আর বন্দী ছাড়া আর কেউ ভেতরে ঢোকে না? সিভিলিয়ান ওয়ার্কার নেই?'

'সৈনিকরা নিজেরাই সব কাজ করে, স্যার।' আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল জজবা, কিন্তু হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় থমকে গেল সে, খানিক চিন্তা করে আবার বলল, 'সিভিলিয়ান ওয়ার্কার নেই, তবে মেয়েমানুষ আছে, স্যার।' বলে হে হে করে একটু হাসল।

হাসিটা এমন বিচ্ছিরি শোনাল যে গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার, ইচ্ছে হলো লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় কষে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইল, 'মানে?'

'ওদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম, স্যার! রাতের মেয়েমানুষ, সাধারণত এই নামে ডাকা হয় ওদের। প্রতি শুক্রবার রাতে দুর্গের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়।'

'পরিষ্কার করে বলো।'

'মদের মতই কর্নেল খানজুমের আরও একটা দুর্বলতা—মেয়েমানুষ। বন্দীদের ওপর অত্যাচার চালাবার ব্যাপারে যতই কঠোর আর নিষ্ঠুর হোক, মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপারে সাগরের মত উদার আর ফুলের মত কোমল সে। মুসলিম আর কম্যুনিস্টরা তার দু'চোখের বিষ হলে কি হবে, এই একটা ব্যাপারে সাম্যবাদী নীতি মেনে চলে কর্নেল। অর্থাৎ সে তার অধস্তনদেরও মেয়েমানুষ উপভোগ করার সুযোগ দেয়।'

'বেশ্যা?'

'অবশ্যই, স্যার!' বিস্মিত দেখাল জজবাকে। 'একাধিক পুরুষের মনোরঞ্জন করার যোগ্যতা থাকতে হবে না!'

'কোত্থেকে আসে ওরা? কে সাপ্লাই দেয়?'

আবার সেই হে হে। 'এই অধমকেই নোংরা কাজটা করতে হয়, স্যার। বড় ঝামেলার কাজ, কখনও কখনও সেই তেল আবিব বা জেরুজালেম থেকে মেয়ে যোগাড় করে আনতে হয়—কিছুদিন পর পর সাহেবরা নতুন মুখ দেখতে চান কিনা!'

'ট্রেন করে নিয়ে যাওয়া হয়, নাকি ট্রাকে করে?'

'ট্রাকে করে, স্যার।'

'ভেতরে ঢুকতে পারে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল জজবা। 'দুর্গের বাইরে থামে ট্রাকগুলো, মেয়েদের নামানো হয়, তারপর গেট দিয়ে একজন একজন করে ঢোকানো হয় ভেতরে।'

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড কি যেন ভাবল রানা। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, 'এখন তুমি যেতে পারো। দরকার হলে আবার ডাকব।'

ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল তালগাছ। 'কোন উপকারেই কি লাগলাম না, স্যার?'

'বেরোও!' চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়ল রানা। প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল জজবা।

আরাম কেদারায় হেলান দিল রানা, চোখ বুজে কল্পনায় দেখতে শুরু করল দুর্গটাকে। খানিকপর একটু তন্দ্রা মত এল চোখে, ঘুমিয়ে পড়ল নিজের অজান্তেই।

সন্ধ্যা নামছে, এই সময় ঘুম ভাঙল রানার। বাতাস স্থির হয়ে আছে, মেঘলা আকাশ, বোধহয় বৃষ্টি হবে। হাত-মুখ ধুয়ে টেরেস পেরোল ও, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচের বাগানে। ইতিমধ্যে বাতাস ছেড়েছে। একটু একটু দোল খাচ্ছে নারকেল আর সুপারী গাছ, সাঁঝের ম্লান আকাশের গায়ে ঘন কালো দেখাচ্ছে তাদের শাখাগুলোকে। দু'একটা তারা দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে। কোথাও কোন শব্দ নেই, এমন কি কৃত্রিম জলপ্রপাতগুলোও এই মুহূর্তে স্তব্ধ। বিশ্ব চরাচর যেন গভীর ধ্যানে বসেছে।

বাগানে নেমে এসেও থামল না রানা। আরেক প্রস্থ সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল দুর্গ প্রাচীরের মাথার দিকে। চওড়া প্রাচীরের ওপর উঠে একটু থমকাল ও। রেলিঙের সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঝুঁকে পড়ে নিচের সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। খানিকক্ষণ ইতস্তত করল রানা, তারপর দেখল, বাতাসে লম্বা চুল উড়ছে। একটা মেয়ে! এগোতে গিয়েও আবার নিজেকে সামলে নিল রানা। আবছা অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু মূর্তিটা লিলি হওয়াও

বিচিত্র নয়।

ধীর পায়ে এগোল রানা। রেলিঙের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওর উপস্থিতি নিশ্চয়ই টের পেল মেয়েটা, কিন্তু সেটা বুঝতে দিল না রানাকে। এতক্ষণে তাকে চিনতে পেরেছে রানা। লিলিই।

সিগারেট ধরাল রানা। 'তারপর?'

'তারপর আবার কি?' রানার দিকে তাকাল না লিলি, কিন্তু উত্তর দিল সাথে সাথে। 'যদি ভেবে থাকো আমি মাফ চাইব, ভুল করবে।'

'মাফ চাওয়ার কোন দরকার নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু কয়েকটা ব্যাপার আমি বুঝিনি, বুঝিয়ে দিলে বাধিত হব।'

'যেমন?'

'এই রকম একটা জঘন্য কাজ কেন করলে?'

'এটা কোন প্রশ্ন হলো?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইল লিলি। রানা কিছু বলল না দেখে সে-ও চুপ করে থাকল কয়েক সেকেন্ড, তারপর একেবারে শান্ত গলায় বলল, 'তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। বলতে পারো, এই ধরনের কাজই আমাকে করতে হয়। মারানজানার হয়ে লোককে আমি ফাঁদে ফেলি। পেয়েছ তোমার প্রশ্নের উত্তর? এবার আমাকে একটু একা থাকতে দাও!'

'কিন্তু তোমার কিছু প্রশংসা পাওনা হয়েছে, সেগুলো অন্তত বলার সুযোগ দাও!' হাসিমুখে বলল রানা। 'বিছানায় তুমি সাংঘাতিক! ওখানে তোমার অভিনয়ের তুলনা মেলা ভার। তোমার যদি কখনও সার্টিফিকেট দরকার হয়, আমাকে বললেই...'

ঝট্ করে ঘুরেই চড় তুলল লিলি, কিন্তু হাতটা কব্জির কাছে ধরে ফেলল রানা।

ঝাপটা দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল লিলি, বলল, 'যাকে বলে সৎ আচরণ, তা তুমিও আমার সাথে করোনি! এমন ভান করেছিলে যেন আমাকে কিছুই তোমার না জানাবার নেই, অথচ নিজের সম্পর্কে আগাগোড়া সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলে গেছ!'

'সেজন্যেই বোধহয় প্রায় সব ব্যাপারে তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি,' বলল রানা। 'কিন্তু কিটির ব্যাপারে নয়। আমার দুর্বলতাকে পুঁজি করে যারা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করে, আমি তাদের ক্ষমা করি না।'

কিছু বলতে গিয়েও বলল না লিলি। ঘুরে দাঁড়াল সে, তাকাল অন্ধকার সাগরের দিকে।

'আমার জানতে ইচ্ছে করে,' বলল রানা, 'এত থাকতে মারানজানা কেন? আর লোক পেলে না?'

'ওর কাছে ঋণী আমি,' সাগরের দিকে চোখ রেখে মৃদু গলায় বলল লিলি। 'এক সময় আমাকে বাঁচিয়েছিল ও, সেজন্যে আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'আচ্ছা!'

কিন্তু রানার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের সুরটুকু উপেক্ষা করল লিলি, বলল, 'বছর তিনেক আগে প্যারিসে একটা লোককে ভালবাসতাম, কিন্তু পুলিস এসে হানা দেবার আগে পর্যন্ত জানতাম না যে হিরোইন স্মাগল করত সে। যখন জানলাম, তখন অনেক

দেরি হয়ে গেছে। মাফিয়ার একটা গ্রুপ চাইল, প্রেমিকের সাথে পুলিস যেন আমাকেও নিয়ে যায়। ঠিক এই অবস্থায় মারানজানা এসে আমাকে বাঁচায়। কম করেও দশ বছর জেল হত আমার।'

'মারানজানাকে আমি তাহলে ভুল বুঝেছি! দেখা হলে মাফ চেয়ে নেব, কি বলো? এমন একজন মহৎপ্রাণ দয়ালু মানুষ, আহা! তা, চুমো-টুমো ঠিক মত খাও তো? দেখো, তার সেবার যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়!'

রাগের সাথে দ্রুত রানার দিকে ফিরল লিলি, ঠিক এই সময় হাঁক দিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল মারানজানা। 'এই যে তোমরা দু'জন, এদিকে!'

ওপরের টেরেসে দেখা গেল মারানজানাকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা, এই সময় কেউ একজন সুইচ টিপে জ্বেলে দিল ফ্লাডলাইট। টেবিলের সামনে তিনটে চেয়ার ফেলা হয়েছে, কোণের চেয়ারটা দখল করে বসে আছে মারানজানা। তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন ওয়েটার।

ওদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে একগাল হাসল সে। 'এসো, আমার সাথে বসে গলা ভেজাও।'

একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। একটু ইতস্তত করল লিলি, তারপর সে-ও বসল ওর পাশের চেয়ারে। কিছু বলতে হলো না, রানাকে এক মগ বিয়ার দিল ওয়েটার। শ্যাম্পেন চেয়ে নিল লিলি।

'জালুচিকে দেখছি না যে?' জানতে চাইল রানা।

'কিটির সাথে সময় কাটাচ্ছে।' কথাটা শুনেই কঠোর হয়ে উঠল রানার চেহারা, তাই দেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মারানজানা। হাসি থামতে আবার বলল, 'দুশ্চিন্তার কিছু নেই, স্যার। পুরুষদের জন্যে জালুচি অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে, কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে তাকে দিয়ে কোন ভয় নেই!'

মারানজানার কথার অর্থ ধরতে না পারলেও, মনে মনে একটু স্বস্তি বোধ করল রানা।

একসাথে তিনটে কাজ ধুমসে চালিয়ে গেল মারানজানা। সিগার ফুঁকছে, মদ ঢালছে গলায়, সেই সাথে একনাগাড়ে বক বক করে চলেছে। দুনিয়ায় বুঝি এমন কোন বিষয় নেই যার সম্পর্কে কিছু না কিছু জানে না সে। দ্রুত প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ার অদ্ভুত একটা অভ্যেস আছে তার। রাজনীতি থেকে শিল্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা থেকে হাইজ্যাক—কিছুই তার আলোচনার তালিকা থেকে বাদ গেল না। রানা বা লিলি, দু'জনের কেউই বিশেষ কিছু বলল না। অবশেষে রানা যখন চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল, এতক্ষণে জানতে চাইল মারানজানা, 'নিশ্চয় ফাইলটা পড়েছ তুমি, জজবার সাথেও কথা বলেছ, তাই না? কি বুঝলে?'

'কাজটা সম্ভব। ভাল টীম পেলে করা যাবে।'

'হোয়াট!' অকৃত্রিম বিস্ময় ফুটে উঠল মারানজানার চেহারায়। 'নিশ্চয়ই বলতে চাইছ না যে দুর্গে ঢোকার পথ খুঁজে পেয়েছ তুমি?'

'পথ আছে, মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করলে যে-কেউ দেখতে পাবে সেটা। ব্যাংক অভ ইংল্যান্ড লুট হবার আগে পর্যন্ত লোকে মনে করত, ওখানে ঢোকার কোন পথ নেই; আসলে ছিল, তাই না?'

'হুঁ,' সায় দেবার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা দোলাল মারানজানা। 'কিভাবে ঢুকবে ভেতরে?'

'সেটা পরের ব্যাপার। তার আগে ভার্জিল সলোজা নামে এক লোকের সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

'কেন?'

'এ-ধরনের কাজের জন্যে সে একজন এক্সপার্ট।'

নিভে যাওয়া সিগারটা ধরাল মারানজানা। কপালের মাঝখানে চিন্তার রেখা নিয়ে রানার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে। তারপর জানতে চাইল, 'যখন কোন অ্যাসাইনমেন্টে জড়িত নয় তখন কি করে সে?'

'পালার্মোয় মড়াপৌতার ব্যবসা আছে তার।'

শরীর কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠল মারানজানা। তারপর বলল, 'বাই গড, ভাল লোককে বেছে নিয়েছ!' ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছল সে। 'ঠিক আছে, পালোর্মোয় গিয়ে দেখা করো তার সাথে। সকালে সেসনায় তোমাকে তুলে নেবে জালুচি।'

'সলোজা ছাড়াও আরও দু'জন লোককে দরকার হবে আমার,' বলল রানা। 'আশা করছি, সলোজাই এদের দু'জনকে বেছে বের করবে। এসব কিন্তু প্রচুর খরচার ব্যাপার।'

'কত?'

'টীমের জন্যে পঞ্চাশ থেকে আশি হাজার মার্কিন ডলার ধরে রাখো,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা আসলে নির্ভর করে সলোজা এই মুহূর্তে কত টাকার মানুষ তার ওপর। তাছাড়া, কাজটা বিপজ্জনক। একচুল ভুল হলে প্রাণ হারাতে হবে।'

'এই কাজের জন্যে যার সাথে যে-কোন চুক্তিতে আসতে পারো তুমি, মি. রানা,' বলল মারানজানা, 'আমি সে-চুক্তির মর্যাদা রাখব। অগ্রিম পেমেন্ট হিসেবে জালুচির পকেটে চল্লিশ হাজার ডলারের একটা বেয়ারার চেক থাকবে। তাতে তোমার সলোজা আশ্বস্ত বোধ করবে তো?'

'বোধহয়,' বলল রানা। 'কিন্তু জালুচি যেন আমাকে বিরক্ত না করে, বা আমার ওপর মাতব্বরির চেষ্টা না করে। তুমি ওকে সাবধান করে দেবে।'

'ঠিক আছে।' হাতের গ্লাসটা একটু উঁচু করে হাসল মারানজানা। 'গুডনাইট টু ইউ, মি. রানা।'

ওদেরকে রেখে বাগানে নেমে এল রানা। নিজের কামরার দিকে যাবার পথে বৃষ্টি নামল। ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

খোলা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে ডিভানে শুয়ে সিগারেট ধরাল রানা। অন্ধকার রাত আর বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু তন্দ্রা মত এসেছিল, হঠাৎ একটা শব্দে সচকিত হয়ে উঠল ও। আগের চেয়ে বেড়েছে বৃষ্টির প্রকোপ, ঝমঝম আওয়াজকে ছাপিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছে করুণ একটা সুর। কে যেন কোথাও পিয়ানো বাজাচ্ছে।

ওয়ারড্রোব থেকে একটা পুরানো রেনকোট বের করে পরে নিল রানা। টেরেসে বেরিয়ে এসে চারদিকটা দেখে নিল দ্রুত। বৃষ্টির প্রায়নিশ্ছিদ্র চাদর ভেদ

করে বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। মাথার ওপর ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে উথাল পাথাল সাগর। বাগানের ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোল রানা। ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে পিয়ানোর আওয়াজ।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরের টেরেসে উঠে এল ও। সন্তর্পণে এগোল লাইব্রেরীর দিকে। ওখানেই প্রথম কিটিকে দেখেছিল ও। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে তাকাল। খালি কামরা, ভেতরে নেই কেউ। টেরেস ধরে এগোল ও। সিঁড়ি বেয়ে আরেকটা টেরেসে উঠে এল। মৃদু গুঞ্জন ঢুকল কানে, কারা যেন কথা বলছে।

সামনে একটা জানালা। শাটারটা সামান্য একটু ফাঁক হয়ে আছে। সাদা কাপড়ের পর্দা উড়ছে বাতাসে। উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল রানা।

প্রকাণ্ড একটা খাটের ওপর, পা ঝুলিয়ে কিনারায় বসে আছে সালভাদর মারানজানা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লিলি। মারানজানার হাত দুটো ব্যস্ত। লিলির সামনে, বেশ অনেকটা দূরে, একটা আয়না। তাতে লিলির চেহারাটা দেখা গেল। আহত পশুর মত অসহায়, কাতর দেখাচ্ছে তাকে। পরিস্থিতি অন্যরকম হলে মেয়েটার জন্যে দুঃখবোধ করত রানা, কিন্তু এই মুহূর্তে ওর সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে রয়েছে কিটি।

বৃষ্টি মাথায় করে আবার এগোল রানা। পিয়ানোর আওয়াজ অনুসরণ করে সাদা মার্বেল পাথরের কয়েকটা ধাপ টপকাল, উঠে এল আরেকটা প্রশস্ত টেরেসে। রোদ ঠেকাবার জন্যে ক্যানভাসের পর্দা ঝোলানো হয়েছে। ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলো খোলা। ভেতরে গ্র্যান্ড পিয়ানোর সামনে বসে রয়েছে কিটি।

সন্তর্পণে এগোল রানা। আশেপাশে কেউ আছে বলে মনে হলো না। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি অনুভব করল ও, হঠাৎ উন্মত্ত একটা আশা জাগল মনে, মারানজানা বা তার লোকেরা কিছু টের পাবার আগেই কিটিকে নিয়ে এই দুর্গ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না ও?

ঠিক এই সময় কাছে কোথাও বজ্রপাত হলো। পরমুহূর্তে শোনা গেল চাপা একটা হুঙ্কার। পিয়ানোর পাশে একটা টুল, তার পাশে সিধে হয়ে দাঁড়াল ডোবারম্যান কুকুরটা। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

ঘাড় ফিরিয়ে বৃষ্টি আর রানার দিকে তাকাল কিটি। বলল, 'কে ওখানে?'

কিটির পেছন থেকে বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড প্রাউ পাসোডেনা। রানাকে দেখতে পেয়েই সাদা অ্যাপ্রনের ভেতর একটা হাত গুঁজে দিয়ে তখুনি আবার বের করে আনল সেটা। ছয় ইঞ্চি লম্বা সাইলেন্সার ফিট করা একটা অটোমেটিক দেখল রানা তার হাতে। রানার দিকে নয়, অটোমেটিকটা কিটির মাথায় তাক করল পাসোডেনা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার চোখে। কথা বলল না। চেহারাটা থমথম করছে।

সারা শরীরে শীতল প্রবাহ অনুভব করল রানা। তাড়াতাড়ি হাত দুটো মাথার ওপর তুলল ও। অটোমেটিকটা নামাল পাসোডেনা, কিন্তু চোখে আগের সেই স্থির দৃষ্টি।

রেনকোটের আস্তিনে মৃদু টান অনুভব করল রানা। ঘাড় ফেরাতেই দেখল কনুইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জালুচি। 'খারাপ কথা, রানা,' ফিসফিস করে বলল

সে। সারা মুখে ছড়িয়ে আছে মজার হাসি। 'আরেকটু হলেই তো মর্মান্তিক একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেত! এমন বোকামি কেউ করে নাকি!'

'মর শালা!' বিড় বিড় করে বলল রানা। জালুচিকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, হন হন করে এগোল সিঁড়ির দিকে।

নিজের কামরায় ফিরে এসে ভিজে কাপড়চোপড় বদলাল রানা। বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরাল। কাজটা বোকার মত হয়ে গেছে বুঝতে পেরে নিজের ওপর রেগে আছে ও। ভেতরে ঢুকল কেউ, অন্ধকারে টেরই পেল না। বিদ্যুৎ চমকানোর উজ্জ্বল আলোয় হঠাৎ দেখল, জানালার সামনে, ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিলি। কথা না বলে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল রানা, খাট থেকে নেমে লিলির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে লিলির কাপড়, গায়ের সাথে সেঁটে আছে।

'কেন পাঠিয়েছে তোমাকে?' বলল রানা। 'আমি কোন বুদ্ধি আঁটছি কিনা জানার জন্যে? নিশ্চয়ই আবার প্রেমের অভিনয় করতে বলে দিয়েছে?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লিলি। চেহারাটা থমথম করছে। অদ্ভুত শান্ত গলায় বলল, 'মারানজানাকে এইমাত্র রিপোর্ট করল জালুচি। ওদের কথা শুনে বুঝলাম, তুমি ঘরের ভেতর ঢুকলেই পাসোডেনা কিটিকে গুলি করত। বুঝতে পারছ আমার কথা? কিটিকে তুমি নিজেই খুন করতে যাচ্ছিলে আর একটু হলে!'

সাথে সাথে কিছু বলতে পারল না রানা। একটু পর বলল, 'সেজন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন?'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লিলি। তারপর রানাকে আড়ষ্ট করে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। মুখ ঢাকল দু'হাতে। তার দিকে পিছন ফিরল রানা। চেহারাটা কঠোর হয়ে উঠল ওর। 'তুমি চলে যাও, লিলি। তোমার এই নাকি কান্না সহ্য হচ্ছে না আমার।'

আরও জোরে ফুঁপিয়ে উঠল লিলি, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল লিলির পায়ের আওয়াজ। কিন্তু লিলির কথা তখন ভাবছে না রানা। ভাবছে মারানজানার কথা। ভাবছে, সুযোগ এলে কিভাবে খুন করবে লোকটাকে।

চার

খাড়া পাহাড়ের গোড়ায়, ভিলার নিচে, ক্ষুর-আকৃতির বে। দুটো বয়ার সাথে বাঁধা অবস্থায় ভাসছে সেসনা। উঁচু-নিচু একটা মেঠো পথ ধরে পৌঁছুতে হয় সৈকতে। রানাকে ল্যান্ডরোভারে তুলে নিয়ে সকাল ন'টায় ওখানে পৌঁছুল বোবো।

মাথার ওপর কালো মেঘ, সাগরের বুক ছুঁয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে কুয়াশা। পাথুরে জেটির পাশে নোঙর ফেলে রয়েছে একটা স্পীডবোট, হুইল ধরে বসে আছে পলি গাটো। আগেই চালু করা হয়েছে ইঞ্জিন, ভট ভট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিনারায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে জালুচি, তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। পরনে

ফ্লাইং জ্যাকেট, পায়ের জুতো জোড়ার কিনারা ফার দিয়ে মোড়া। ল্যান্ডরোভারের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে।

ল্যান্ডরোভার থেকে নামতে নামতে বলল রানা, 'জ্যাকেটের ভেতর হোলস্টার আছে তো?'

কাঁধে ঝুলে পড়া সোনালী চুল নেড়ে হো হো করে হাসল জালুচি। 'ভুলে যেয়ো না, তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে।'

'তুমিও মনে রেখো, অমূল্য রতন আমি।' বে-র প্রবেশ মুখ দিয়ে কুয়াশা ঢুকছে, সেদিকে তাকাল রানা। 'আবহাওয়ার খবর কি?'

'ভাল মন্দ যাই হোক, আর দেরি করা যায় না। উঠে এসো। হাতে যদি সময় থাকে, পালার্মোয় ব্যক্তিগত একটা কাজ সারতে হবে আমার।'

'অবশ্যই! মেয়েটা লাল, নাকি তোমার মত সোনালী চুলো?'

গাল ভরা হাসি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। এমন হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল জালুচি যে রানার মনে হলো এখুনি বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর। ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটল বুঝতে পারল না রানা। তবে মনে পড়ল, মারানজানা বলেছিল, কোন মেয়ে জালুচির সাথে থাকলে সেটাকে বিপজ্জনক মনে করা ঠিক হবে না।

জালুচিকে পাশ কাটিয়ে বোটে উঠল রানা। ওকে অনুসরণ করল জালুচি। বোট ছেড়ে দিল বোরো। সেসনার পাশে ভিড়ল বোট। কাছের ফ্লোটের ওপর পা দিয়ে সবার আগে সী-প্লেনে উঠল রানা, কেবিনে ঢুকে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল। একটু পর ভেতরে ঢুকল জালুচি। ভট ভট আওয়াজ তুলে ফিরে গেল স্পীডবোট। রুটিন চেক সেরে নিয়ে স্টার্ট দিল জালুচি। রানার দিকে ফিরে মৃদু হাসল, যেন সেই মানুষই নয়! বলল, 'সব ঠিক আছে, রানা?'

'আমার চেয়ে তুমিই সেটা ভাল জানো।'

জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়ে কুয়াশার দিকে চোখ রাখল জালুচি। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল সী-প্লেন। তারপর হঠাৎ করে, প্রয়োজনীয় স্পীড না তুলেই, কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর চঞ্চল প্রজাপতির মত হাত নেড়ে সমস্ত পাওয়ারের সাহায্যে আকাশে তুলল যান্ত্রিক ফড়িংটাকে। সী-প্লেনের নাক ঝুলে পড়ল নিচের দিকে, কিন্তু পাওয়ারের ঘাটতি থাকায় স্টিকটা পিছন দিকে টেনে ধরল না।

সগর্জনে ঘন কুয়াশার দেয়ালের দিকে ছুটল সী-প্লেন। পানি থেকে মাত্র বিশ ফিট ওপর দিয়ে হারবার পেরিয়ে এল ওরা। তারপর ইঞ্জিনের আওয়াজ ভারী শোনাল। ঠিক সময়ে সী-প্লেনটাকে ওপরে তুলতে শুরু করল জালুচি।

কুয়াশার দেয়াল ফুঁড়ে কালো মেঘের নিচে চলে এল ওরা। উইন্ডস্ক্রীনের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, খুদে বর্শার মত চারদিকে ছুটে যাচ্ছে কণাগুলো। কানের পিছন থেকে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজল জালুচি।

'বিউটিফুল!' তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'চোখের পলকে তুলে আনলে, দেখার মত একটা দৃশ্য! কিন্তু এই খেলা বারবার খেলতে গেলে হঠাৎ একদিন মারা যাবে, টেরও পাবে না!'

জোর গলায় হেসে উঠল জালুচি। 'কিন্তু এর মধ্যে মজা আছে, সেটা তুমি

অস্বীকার করতে পারো না!'

মেঘের ওপর উঠে এল সেসনা। বৃষ্টি বা কুয়াশা কিছুই নেই সামনে। ডান রাডারে পা রেখে চাপ দিল জালুচি, ধীরে ধীরে উত্তর দিকে ঘুরে গেল প্লেন, সাগরের দিকে পিছন ফিরে ছুটল।

ওয়ারড্রোবে পাওয়া ট্রেঞ্চকোটটা পরে নিল রানা। তারপর চোখ বুজে নিদ্রাদেবীর আরাধনা শুরু করল। একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

পালার্মো থেকে খুব বেশি দূরে নয়, মেসিনার দিকে যাবার সময় সাগর ঘেঁষা রাস্তার ধারে পড়ে রোমাগনোলো সী-বীচ। স্নানার্থীদের অত্যন্ত প্রিয় একটা স্পট, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার জন্যে জায়গাটা আজ একেবারে নির্জন পড়ে আছে।

ল্যান্ড করতে কোন অসুবিধেই হলো না জালুচির। তার দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিসের মত আওয়াজ করে বাতাস বেরিয়ে আসছে। সৈকতের কিনারা ঘেঁষে ছুটে চলেছে সী-প্লেন। রোমাগনোলো আর যখন মাত্র কয়েক মাইল দূরে, হঠাৎ বলল সে, 'নামছি। শক্ত হয়ে বসো, একটু ঝাঁকি লাগতে পারে।'

একটা পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে বাঁক নিল সেসনা, একটুর জন্যে প্রাসাদোপম একটা বাড়ির ছাদের সাথে সংঘর্ষ ঘটল না। বাড়িটা ছাড়িয়ে আসতেই দেখা গেল প্রশস্ত বে, চিলের মুখ থেকে খসে পড়া ইঁদুরের মত সোজা নিচের দিকে নামতে শুরু করল সেসনা। তলপেটে সুড়সুড়ি অনুভব করল রানা। ঝপাৎ করে আওয়াজ হলো একটা, ছলকে উঠল সাগরের পানি। শান্ত সাগরে দোল খেতে শুরু করল সী-প্লেন। চারদিক থেকে ঘিরে ধরল ঘন কুয়াশা।

'ঠিক আছে, রানা?' দাঁত বের করে হাসল জালুচি।

'একটা অভিজ্ঞতা বটে!'

ধীর গতিতে সামনে এগোচ্ছে সেসনা। জানালা খুলে বাইরে তাকাল রানা। ভাসমান একটা ব্রিজের কাঠামো দেখা গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল জালুচি। গতি আরও কমে গেল সেসনার। হাতে লাইনের প্রান্ত নিয়ে দরজা খুলল রানা, ভাসমান ব্রিজে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো ওয়েলস্কিন পরা একজন লোক। দাড়ি কামায়নি লোকটা, পরনে লাল ট্রাউজার, মাথায় তোবড়ানো হ্যাট। রানার হাতে একটা ছাতা ধরিয়ে দিয়ে লাইনের প্রান্তটা চেয়ে নিল সে।

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ভাবল রানা। আরও কয়েক মুহূর্ত পর বেরিয়ে এল জালুচি। ফ্লাইং কিট আর জুতো পাল্টে নেভী-ব্লু রেনকোট আর গোড়ালি ঢাকা বুট পরেছে সে।

'চলো, রানা,' বলল সে, কালো ওয়েলস্কিন পরা লোকটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পাশ কাটাল রানাকে। ব্রিজটা দুলছে। জালুচিকে অনুসরণ করল রানা।

আকাশ থেকে প্রাসাদোপম যে বাড়িটাকে দেখা গিয়েছিল, কুয়াশার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো সেটা।

'মারানজানার আরও একটা অবসর বিনোদন কেন্দ্র?'

'ঈর্ষা মহাপাপ,' সহাস্যে বলল জালুচি।

খুদে একটা সী-বীচ পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এল ওরা। ঝকঝকে একটা মার্সিডিজ

গাড়ি অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। ওদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ইউনিফর্ম পরা শোফার। পিছনের দরজাটা খুলে অপেক্ষা করতে লাগল সে। গাড়িতে চড়ার সময় তার হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দিল রানা।

সবার শেষে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল শোফার। কিন্তু জালুচি বোতাম টিপে দু'সারি সীটের মাঝখানে কাঁচের একটা পার্টিশন তুলে না দেয়া পর্যন্ত স্টার্ট দিল না সে। গাড়িতে বার আছে, সেখান থেকে গ্লাস আর বোতল বের করল জালুচি। দুটো গ্লাসে অল্প করে হুইস্কি ঢালল সে। রানা মাথা নাড়তে খুশি হলো দু'জনের ভাগই নিজের ভোগে লাগবে বলে।

'তুমি আমাকে অবাক করেছ, রানা,' হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল জালুচি। 'এর আগে আমার সাথে যারা সেসনায় চড়েছে, নামার সময় প্রত্যেককেই আধমরা অবস্থায় পেয়েছি।' আর একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করে ফেলল সে। 'তোমার বোধহয় ট্রেনিং আছে, তাই না?'

রানার চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মৃদু হাসল জালুচি, 'থাক, মনে করো আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। কোথায় যেতে হবে বলো।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আমাকে ডাঙায় পৌঁছে দিয়ে দূর হয়ে যাবে তুমি!'

'তা হব,' বলল জালুচি, পকেট থেকে সাদা একটা এনভেলাপ বের করে দেখাল রানাকে, তারপর আবার বলল, 'কিন্তু সলোজার এটা যদি পেতে হয় তাহলে আমার সাথে তাকে একটু মোলাকাত করতে হবে, তাই না?'

আপাতত জালুচির ইচ্ছেয় বাদ সাধতে চাইল না রানা। টাকাটা সলোজাকে নিজের হাতে দিতে চাইবে সে, সেটা আগেই ধারণা করেছিল ও। 'ঠিক আছে। ভায়া সান মার্কো। ভায়া রোমা ছাড়িয়ে, সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনের কাছে।' ইঙ্গিতে শোফারকে দেখাল ও। 'পিয়াজ্জা প্রিটোরিয়া হয়ে যেতে বলো ওকে।'

ইন্টারকমের সুইচ অন করে ইতালিয়ান ভাষায় শোফারকে নির্দেশ দিল জালুচি। মার্সিডিজ চলতে শুরু করল। প্রাসাদোপম বাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এল গাড়ি। মাইল খানেক এগোবার পর সামনে পড়ল লোহার মস্ত একটা গেট। গেট পেরিয়ে মেসিনাপালার্মো কোস্ট রোডে উঠে এল গাড়ি।

সিগারেট ধরাল জালুচি। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'সলোজার সবচেয়ে ভাল দিকটা কি?'

'বয়স,' বলল রানা। 'চলতি মাসে ষাটে পড়েছে।'

'তার মানে, বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে যাবার অদ্ভুত গুণ আছে লোকটার!'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, তারপর বলল, 'আমার সম্পর্কে যে ফাইলটা তৈরি করেছ তোমরা, তাতে উল্লেখ আছে কয়েক বছর আগে আমি একটা অ্যাসাইনমেন্টে গিয়েছিলাম আলবেনিয়ায়। ওখানে···'

'ইউ-টু পাইলটকে টিরানা প্রিজন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলে।'

'হ্যাঁ। আমার সাথে সলোজা ছিল। ইতালিয়ান নেভী থেকে অবসর নিয়েছে ও। আন্ডারওয়াটার স্যাবোটর ছিল।'

'হিউম্যান টর্পেডো, ইত্যাদি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে পোর্ট সাঈদে দুটো ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার ডোবায় সে। বছর কয় আগে আমার সাথে ওর যখন পরিচয় হয়, সিগারেট, পেনিসিলিন ইত্যাদি বিল্ডিসি থেকে আলবেনিয়ায় চোরাচালান করছিল ও। আমার টীমকে বেরিয়ে আসার একটা রাস্তা করে দেবার জন্যে ভাড়া করা হয় ওকে। অরিজিন্যাল প্ল্যানে ঠিক করা ছিল আলবেনিয় উপকূলে, টিরানা থেকে ত্রিশ মাইল দূরে, একটা কোভে দুই রাত অপেক্ষা করতে হবে ওকে। অপেক্ষা করার সময় রেডিওর সাহায্যে কোডেড মেসেজ পায় ও, জানতে পারে তার পরিচয়, উদ্দেশ্য এবং লোকেশন ফাঁস হয়ে গেছে। প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে বলা হয় ওকে।'

'পালিয়েছিল?'

'না। ডাঙায় উঠে আসে ও, একটা গাড়ি চুরি করে, তারপর সোজা পনেরো মাইল ভেতরে ঢুকে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। জানত, ওখানে আমরা আসব। আলবেনীয় সিক্রেট পুলিস পৌঁছুবার পনেরো মিনিট আগে পৌঁছায় ও।'

'তোমরা উদ্ধার পেলে?'

'সমস্ত কৃতিত্ব সলোজার।'

'চমৎকার মানুষ,' বলল জালুচি। 'মড়াপোঁতার ব্যবসা ছাড়া আর কি করে সে?'

'ওর মত ভাল গিটার আর কাউকে বাজাতে শুনিনি। আরব এবং ইসরায়েলিদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করে। তার ভাষায়, দুনিয়ার সবার স্বার্থই দেখতে হয় তাকে। কারও ওপর কোন বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই। শুধু একটা জিনিস ছুঁয়েও দেখে না। সেটা হলো, ড্রাগস। তার এক ভাগ্নে ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল, কুকুরের মত মারা যেতে দেখেও সাহায্য করতে রাজি হয়নি লোকটা।'

'সেন্টিমেন্টালিস্ট!'

'তা বলতে পারো,' বলল রানা। 'আরেকটু না বললে অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। যে লোকটা তার ভাগ্নেকে ড্রাগ সাপ্লাই দিত, তাকে এক সকালে একটা কসাইখানায় পাওয়া যায়। ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করা ছিল।'

'মাই গড!'

বাঁক নিয়ে পিয়াজা প্রিটোরিয়ায় ঢুকল মার্সিডিজ। তাড়াতাড়ি কাঁচের পার্টিশনে টোকা দিল রানা। গাড়ি থামতেই নেমে পড়ল ও। হন হন করে হেঁটে প্রকাণ্ড কৃত্রিম ঝর্ণাটার সামনে এসে দাঁড়াল। অসংখ্য মার্বেল পাথরের মূর্তি ঘিরে রেখেছে ঝর্ণাটাকে, বেশির ভাগই নারী মূর্তি। এদের মধ্যে অর্ধেক মানবী অর্ধেক মাছ, পিছনটা সিংহের, সামনেটা মানুষের, রোমান দেব-দেবী ইত্যাদি রয়েছে।

বৃষ্টির মধ্যে মাথায় ছাতা নিয়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল জালুচি। 'ব্যাপারটা কি?'

'এদিকে এলেই এটার সামনে একবার দাঁড়াই,' বলল রানা। 'ভালগারিজমের নমুনা! ঠিক জীবনের মত—বাজে একটা কৌতুক। বাকি পথটা হেঁটেই যাব আমি। এখান থেকে কাছেই।'

পিছন দিকে একবারও না তাকিয়ে চৌরাস্তা পেরোল রানা। জালুচির পায়ের

আওয়াজ না পেয়ে অনুমান করল, সে বোধহয় গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে শোফারকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছে।

রাস্তা পেরিয়ে এপারে চলে এল রানা। দ্রুত পায়ের শব্দ পেল পিছন থেকে। পাশে চলে এল জালুচি। ছাতাটা ওর মাথাতেও ধরল সে। 'এই বৃষ্টিতে ভেজার কোন মানে হয়?'

'বৃষ্টি দেখলেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায় আমার! ভিজতে ইচ্ছে করে।'

জালুচি আর কথা বাড়াল না। রানাকে অনুসরণ করে প্রাচীন চার্চ সান্তা ক্যাটেরিনাকে পাশ কাটাল সে। বাঁক নিয়ে ভায়া রোমায় ঢুকল ওরা। এগোল সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে।

কাঁকর ছড়ানো সরু একটা রাস্তা, ভায়া সান মার্কো। রাস্তার দু'পাশে অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরানো পাঁচ-ছয় তলা বাড়ি। নিস্তব্ধ এলাকা, ট্রাফিকের আওয়াজ পৌঁছায় না। লম্বা রাস্তার অর্ধেক পেরিয়ে এসে একধারে একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখল ওরা। ড্রাইভারের গায়ে কলার তোলা গ্রেটকোট, মাথায় টপ হ্যাট। হ্যাটের মাঝখান থেকে একটা লেজ বেরিয়ে এসেছে, ড্রাইভারের কাঁধ ছুঁয়ে নেমে এসেছে বুকের ওপর।

রূপোর কারুকাজ করা একটা কাঠের কফিন ধরাধরি করে ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামাল সবুজ অ্যাপ্রন পরা চারজন লোক। তাদের একজন কাঁচের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকল। বাতাসে শপাং করে চাবুক কষল ড্রাইভার, গাড়িটাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল ঘোড়াগুলো।

রাস্তার ধারেই একটা দরজা। দরজার গায়ে ছোট একটা সাইনবোর্ড—বার্জিল সলোজা, আন্ডারটেকার। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে ওরা, এই সময় রাস্তার ধারে এসে থামল মার্সিডিজ।

হলরুমের দেয়ালগুলো মেহগনির প্যানেল দিয়ে মোড়া। ভেতরটা মোমের আলোয় আলোকিত। ডান দিকে একটা অ্যালকোভে কুমারী মেরী মাতার গম্ভীর মূর্তি, আগরবাতি আর ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। গন্ধটা ভাল লাগল না রানার, মনে হলো, কি যেন গোপন করার চেষ্টা করছে।

টেবিলে ফিট করা ছোট একটা পিতলের হ্যান্ডবেল বাজাল রানা। ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শোনা গেল, পরমুহূর্তে মান্ধাতা আমলের কালো স্যুট পরা ছোটখাট একজন লোক ডানদিকের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। নাকের ডগায় ঝুলে পড়া চশমাটা ঠিক করে নিয়ে পিট পিট করে তাকাল সে। 'বলুন, সিনর! বলুন আপনাদের কি উপকারে লাগতে পারি?'

ইতালিয় ভাষায় বলল রানা, 'সিনর সলোজার সাথে দেখা করতে চাই।'

'তিনি খুবই ব্যস্ত মানুষ, সিনর...'

'কিন্তু আমিও খুবই জরুরী কাজে এসেছি,' লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'ব্যক্তিগত। সলোজা আমার বন্ধু।'

'কি বলব! এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন উনি! ফি হপ্তা এই সময় তিনি তাঁর ভাগ্নের কবরে ফুল দিতে যান।'

'কোথায়?'

খানিক ইতস্তত করল লোকটা, তারপর বলল, 'মন্টি পেলাগরিনোয়, কাপুচিন সেমিট্রিতে।'

'কতক্ষণ থাকে ওখানে?'

'বলতে পারব না, সিনর। এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা। যদি অপেক্ষা করতে চান···'

'সর্বনাশ! না!' আঁতকে উঠে দ্রুত বলল জালুচি। 'এই গন্ধ আমি সহ্যই করতে পারব না!'

বুড়ো লোকটাকে ধন্যবাদ জানাল রানা, বলল খানিক পর আবার ফিরে আসবে ওরা। তারপর জালুচিকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে সেমিট্রি খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু বাইরের উঠানে একটা হলুদ আলফা রোমিওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। হুইলে ইউনিফর্ম পরা শোফার। মিডল ওয়েট ফাইটারের মত চেহারা লোকটার। মার্সিডিজ থেকে ওরা নামার সময় অলস দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল একবার, তারপর আবার মনোযোগ দিল কোলের ওপর পড়ে থাকা খোলা ম্যাগাজিনে।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় জালুচি জানতে চাইল, 'ও কি সলোজার লোক?'

'জানি না। আগে কখনও দেখিনি ওকে।'

পথে কৃত্রিম একটা ঝর্ণা পড়ল, বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকে পরাস্ত করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থ হচ্ছে। একটা খিলানের ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। বেরিয়ে এল সেমিট্রিতে। খুব একটা বড় নয় জায়গাটা, সাইপ্রাস গাছ দিয়ে চারদিক ঘেরা। দু'চার হাত পর পরই বিশাল আকারের মনুমেন্ট আর মার্বেল পাথর ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি ফ্যামিলি ভল্ট।

সলোজাকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হলো না। একটা কবরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। কবরটা কালো মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি, দরজাটা ব্রোঞ্জের। সলোজার পরনে সাদা একটা ট্রেঞ্চকোট, মাথায় রেন হ্যাট। রেন হ্যাটটা দেখে মোটেও অবাক হলো না রানা। জানে, নিজের সব কাপড়-চোপড় ইংল্যান্ড থেকে কেনে সলোজা।

'এখানে দাঁড়াও তুমি,' জালুচিকে রেখে সামনে এগোল রানা। দু'পাও এগোয়নি ও, ডান দিকের একটা মনুমেন্টের আড়াল থেকে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এসে ওর পথ রোধ করে দাঁড়াল আলফা রোমিওর শোফার, দু'হাতে ধরে আছে একটা স্টার্লিং সাব-মেশিনগান।

ঝট্ করে ঘুরল সলোজা, একই সময়ে মাথার ওপর হাত তুলে ইংরেজীতে বলল রানা, 'আমি রানা, ভার্জিল।'

সাথে সাথে উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভার্জিল সলোজার মুখ। 'হাই, মাই ডিয়ার বয়, আকাশ থেকে পড়লে নাকি?' আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজী বলে সে। ছোটবেলাটা নিউইয়র্কে কাটিয়েছে। শোফারকে বলল, 'ঠিক আছে, চিকো। গাড়িতে ফিরে যাও।'

মনুমেন্টের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল শোফার। সলোজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। জড়িয়ে ধরে কঠিন আলিঙ্গন ছাড়াও রানার দুই গালে দুটো চুমো দিল

সলোজা। তার এই চুমোর অর্থ হলো, তোমাকে আমি নিজের পরিবারের একজন বলে মনে করি।

দু'হাত দিয়ে রানার কাঁধ ধরে একটু দূরে সরাল ওকে সলোজা। তার হাতের শক্তি অনুভব করতে পারল রানা। 'চমৎকার দেখাচ্ছে তোমাকে, খোকা। কোথায় লুকিয়ে ছিলে অ্যাদ্দিন?'

'তুমি কিন্তু আগের মতই আছ, একটুও বুড়ো হওনি,' বলল রানা। 'নিজের একটা ছবি অবশ্যই সিন্দুকে বা সুটকেসে তুলে রাখা উচিত তোমার।' সলোজার চেহারায় ক্ষীণ একটু বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠল, কুঁচকে উঠল ভুরু জোড়া। তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'একটা কৌতুক!'

নিজের বুকে মস্ত এক থাবা মেরে একগাল হাসল সলোজা। 'বেশ আছি। এর চেয়ে ভাল কবে ছিলাম মনে পড়ে না। রোজ রাতে নতুন নতুন মেয়ে।' হো হো করে হেসে উঠে পকেট থেকে সস্তা দামের একটা ঈজিপশিয়ান চুরুট বের করল সে। লোকটাকে যতই দেখে রানা, মনে মনে ততই বিস্মিত হয়। কি এক মন্ত্র বলে বয়সটাকে থামিয়ে রেখেছে সে। পাঁচ বছর আগে যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে। চওড়া গোঁফের ভেতর দু'একটা রূপালী ঝিলিক চোখে পড়ে বটে, কিন্তু মুখটা একেবারে তাজা ফুলের মত। দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝকঝকে।

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে জালুচির দিকে তাকাল সলোজা। 'তোমার বন্ধুটি কে?'

'বন্ধু নয়, সলোজা,' বলল রানা। 'বিপদ।'

চেহারাটা থমথমে হয়ে উঠল সলোজার। ধারাল ক্ষুরে রোদ পড়লে সেটা যেমন ঝিক করে ওঠে, তেমনি ঝিক করে উঠল তার চোখ দুটো। 'ঘাড়ে বিপদ নিয়ে আমার কাছে এসেছ, রানা?' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল সে। 'ভাল করেছ। তোমাকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে ভাল লাগে আমার। ব্যাপারটা কি বলো শুনি।'

রানাকে একটা ঈজিপশিয়ান চুরুট সাধল সলোজা, কিন্তু রানা মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল সেটা। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সাদা মার্বেলের বেদীতে বসল ওরা। সংক্ষেপে পুরো ঘটনাটা খুলে বলল রানা। রানার কথা শোনার সময় সারাক্ষণ জালুচির দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল সলোজা। কংক্রিটের সরু পথের ওপর ছাতা মাথায় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে জালুচি, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ দূরে।

রানার কথা শেষ হতে মৃদু গলায় বলল সলোজা, 'আর এই বানচোতটা ওদেরই একজন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বুড়বাক মারানজানাকে চিনি আমি, রানা। আমেরিকায় থাকার সময় মাফিয়ার একজন কেউকেটা ছিল, কিন্তু এখন ও কিছু না, ঢোঁড়া সাপ। কাপো পাসেরোয় কিছু বন্ধু নিয়ে গিয়ে শালার খুলিটা যদি ফাটিয়ে দিই, তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'তাতে কোন লাভ হবে না, সলোজা,' বলল রানা। 'ওদের হাতে কিটি রয়েছে। ওদের কথায় আপাতত নাচতে হবে আমাকে। আর কোন পথ নেই।'

'কাজটা তাহলে সম্ভব বলে মনে করছ?'

'হ্যাঁ।'

'গুড,' সানন্দে হাসল সলোজা। 'আমার ওখানে চলো। ধীরেসুস্থে শুনব কিভাবে কাজটা করার কথা ভেবেছ।'

স্বস্তি বোধ করল রানা, যেন ঘাড় থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে সলোজাকে অনুসরণ করল ও।

ওদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে মৃদু হাসল জালুচি। 'সব ঠিক আছে, রানা?'

জালুচির আপাদমস্তকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল সলোজা। 'এই মেয়েলি ক্যারেক্টার ওদের একজন?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'মাদার অভ গড, কি দিনকাল পড়েছে!' জালুচিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে রানার একটা হাত ধরল সে, জালুচিকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় আবার বলল, 'জানো, ডিয়ার বয়, মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হয় একটা কফিনে ঢুকে পড়ে ঢাকনিটা নিজেই বন্ধ করে দিই!'

পাঁচ

আলফা হাঁকিয়ে সলোজাকে নিয়ে পালার্মোয় পৌঁছুল রানা। বাঁক নিয়ে ভায়া সান মার্কোয় ঢুকতেই দেখল, ওদেরকে হারিয়ে দিয়ে আগেই পৌঁছে গেছে জালুচি, রাস্তার ধারে দাঁড় করানো মার্সিডিজের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে সে।

রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে একগাল হাসল সে, বলল, 'এত দেরি হলো কেন?'

চেহারা দেখেই বোঝা গেল, চটে উঠল সলোজা। 'শালা খচ্চর!' খিস্তি করা তার একটা বদভ্যাস। 'দেখ দেখ, নেংটি ইঁদুর ব্যাটা কেমন দাঁত কেলিয়ে হাসছে! ঠিক যেন একটা কফিনের ব্রাস প্লেট!' রানার দিকে ফিরল সে। 'ঠিক জানো, বানচোতকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়?'

অন্তত এই একবার জালুচিকে দেখে মনে হলো, উত্তরে কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না সে।

রানা বলল, 'মনে রেখো, ও আমাদের ব্যাংকার।'

শক্ত মোটা তর্জনী দিয়ে জালুচির বুকে খোঁচা দিল সলোজা। 'কার পাল্লায় পড়েছ জানো না! বেয়াকুবি করেছ কি মরেছ! আর, মুখ খোলা তোমার বারণ।'

মোমের আলো জ্বালা হলঘরের ভেতর ঢুকল ওরা। এক কোণের একটা দরজার সামনে দাঁড়াল সলোজা। দরজার গায়ে লেখা রয়েছে—প্রিপারেশন রুম। কপাট খুলে মাঝারি আকারের একটা কামরায় ঢুকল সবাই। সারি সারি বেড, সব ক'টাতে লাশ। নতুন কাপড় পরানো হয়েছে ওগুলোকে, চোখে পরিষ্কার ধরা না পড়লেও বোঝা যায় মেকআপ দেয়া হয়েছে, যাতে মৃত লোকগুলোকে যতটা সম্ভব জ্যান্ত দেখায়।

সাত কি আট বছরের একটা কিশোরী মেয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখে

মেকআপ লাগাচ্ছে থুরথুরে এক বুড়ো, তার পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় কি যেন পরামর্শ দিল সলোজা, তারপর আবার এগোল। কামরায় ঢোকার পর থেকে চুপসে গেছে জালুচির চেহারা। রানাও একটু অস্বস্তি বোধ করছে।

আরও একটা দরজা খুলল সলোজা। খিলান দেয়া প্রকাণ্ড একটা কামরায় ঢুকল ওরা। এখানেও মোমের আলো, কিন্তু কামরার সবটুকু আলোকিত নয়। বাতাস ভারী হয়ে আছে ফুলের গন্ধে। কামরার দু'দিকে সারি সারি কফিন রয়েছে, কোনটাই খালি নয়। কামরার একধারে কাঠের কয়েকটা ধাপ, উঠে গেছে ছোট একটা কাঁচ ঘেরা অফিসে। ধাপ বেয়ে দ্রুত উঠে গেল সলোজা। সামনে ডেস্ক নিয়ে ইউনিফর্ম পরা এক লোক বসে ছিল অফিসে, সলোজাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে।

'কিছু খেয়ে এসো, পিডো,' লোকটাকে বলল সলোজা। 'ঘন্টাখানেক সময় নিয়ো।' অফিস কামরা থেকে নেমে গেল লোকটা।

কামরায় ঢুকল রানা, পিছনে জালুচি। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল সলোজা। কাঁচের দেয়ালে নাক ছুঁইয়ে নিচের কফিনগুলোর দিকে তাকাল জালুচি। ঢোক গিলল একটা। মুখের চেহারা আরও শুকিয়ে গেছে।

'পছন্দ হয় জায়গাটা?' জানতে চাইল সলোজা। 'চাও তোমার জন্যে এখানে একটু জায়গা রাখি? আমরা এই নিচের কামরার নাম দিয়েছি—ওয়েটিং রুম। জেনে আশ্চর্য হবে, কত লোক প্যাথোলজিক্যাল আতঙ্কে ভোগে! ভয়, তাদেরকে বোধহয় ভুল করে জ্যান্ত কবর দেয়া হবে। এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায় তারা, সেজন্যে কিছু সময়ের জন্যে এই ওয়েটিংরুমে তাদেরকে রাখা হয়। প্রত্যেকটি কফিনের সাথে একটা করে কর্ড রয়েছে, লক্ষ করেছ? ওটার একটা প্রান্ত একটা বেলের সাথে, অপর প্রান্তটা লাশের আঙুলে পরানো একটা রিঙের সাথে বাঁধা আছে। সামান্য একটু নড়াচড়া হলেই এই অফিসে বেজে উঠবে বেল। সেজন্যেই রাত দিন চব্বিশ ঘন্টার জন্যে এখানে একজন অ্যাটেনড্যান্ট রাখার ব্যবস্থা করতে হয়েছে।'

সলোজা থামতে কয়েক মুহূর্ত কারও মুখে কথা যোগাল না। তারপরই, ওদেরকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে টুং করে বেজে উঠল একটা বেল।

'অ্যাঁ!' জালুচির চিৎকারটা চাপা হলেও বিকৃত শোনাল। চেহারায় ফুটে উঠল অকৃত্রিম আতঙ্ক। ঝট্ করে কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা ওয়ালথার পি.পি. বের করে আনল সে।

কর্কশ স্বরে হেসে উঠল সলোজা। 'এই, হাঁদা! পিস্তল দিয়ে কি হবে?' হাত ঝাপটা দিয়ে পিস্তলটা সরিয়ে দিল সে। দরজা খুলে তর তর করে নেমে গেল নিচে। হন হন করে এগিয়ে একটা কফিনের সামনে দাঁড়াল। ঢাকনি তুলে পরীক্ষা করল লাশটা। অস্পষ্টভাবে আবার বেজে উঠল বেল। ধাপ বেয়ে অফিস কামরায় ফিরে এল সলোজা।

'ভয় পাবার কিছু নেই। বেলগুলো এতই সেনজিটিভ যে লাশের চামড়ায় সামান্য একটু টান ধরলেও বেজে ওঠে।'

খুদে মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা গেল জালুচির কপালে। চোখ দুটো সামান্য বিস্ফারিত। 'সত্যি সত্যি কোন লাশ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে কখনও?'

'গত বছর দু'বার। কাফন পরা মাঝ-বয়েসী এক মেয়েলোক রাত দুপুরে কফিনের ভেতর উঠে বসেছিল। সে কি চিৎকার তার!' কোটর ছেড়ে টপ টপ করে জালুচির চোখ দুটো পড়ে যায় আর কি! তার গালে মৃদু চাপড় দিয়ে অভয় দিল সলোজা, হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'দেখলে, রানা! ছোকরা একেবারে ভীতুর ডিম!'

ডেস্কের কিনারায় বসল সলোজা, মুখে গুঁজল প্রিয় ঈজিপশিয়ান চুরুট। 'এবার কাজের কথা। ইসরায়েলি কারাগার থেকে কিভাবে উদ্ধার করতে পারি আমরা ববি ইউজিনকে?'

'ইসরায়েলে পৌঁছানো কোন সমস্যা নয়,' বলল রানা। একটা চেয়ার টেনে বসল ও। 'বোটে করে যাব আমরা, এবং এমন একটা ছদ্ম পরিচয় থাকবে আমাদের যেটা সবার কাছেই হার্মলেস এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে।'

'কিন্তু কারাগারে ঢুকবে কিভাবে?'

'হ্যাঁ, সেটা একটা সমস্যা বটে,' স্বীকার করল রানা। কারাগার অর্থাৎ দুর্গটার একটা নিখুঁত বর্ণনা দিল ও।

বর্ণনা শুনে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল সলোজার চেহারায়। 'শুনে তো মনে হচ্ছে ওটা আরেকটা ফোর্ট নক্স। অথচ বলছ ভেতরে ঢোকার একটা পথ পেয়েছ তুমি?'

'বলছি। সাগরের দিকে পাহাড়ের গা একশো পঞ্চাশ ফিট উঁচু খাড়া উঠে গেছে। সবার ধারণা, ওই খাড়া গা বেয়ে ওঠা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বোধহয় সেজন্যেই ওদিকটায় দু'জনের বেশি গার্ড রাখা হয় না।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি বলতে চাও, ওই খাড়া গা বেয়ে ওঠা সম্ভব? পারবে তুমি?'

'কেউ যদি পারে তো আমিও পারব,' বলল রানা। 'কিন্তু এর চেয়ে জরুরী কাজ আছে আমার। আর কাউকে উঠতে হবে। কিন্তু যেই উঠুক, ওপর থেকে সাহায্য পেতে হবে তাকে। দুর্গের পাঁচিল থেকে কেউ যদি ঠিক সময়ে একটা লাইন ফেলে দেয় নিচে, তারপর সেটা টেনে তোলে, নিচের লোকটাকে সহ, তাহলে এটা কোন সমস্যাই নয়। অবশ্য নিচের লোকটাকে পাহাড় বেয়ে ওঠার ব্যাপারে একজন ওস্তাদ হতে হবে।'

'কিন্তু ঠিক সময়ে লাইন ফেলার জন্যে একজনকে দুর্গের পাঁচিলে উঠতে হবে, তার মানে দুর্গের ভেতর আগে ঢুকতে হবে তাকে। সেটা কিভাবে সম্ভব?' বলল জালুচি। 'উঁহু, তোমার প্ল্যান নিখুঁত নয়। দুর্গের ভেতর কোন সিভিলিয়ানকেই ঢুকতে দেয় না ওরা।'

'দেয়,' বলল রানা। তাকাল সলোজার দিকে। 'প্রতি শুক্রবার রাতে স্থানীয় একজন লোক, তার নাম জজবা, যে আমাদের হয়ে কাজ করছে, এক জোড়া ট্রাক ভর্তি মেয়েলোক পাঠায় কারাগারের ভেতর। কারারক্ষীরা এদের নিয়ে রাত কাটায়। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী কর্নেল খানজুম, সে একাই নাকি দুটো মেয়েকে নিজের ঘরে নিয়ে যায়।'

সলোজার চেহারায় কৌতুক ফুটে উঠল। 'তার মানে তুমি বলতে চাইছ তোমার ইনসাইড অপারেটরকে একজন মেয়ে হতে হবে?' একটু বিরতি নিয়ে কি

যেন ভাবল সে, তারপর আবার বলল, 'কিন্তু মনে রেখো, বেশ্যা হিসেবে পরীক্ষা দিতে হবে তাকে!'

'হয়তো। মেয়েদের দলে আমাদের অপারেটরকে ঢুকিয়ে দেয়া কোন সমস্যা নয়। মাঝে মধ্যে তেল আবিব বা জেরুজালেম থেকেও নতুন মুখ আমদানী করতে হয় জজবাকে।'

হো হো করে হেসে উঠল জালুচি। 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো, রানা? একটা মেয়ের কাছ থেকে এত কিছু কিভাবে তুমি আশা করো! তার আচরণ এবং চেহারা একজন বেশ্যার মত হতে হবে, গায়ে জোর থাকতে হবে তা না হলে লাইন টেনে তুলবে কিভাবে, অবস্থা বেগতিক দেখলে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে খুন-খারাবিও করতে হবে, তারপর দক্ষিণ পাঁচিলের দু'জন সশস্ত্র গার্ডকে সামাল দিতে হবে। অসম্ভব!'

'অসাধারণ একটা মেয়ে দরকার আমাদের, স্বীকার করি,' বলল রানা। 'কিন্তু এ-ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। ওদের সিকিউরিটি সিস্টেমের মধ্যে মাত্র এই একটাই ত্রুটি দেখতে পেয়েছি আমি।'

কর্কশ স্বরে হাসল সলোজা। 'আমার কিন্তু পছন্দ হয়েছে প্ল্যানটা! যদিও, গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটু পাগলামির গন্ধ আছে।' মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ! অসাধারণ একটা মেয়ে দরকার। তা ঠিক!'

'হাতে সেই রকম কোন মেয়ে আছে নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল জালুচি।

খুব বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সলোজা। 'ইয়ং জেনারেশনকে নিয়ে এই এক সমস্যা—আস্থা রাখতে জানে না!' রানার দিকে ফিরল সে। 'ওসেনিয়া ক্যালকন নামে এক মেয়ে চলতি হপ্তায় টাবুতে আসছে। টাবু মানে রোমাগনোলোয় যাবার পথে একটা বীচ ক্লাব। আমার একটা নতুন ব্যবসায়িক স্বার্থ। আজকের প্রথম শো সাতটা ত্রিশে। আজ রাতেই ওর সাথে পরিচয় করিয়ে দেব তোমার। শুধু অসাধারণ নয়, অস্বাভাবিক একটা মেয়ে। দেখলেই বুঝতে পারবে।'

'ফাইন,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার যে আরও একজন দরকার?'

'পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ?' জানতে চাইল সলোজা। 'এবং সেই সাথে প্রয়োজন হলে গলা কাটতে পারে? অ্যান আনইউজুয়াল কমবিনেশন!' খানিক ইতস্তত করল সে। 'আমার আরেক ভাগ্নে বনেটি সম্পর্কে কখনও কিছু বলেছি তোমাকে, মনে পড়ে?'

'কই, না।'

'সত্যিকার বুনো! ইউনিভার্সিটিতে পাঠিয়েছিলাম, পোঁদে লাথি মেরে বের করে দিয়েছে। আল্পসের একটা মাউন্টেন রেজিমেন্টে ছিল, ভাল ট্রেনিংও পেয়েছে। তারপর এক ছুটিতে এসে ওর চেয়ে বয়সে দেড়া এক লোকের সাথে ঝগড়া বাধায়, শেষ পর্যন্ত তাকে খুনই করে ফেলে। কিছু না, একটা মেয়েকে নিয়ে গোলমাল।'

'তারপর?'

'পালিয়ে গেল পাহাড়ে। একটানা প্রায় তিন বছর কামারাটা পাহাড়ে ডাকাতি করে বেড়িয়েছে। ওর মায়ের মুখ চেয়ে শেষ পর্যন্ত পুলিসের খাতা থেকে ওর নামটা

মুছে ফেলার ব্যবস্থা করি আমি। তাতে আমার একটা পকেট প্রায় খালি হয়ে গিয়েছিল।'

'এখন সে কোথায়?'

'আবার পালিয়ে বেড়াচ্ছে! এবার পুলিস নয়, পিছনে লেগেছে মাফিয়া।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সলোজা। 'বিশ্বাস করবে, সিসিলিতে এত মেয়ে থাকতে বিয়ে করার জন্যে ওর পছন্দ হয়েছে খোদ কাপুর মেয়েকে! ওরা ওর মাথায় দাম ঘোষণা করেছে পঞ্চাশ হাজার ডলার। এত ব্যাপক ম্যান হান্ট বাপের কালে দেখিনি আমি!'

একটু নিরাশ দেখাল রানাকে। 'তাহলে তো তার টিকির সন্ধান পাওয়া কঠিন!'

'মোটেও না! তার দেখা পাবার জন্যে সঠিক লোকের কাছে আমার একটা ফোন করলেই যথেষ্ট।'

ফোনের রিসিভার তুলল সলোজা। এই সময় টিং করে উঠল একটা বেল। লাফ দিয়ে উঠল জালুচি। হো হো করে হাসল সলোজা। 'এবার নাহয় তুমিই যাও, চেক করে দেখো ব্যাপারটা কি?'

আঁতকে উঠল জালুচি। মুখে কথা যোগাল না। সলোজার দিকে তাকিয়ে থেকে ঢোক গিলল একটা। ডায়্যাল করার সময়ও হো হো করে হাসতে থাকল সলোজা।

প্রত্যেক সেইন্ট'স ডে-তে মৃতদের তরফ থেকে শিশুদের উপহার পাবার রেওয়াজ আছে সিসিলিতে। এবং সম্ভবত দুনিয়ার আর কোথাও কবরের এত যত্ন নেয়া হয় না। মৃত্যু সম্পর্কে এই রকম সচেতন একটা সমাজে এটা কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয় যে ক্যাটাকুম্বে কম করেও আট হাজার লাশ আছে। কিন্তু কাপুচিনজিটা চার্চের ব্যাপারটা আরও বেশি অবাক কাণ্ড। জায়গাটা দেশী বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্যে একটা লোভনীয় আকর্ষণ। এই চার্চের সৌন্দর্য দেখার জন্যে সারাক্ষণ ভিড় লেগে থাকে। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে সলোজাকে জানানো হলো, লোকটা তার সাথে এই চার্চে সামনাসামনি দেখা করবে। বনেটির ঠিকানা দেবার আগে সলোজার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায় লোকটা।

বৃষ্টি বাদলা বলেই বোধহয় চার্চে লোকজন একেবারে নেই বললেই চলে। একজন ঝাড়ুদারকে দেখল ওরা, মেঝে পরিষ্কার করছে।

'এখানে অপেক্ষা করব আমি,' বলল সলোজা। 'আসার সুযোগ যখন হয়েছে, নিচেটা একবার ঘুরে দেখে এসো তোমরা। দেখার মত অনেক কিছু পাবে।'

কয়েকটা ধাপ নেমে একটা কামরায় ঢুকল ওরা। ছাদটা অস্বাভাবিক উঁচু। চারদিকে চোখ বুলিয়ে যা দেখল রানা, জীবনে কোন দিন ভুলবে না। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত একের পর এক শেলফ সাজানো রয়েছে, প্রত্যেকটিতে শুকনো লাশ। প্রত্যেকটি লাশের গলার সাথে ঝুলছে নেম-প্লেট। কিছু লাশের হাড় ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। কোন কোন লাশের হাড়ে মাংস আছে, কিন্তু বুকে, মুখে, হাতে বা মাথায় চুল নেই।

তাড়াতাড়ি কামরাটা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। জালুচিকে ধাপ বেয়ে উঠতে দেখে মনে হলো রানা বুঝি তাড়া করছে তাকে। চার্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সলোজা, একটা নোটবুকে কি যেন টুকছে।

'ইউ বাস্টার্ড!' খেঁকিয়ে উঠল জালুচি।

'ভাল লাগেনি তোমার?' কাঁধ ঝাঁকাল সলোজা। 'এটাই তো পালার্মোর আভিজাত্য! তুমি জানো, ফি রোববারে এখানে এসে লোকেরা তাদের পূর্ব-পুরুষদের খোঁজ করে?'

'মরুক শালারা!' বলল জালুচি। 'তোমার লোক কই? এখানে যার সাথে দেখা করার কথা তোমার?'

'ঝাড়ুদারের কথা বলছ?' মৃদু হাসল সলোজা। 'তার সাথে আমার কথা বলা শেষ হয়েছে। এইমাত্র চলে গেল। মিসিলমেরি গ্রামের উল্টোদিকের রাস্তা এগ্রিজেনটোয় একটা ট্রাটোরিয়ো আছে, সেখানে পাওয়া যাবে বনেটিকে। ভাল করে অন্ধকার না নামলে সেখানে যাওয়া উচিত হবে না, কাজেই ওসেনিয়া ফ্যালকনের সাথে আগে দেখা করব আমরা।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে এগোল সলোজা, অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে অনুসরণ করল জালুচি।

অনেক দূর থেকে টাবু ক্লাবের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। হৈ-চৈ, শোরগোল, গান-বাজনা। গাড়ি পার্ক করার বিশাল জায়গাটা সন্ধে হতে না হতে ভরে গেছে।

ভেতরে ঢুকে বোঝা মুশকিল এটা লন্ডন, প্যারিস নাকি লাস ভেগাস। এ-ধরনের ক্লাবের নেপথ্য-অঙ্গসজ্জা সবখানে একই রকম। ফ্রিজার থেকে সরাসরি স্টিক আর প্যাকেট করা খাবার বের করে পরিবেশন করা হচ্ছে। বড়সড় একটা ক্যাসিনো আছে, দেখে শুনে মনে হলো, ভালই ব্যবসা করছে। উঁচু মঞ্চে তিন যুবক আধুনিক জাজ বাজাচ্ছে, বেশ চমৎকার বাজাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কারও খেয়াল আছে বলে মনে হলো না।

বারে বসল ওরা। নিজের আর জালুচির জন্যে স্কচ হুইস্কি আনাল সলোজা, রানার জন্যে বিয়ার। চোখের সামনে হাত তুলে রিস্টওয়াচ দেখল সলোজা। 'আর বেশি দেরি নেই। যা দেখাতে নিয়ে এসেছি, একটু পরই দেখতে পাবে তোমরা।'

কয়েক মুহূর্ত পর জাজ থেমে গেল। শোনা গেল মৃদু ড্রামের আওয়াজ। সেই সাথে স্টেজে উদয় হলো একজন ঘোষক চারটে ভাষায় ঘোষণা করল সে, ক্লাব টাবু প্যারিস থেকে মিস ওসেনিয়া ফ্যালকনকে নিয়ে আসতে পারায় গর্বিত। ঘোষণা শেষ করেই ছুটে বেরিয়ে গেল সে স্টেজ থেকে। পরমুহূর্তে সব আলো নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল হলরুম। গাঢ় অন্ধকারে ধীরে ধীরে জ্বলে উঠল একটা স্পট লাইট, সেটার মাঝখানে দেখা গেল ওসেনিয়া ফ্যালকনকে। অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে, মনে মনে স্বীকার করল রানা। কিন্তু সেই সাথে কেন যেন খুঁতখুঁতে একটা ভাব জাগল মনে। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল আছে ওসেনিয়া ফ্যালকনের মধ্যে। কিন্তু সেটা যে কি, ধরতে পারল না ও। একমাথা সোনালী চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে ওসেনিয়ার। সাধারণ একটা সিল্কের মিনি

পোশাক পরেছে সে। সোনালী স্কার্ট, কালো মোজা, সোনালী জুতো, সাংঘাতিক উঁচু হিল।

গাইতে শুরু করল ওসেনিয়া। তার গান শুনে রানার মনে হলো আবার যেন মর্ত্যে ফিরে এসেছে জুডি গারল্যান্ড। জুডির মতই গলায় সেই গভীর ভাবাবেগ, একটা নোট ভেঙে দুটো করার সেই পরিচিত অথচ দুর্লভ গুণ, যাতে করে শিরদাঁড়া বেয়ে কিছু একটা উঠে আসছে বলে অনুভব করা যায়।

পুরানো স্ট্যান্ডার্ড ধরে এগোল ওসেনিয়া। এ ফগি ডে। সেপ্টেম্বর সঙ। দি লেডি ইজ এ ট্র্যাম্প। পাগল করে ছেড়ে দিল সে, বিশেষ করে পুরুষ শ্রোতাদের। অডিয়্যান্স কেউ নিজের আসনে বসে নেই।

সলোজাকে বলল রানা, 'মানলাম, গানে ওর তুলনা হয় না, কিন্তু সবার জানা ব্যাপারটা ছাড়া আর কি করার আছে আমাদের ওকে নিয়ে? আমরা যে কাজের জন্যে মেয়ে চাই সে-কাজ ওকে দিয়ে করাতে গেলে পাঁচ মিনিটের বেশি টিকবে না ও।'

'তোমার মত অতটা নিরাশ নই আমি,' বলল সলোজা। 'আগেই বলেছি, ওসেনিয়া শুধু অসাধারণ নয়, অস্বাভাবিকও। মনে হচ্ছে, কথাটা তুমি ভুলে গেছ! যাই হোক, আমি চাই ওর সাথে কথা বলে দেখো তুমি। কাজেই, চলো উঠি, পিছনে যাই। আর মাত্র একটা গান বাকি আছে ওর।'

ভিড় ঠেলে হলরুমের একধারে চলে এল ওরা। স্টেজ ডোরে থামানো হলো ওদেরকে, কিন্তু সলোজাকে চিনতে পেরে দারোয়ান সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল। ভেতরে ঢুকে নির্জন একটা করিডরে চলে এল ওরা। দাঁড়াল একটা ড্রেসিং রুমের সামনে। দরজায় ওসেনিয়ার নাম লেখা রয়েছে। একটু পরই তার গান থামল। তুমুল করতালি। শিস। কিন্তু আর কোন গান ধরল না ওসেনিয়া। ব্যান্ডের বাজনা হঠাৎ উত্তাল হয়ে উঠল, তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল। করিডরের শেষ মাথায়, সিঁড়ির ডগায় দেখা গেল ওসেনিয়া ফ্যালকনকে।

ধাপ বেয়ে সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এল ওসেনিয়া। পাশের প্যাসেজে গা ঢাকা দিয়ে ছিল ইভনিং ড্রেস পরা দু'জন লোক, স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এসে ওসেনিয়াকে ধরল তারা।

একজন লোক প্রকাণ্ডদেহী, কদাকার চেহারা, ইতালিয় ভাষায় বলল, 'ও. কে. বেবী, আজ রাতে আমাদের সাথে যাচ্ছ তুমি।'

'যেতেই হবে!' অপর লোকটা বলল, বলে হাত বাড়িয়ে খামচে ধরল ওসেনিয়ার কোমরের কাছে স্কার্ট।

দেখেই বোঝা গেল, দু'জনেই পাঁড় মাতাল। এগোবার জন্যে পা বাড়াল রানা, কিন্তু একটা হাত তুলে ওকে বাধা দিল সলোজা। 'দেখোই না কি হয়!'

চোখের পলকে গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল ওসেনিয়া, পরমুহূর্তে কারাতের একটা হাই কিক মারল প্রকাণ্ডদেহীর চোয়ালে। ছুরির মত চোখা হাইহিলের গুঁতো খেয়ে গুরুতর অবস্থা হলো গরিলার, মুখে সদ্য তৈরি এক ইঞ্চি গভীর ক্ষতটা চেপে ধরে কেঁদেই ফেলল সে।

লোকটার কান্নাকাটির দিকে খেয়াল না করে পরমুহূর্তে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে

দ্বিতীয় লোকটার তলপেটে গুঁতো মারল ওসেনিয়া। লোকটা যেই সামনের দিকে ঝুঁকল, অমনি থুতনির নিচে জোর ধাক্কা মারল গলা ধাক্কার ভঙ্গিতে।

বোঝা গেল, প্রচণ্ড রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ওসেনিয়া। এমনই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল যে মাথার পরচুলাটা খসে পড়ে গেলেও সেদিকে নজর ছিল না তার। পরচুলা খসে পড়ার পর দেখা গেল তার মাথার চুল সোনালী নয়, কালো। এবং ছোট করে ছাঁটা। পরিষ্কার বোঝা গেল, ওসেনিয়া ফ্যালকন মেয়ে নয়। ছেলে।

ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে করিডর ধরে এগিয়ে এল ফ্যালকন। হাতে ধরে আছে পরচুলাটা। অনর্গল খিস্তি বেরিয়ে আসছে তার গলা থেকে।

'গুড ইভনিং ওটেলিয়ো,' বলল সলোজা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চোখের চারপাশ কুঁচকে তাকাল ফ্যালকন। 'বুড়ো সলোজা? আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন! শালা মাতাল! গায়ে হাত দিয়ে পচিয়ে ফেলতে বসেছে আমাকে! এর জন্যে তুমি দায়ী। তোমার যদি অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে, আমি আজই প্যারিসে ফিরে যাব।'

ওদেরকে পাশ কাটিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকে পড়ল ওটেলিয়ো ফ্যালকন।

রানার দিকে ফিরে একগাল হাসল সলোজা। 'বলিনি, অস্বাভাবিক একটা মেয়ে?' দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। পিছনে জালুচিকে নিয়ে তাকে অনুসরণ করল রানা।

ড্রেসিং টেবিলে বসে ফোনের ডায়্যাল ঘোরাচ্ছে ওটেলিয়ো ফ্যালকন। ঠোঁটের কোণে ঝুলছে সিগারেট, ধোঁয়া থেকে বাঁ চোখটাকে বাঁচাবার জন্যে একদিকে কাত করে রেখেছে মাথা। অ্যাপোলোনিয়া নামে এক মেয়ের সাথে অনর্গল ইতালীতে কথা বলতে শুরু করল সে। তাকে জানাল, ঠিক মাঝরাতে তার সাথে দেখা করবে ও।

ওটেলিয়োর পিছনে দাঁড়াল ওরা।

'ওর মা ইতালীয়,' রানাকে বলল সলোজা। 'কিন্তু বাবা আমেরিকান।'

খটাস করে রিসিভার রেখে দিয়ে হাত বাড়িয়ে স্কচ হুইস্কির বোতলটা তুলে নিল ওটেলিয়ো, গ্লাসে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ হুইস্কি ঢেলে এক চুমুকে শেষ করল সেটা, তারপর ড্রেসিং টেবিল থেকে নেমে ওদের সামনাসামনি হলো।

'মাঝরাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে,' বলল সলোজা, 'তার মানে দ্বিতীয় শোটা তুমি করছ?'

'তোমার কাছে ঋণী, তোমাকে ডোবাতে চাই না, শুধু সেজন্যে,' তীব্র ঝাঁঝের সাথে বলল ওটেলিয়ো। শাসাবার ভঙ্গিতে সলোজার মুখের কাছে একটা তর্জনী খাড়া করল সে। 'কিন্তু এটাই আমার শেষ শো, এই বলে রাখলাম! ফাইন্যাল!' রানার আর জালুচির দিকে তাকাল একবার। 'ব্যাপারটা কি? এরাও আমাকে ছুঁতে চায় নাকি?'

'আমার এক পরম বন্ধুর সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, ওটেলিয়ো,' ইশারায় রানাকে দেখিয়ে বলল সলোজা। 'মেজর মাসুদ রানা।'

'আর্মি?'

ভুরু কুঁচকে রানার আপাদমস্তক দেখল ওটেলিয়ো। তারপর হঠাৎ হাত

বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। 'আমিও আর্মিতে ছিলাম, মেজর রানা। কিন্তু ক্যাপ্টেন হবার আগেই পালিয়ে এসেছি।'

হো হো করে হেসে উঠল সলোজা। বলল, 'দু'জনের মধ্যে মিল আছে!'

রানার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ওটেলিয়ো।

'সলোজা জানে, আমিও আর্মি থেকে পালিয়ে এসেছি।'

দ্বিতীয়বার করমর্দন করল ওটেলিয়ো। 'মেজর হবার পর? তাহলে তো আপনাকে আমার ওস্তাদ মানতে হয়!'

'শোনো, ওটেলিয়ো,' গম্ভীর হলো সলোজা। 'নতুন ব্যবস্থার কথা বলছিলে না তুমি? আছে। আসলে সেজন্যেই আমার বন্ধুকে নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। মাত্র একটা শো।' কি যেন বলতে যাচ্ছিল ওটেলিয়ো, ট্রাফিক পুলিসের মত হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল সলোজা। 'পঁচিশ হাজার মার্কিন ডলারের একটা প্রস্তাব এটা।'

নিঃশব্দ হাসি দেখা গেল ওটেলিয়োর ঠোঁটে। 'নিশ্চয় ঠাট্টা করছ! কাজটা কি? কাউকে খুন করতে হবে?'

'সম্ভাবনাটা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

ওটেলিয়োর চেহারা থেকে ধীরে ধীরে হাসির শেষ রেশটুকুও মিলিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। রানার দিকে তাকাল সে। তারপর জালুচির দিকে। সবশেষে আবার সলোজার দিকে। 'তুমি সিরিয়াস?'

'অফ কোর্স।'

ইতালিয়ান ভাষায় দ্রুত বলল ওটেলিয়ো, 'কারা এরা? তোমার মতলবটা কি?'

'সময়ের অপচয়,' বলল সলোজা। 'ওরা দু'জনেই ইতালিয়ান ভাষা বোঝে।'

'শোনো,' বলল রানা। 'আমরা তোমাকে ব্যাংক ডাকাতি করতে বলছি না। ইসরায়েলি কারাগার থেকে একজন লোককে বের করে আনব আমরা, তুমি আমাদের সাহায্য করবে।'

লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল ওটেলিয়ো, মারমুখো একটা ভঙ্গি করে সোজা দরজা দেখিয়ে দিল। 'সলোজাকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তোমাদের আমি চিনি না। গেট আউট!'

সলোজার ক্ষীণ একটু মাথা ঝাঁকানো লক্ষ করে দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে গেল রানা, পিছনে জালুচি। রাগে লাল হয়ে উঠেছে জালুচির চেহারা। 'ওই রকম একটা পুঁচকে ছোঁড়ার তেজ কত! আমার হাতে ছেড়ে দিলে দু'মিনিটেই...'

'তোমার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে না, কাজেই চুপ করে থাকো!'

রাগ দেখিয়ে হেঁটে চলে গেল জালুচি। করিডরের শেষ মাথায় গিয়ে দাঁড়াল সে, একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন ফুঁকতে শুরু করল। দরজার পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রানা। ঘরের ভেতর থেকে চাপা গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। ওটেলিয়ো রাজি হবে না, এই সন্দেহ একবারও উদয় হলো না ওর মনে। সলোজার ওপর অগাধ বিশ্বাসই এর একমাত্র কারণ নয়। ওটেলিয়ো ছেলেটা অন্তর থেকে একটা পরিবর্তন চাইছে, তাতেই কাজ হবে। মেয়ে সেজে গান গাইতে গাইতে বিরক্ত হয়ে গেছে সে, মুক্তি চায়।

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল সলোজা। 'এসো, রানা।'

ড্রেসিং টেবিলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ওটেলিয়ো। পরচুলাটা আবার পরে নিয়েছে সে। কয়েক মুহূর্ত কথা বলল না কেউ। ঘরে জালুচি ঢুকল। হাতের গ্লাসটা একটু উঁচু করে ধরল ওটেলিয়ো। 'গোটা ব্যাপারটা পাগলামি, তবু আমি আপনার সাথে ক্রিমিন্যালের খাতায় নাম লেখালাম, মেজর রানা।'

স্বস্তি বোধ করল রানা। ও কিছু বলার আগেই রিস্টওয়াচ দেখে নিয়ে সলোজা বলল, 'সময় মত মিসিলমেরিতে পৌঁছুতে হলে আমাদের আর দেরি করা চলে না।' ওটেলিয়োর দিকে ফিরল সে। 'তোমার দ্বিতীয় শো শেষ হয়ে গেলে ভায়া সান মার্কোয় আমার ঠিকানায় দেখা করো।'

'অসম্ভব! আমার বান্ধবীকে আমি কথা দিয়েছি…'

'তাকে অপেক্ষা করতে হবে।'

'কিন্তু সমস্যা হলো, আমি পারব কি?'

'তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত,' ফোড়ন কাটল জালুচি। 'একটা মেয়ের আকর্ষণ কিছুক্ষণের জন্যে এড়িয়ে থাকতে পারো না?'

ঠাণ্ডা চোখে জালুচির দিকে তাকাল ওটেলিয়ো। 'তুমি নিজেই তো একটা মেয়েলি চেহারা! তুমি নিজে বোঝো না মেয়েরা কিরকম টানে?' জালুচির কোথায় যে লাগল, বুঝল না কেউ, কিন্তু চোখের পলকে তার চেহারায় বুনো হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠল। তাকে অগ্রাহ্য করে সলোজার দিকে ফিরল ওটেলিয়ো। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই তাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জালুচি। তৈরিই ছিল রানা, মাঝপথে বাধা দিল জালুচিকে।

হো হো করে হেসে উঠল সলোজা। 'জীবনে এই প্রথম দেখলাম একজন শত্রুকে জখম হওয়ার হাত থেকে বাঁচাল একজন। বানচোতকে বাধা দিলে কেন, রানা? ওটেলিয়ো ওর মুখের চেহারা বদলে দিত, দেখে মজা পেতাম আমরা!' ওটেলিয়োর দিকে ফিরল সে। 'তাহলে সেই কথাই রইল। মাঝরাতের দিকে তুমি আমার সাথে দেখা করছ।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল ওটেলিয়ো। দরজা বন্ধ হতেই জালুচির মুখোমুখি হলো রানা। দুই পা ফাঁক করে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জালুচি। 'সলোজা তোমাকে মুখ খুলতে বারণ করেছিল। মনে আছে?'

মুখে কিছু বলল না জালুচি, কিন্তু এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল যে দেখে মনে হলো বলতে চাইছে, তোমাকে আমি গ্রাহ্য করি না। দুম করে তার তলপেটে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। কোঁক করে উঠল জালুচি। 'আবার যদি টুঁ শব্দ করো, তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব আমি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল রানা।

ছয়

ভায়া সান মার্কো স্ট্রীটে আলফা রেখে লাশের গোডাউনে ঢুকল ওরা, বেরুল পিছনের দরজা দিয়ে। পথ দেখিয়ে ওদেরকে নিয়ে চলল সলোজা। অনেকগুলো গলি পেরিয়ে অবশেষে সেন্ট্রাল স্টেশনের পিছনে পৌঁছুল ওরা। জালুচির মার্সিডিজ নিয়ে এখানেই অপেক্ষা করছিল শোফার। ওরা উঠে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

'আর একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল না?' প্রশ্ন করল রানা।

'পালার্মোয় এমন কেউ নেই যে আমার ওই ইহুদ আলফাটাকে চেনে না। কেউ হয়তো নজর রাখছিল। বনেটি যে আমার ভাগ্নে, সবাই তা জানে। তার মানে এই নয় যে মাফিয়া আমার সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে বাজাবাজি করতে আসবে। তারা জানে, আমার সাথে লাগতে গেলে হাজারো ঝামেলা পোহাতে হবে। কিন্তু ছেলেটাকে তারা রেয়াত করবে না।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। উদ্বিগ্ন বলে মনে হলো না তাকে। 'আলফা ছাড়া কোথাও যাই না আমি, কাজেই এর বেশি সতর্ক হওয়া বা না হওয়া সমান কথা। দেখা যাক।'

ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে এখনও, এগ্রিজেনটো রোডে লোকজন নেই বললেই চলে। ফুটপাথে দু'একজন গ্রাম্য বেপারীকে দেখা গেল। কাল সকালের বাজারে আগেভাগে জায়গা পাবার জন্যে পালার্মো শহরে এসেছে তারা। রাস্তায় লোকজন না থাকলেও ওয়াইন শপগুলো বেশ ভালই ব্যবসা করছে। পাশ ঘেঁষে যাবার সময় প্রায় প্রত্যেকটিতে লোক গিজগিজ করতে দেখল রানা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলো আসছিল পিছন থেকে, বোধহয় সেজন্যেই নিচু গলায় গাড়ির গতি কমাতে বলল সলোজা। গরু-ছাগল ভর্তি একটা ট্রাক পাশ কাটিয়ে গেল মার্সিডিজকে। দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। পিছনে তাকাল সলোজা। আর কোন গাড়ি বা আলো নেই।

'গুড,' বলল সে। হেলান দিল সীটে। 'প্রায় এসে গেছি। সাথে অস্ত্র আছে, রানা?'

মাথা নাড়ল রানা।

'দেখো, এটা চলবে কিনা।' রানার হাতে একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পয়েন্ট থ্রি-এইট স্পেশাল ধরিয়ে দিল সলোজা। তারপর তাকাল জালুচির দিকে।

'ব্যাপার কি, রানা?' জানতে চাইল জালুচি। 'আমরা কি বিপদ আশঙ্কা করছি?'

'বিপদ আমি প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করি,' উত্তর দিল সলোজা। 'সেজন্যেই আজও টিকে আছি।'

সামনের দিকে ঝুঁকে আবার শোফারকে নির্দেশ দিল সে। এক মুহূর্ত পর বাঁক নিয়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে এল গাড়ি। খানিক পর রাস্তাটা ক্রমশ ওপর দিকে উঠতে শুরু করল। দু'পাশে ঘন, গভীর বনভূমি। বেশির ভাগই পাইন গাছ।

জঙ্গলের ভেতর, পাহাড়ের একেবারে মাথায় ট্রাটোরিয়া। গ্রাম্য সরাইখানা বলতে যা বোঝায় ট্রাটোরিয়া ঠিক তাই। একটা খিলানের ভেতর দিয়ে এগোল গাড়ি। জায়গাটা দেখে মনে হলো, এককালে এখানে একটা বড়সড় বাগান ছিল। কিন্তু যত্ন আত্যি না করায় বুনো গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড়ের বংশ ইচ্ছেমত বেড়েছে।

ছোট একটা উঠানে থামল গাড়ি। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ সোজা উঠে গেছে টেরেসে। টেরেসের দরজাটা খোলা, হা হা করছে। ভেতর থেকে ভেসে আসছে গিটারের আওয়াজ। যেই বাজাক, দারুণ হাত তার। বাজনাটা চিনতে পেরে জালুচির চোহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। 'মাই গড! ওটা বাক, তাই না?'

'দ্য ফিউগ ইন জি মাইনর,' বলল সলোজা। 'অরিজিন্যালি লিউটের জন্যে কম্পোজ করা, এবং গিটারের জন্যে এ মাইনরে ট্রান্সক্রাইব করা হয়েছে। গ্রেট সেগোভিয়ার একটা ফেভারিট।' কান পেতে গিটারের বাজনাটা কয়েক সেকেন্ড শুনল সে। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'না, ছোকরা উন্নতি করছে।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল ওরা, এই সময় থেমে গেল গিটার। ওদেরকে পথ দেখিয়ে বড় চারকোনা কড়িকাঠ লাগানো একটা কামরায় নিয়ে এল সলোজা। দু'তিনটে কর্কশ চেহারার কাঠের টেবিল আর বেঞ্চ জিঙ্কের আবরণ দেয়া একটা বার ছাড়া ঘরের ভেতর আর কিছু নেই। বারের ওপর একটা গিটার পড়ে রয়েছে।

সরাইওয়ালা বুড়ো এক লোক, বয়সের ভারে তার শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে। পরনে সাদা অ্যাপ্রন। এক ধারে বসে থাকা দু'জন লোককে ওয়াইন পরিবেশন করছিল সে। চেহারাতেই লেখা আছে, লোক দু'জন কঠিন পাত্র। মুখে ক্ষত চিহ্ন, রোদে পোড়া চামড়া। উদ্ধত ভঙ্গি। পায়ে নোংরা জুতো। মাথায় কাপড়ের ক্যাপ। পরনে জিনস। একজনের হাঁটুর ওপর একটা শটগান পড়ে থাকতে দেখা গেল। অপরজন তার শটগানটা নিজের পাশে, বেঞ্চের ওপর ফেলে রেখেছে।

দরজার কাছে পজিশন নিল জালুচি। তার একটা হাত পকেটের ভেতর। সলোজাকে অনুসরণ করে বারের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, আড়াআড়িভাবে হেলান দিল বারের গায়ে, সহজ দৃষ্টিতে তাকাল দু'জনের দিকে। কঠোর দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল লোক দু'জন, কিছুক্ষণের জন্যে সরাইখানার ভেতর অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। এক চুল নড়ল না কেউ। প্রায় ত্রিশ সেকেন্ড পেরিয়ে যাবার পর কুঁজো বুড়ো এদিক ওদিক দুলতে দুলতে এগিয়ে এল। নোংরা একটা ন্যাকড়া দিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করল সে। বলল, 'বলুন কি খেদমত করতে পারি, সিনর?'

বার থেকে গিটারটা তুলে নিয়ে স্ট্রিঙে সামান্য একটু টিউন করল সলোজা, বাজাতে শুরু করল বাক ফিউগ। নেহাতই অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো রানার। এইমাত্র ওরা যেটা শুনেছে সেটা যদি দারুণ হয়ে থাকে, সলোজার বাজানোটাকে তাহলে যে-কোন মানদণ্ডে ব্রিলিয়্যান্ট বলতে হবে। এমন কি নিষ্ঠুর চেহারার লোক দু'জনও শিরদাঁড়া খাড়া করে মনোযোগ না দিয়ে পারল না।

হঠাৎ করে বাজনা থামিয়ে চিৎকার করে উঠল সলোজা, 'এক কথা কত বার বলতে হয়, বনেটি? ফোর্থ ফিঙ্গার নট দি থার্ড অন দ্য রান। তোমার বাজনা শুনে

তো মনে হলো পা দিয়ে গাড়ির ব্রেক কষছ!'

বারের ডান পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সে। পরনে কালো স্যুট কাঁধে একটা কারবাইন, ট্রিগারে আঙুল পেঁচানো। একহারা চেহারার একজন যুবক। ক্যাপের নিচে মুখটা আশ্চর্য হ্যান্ডসাম। খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

'হেই, আঙ্কেল ভার্জিল,' বলল সে। 'অ্যাদ্দিন পর কোত্থেকে?'

হাত দুটো প্রসারিত করল সলোজা, বারের ওপর রাইফেল রেখে মেলে দেয়া হাত জোড়ার ভেতর ঢুকে পড়ল বনেটি। মামা ভাগ্নে পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। ভাগ্নের দুই গালে চুমো খেল মামা।

'গড! তোমার গা থেকে গুয়ের গন্ধ বেরুচ্ছে! কদ্দিন গোসল হয়নি?' ঠেলে ভাগ্নেকে সরিয়ে দিল সলোজা। 'ভাগ্যিস তোমার এই হাল দেখার জন্যে আমার বোনটা বেঁচে নেই।'

'আমার কি দোষ! মাসের পর মাস গর্ত থেকে বেরুতে না পারলে···

'চোপ!' গর্জে উঠল সলোজা। 'তার আগে বলো, গর্তে তোমাকে ঢুকতে হলো কেন? বেয়াড়া, বেহায়া, বেশরম, বখাটে, বদমাশ···' খই ফুটছে তার মুখে।

বারের ওপর এক বোতল ওয়াইন আর কয়েকটা গ্লাস রাখল বুড়ো সরাইওয়ালা। গ্লাসগুলো ওয়াইন ঢেলে ভরল সলোজা। তাকাল বনেটির দিকে। 'মনে মনে ঠিকই জানো, মামা তো আছেই, শেষ মুহূর্তে সে-ই উদ্ধার করবে!' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ঘটছেও ঠিক তাই। তোমাকে আমি উদ্ধার করার জন্যেই এসেছি! এই রকম গুণধর ভাগ্নে যার, তার আর উপায় কি!'

'মামা!' বনেটির চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'তুমি তাহলে সব সামলে নিয়েছ? আমি এখন নিশ্চিন্ত মনে বাইরে বেরিয়ে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারি?'

'দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, না। মাফিয়ার হাত থেকে তোমাকে রক্ষা করার কোন প্ল্যান আপাতত, আমার নেই।'

'তাহলে?' ম্লান হয়ে গেল বনেটির চেহারা। 'তবে কি এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আবার তুমি আমাকে তোমার ব্যবসায় বসাতে চাও? উহ্, না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মামা, ওই লাশের মাঝখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলো না!'

রানার দিকে ফিরে বলল সলোজা, 'ইয়ং জেন্টারেশন সম্পর্কে আজ তোমাকে যা বলেছি সেটা মনে আছে তোমার? খুন করতে আপত্তি নেই, শুধু লাশের দিকে তাকাতে চাই না!' ঝাপটা দিয়ে বনেটির মাথা থেকে ক্যাপটা ফেলে দিল সে। 'বুদ্ধু কাঁহিকে! এর দিকে ভাল করে তাকাও, এ আমার বন্ধু, মাসুদ রানা। ইসরায়েলের একটা কারাগার থেকে একজনকে বের করে আনার ব্যাপারে রানাকে তুমি সাহায্য করতে যাচ্ছ!' ভাগ্নের বুকে তর্জনী দিয়ে খোঁচা দিল সে। 'লক্ষ্মী ছেলের মত রাজি হয়ে যাও, কিছু পকেট খরচাও পাবে।'

ক্যাপটা তুলে নিয়ে মাথায় দিল বনেটি। 'কত?'

'সেটা নির্ভর করবে তুমি কতটুকু সাহায্য করতে পারবে তার ওপর। দশ থেকে পঁচিশ হাজার ডলারের মধ্যে, ধরে নাও।'

চোখ দুটো চক চক করে উঠল বনেটির। 'কি করতে হবে আমাকে?'

'রাতের বেলা পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে উঠতে হবে,' বলল রানা। 'একশো

পঞ্চাশ ফিট।'

আবার উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বনেটির চেহারা। 'এতক্ষণে একটা মনের মত কথা বলেছেন!' গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে খট করে বারে নামিয়ে রাখল সেটা। বলল, 'চলুন তাহলে এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক! পাহাড়ে চড়তে হবে শুনলে দেরি সহ্য হয় না আমার।'

'ইয়ং জেনারেশন!' তিক্ত কণ্ঠে বলল সলোজা। 'এখানে এই ছেলেরা বসে রয়েছে, এরা তোমাকে আশ্রয় এবং পাহারা দিয়ে রেখেছে, তাই না?'

'আমার মা-ও বোধহয় এদের চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত না।'

'অকৃতজ্ঞ!' ভাগ্নেকে ঠেলে সরিয়ে দিল সলোজা, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল দুই যুবকের সামনে। কিছু টাকা হাত বদল হলো। তারপর ঘুরে দাঁড়াল সে। বলল, 'চলো যাওয়া যাক।'

বাইরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে টেরেস থেকে বাগানে নেমে এল ওরা। মার্সিডিজ থেকে নেমে দরজা খুলে দিল শোফার। ঠিক এই সময় রাস্তার উল্টোদিকের ঝোপটা নড়ে উঠল একটু। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রাইফেলের একটা ব্যারেল।

কে যে রাইফেলের লক্ষ্য, বুঝতে পারল না রানা। বোধহয় বনেটিই। ল্যাঙ মেরে সলোজাকে ফেলে দিল ও। একই সাথে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা বের করে পরপর তিনবার গুলি করল। তারপর ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কাতর একটা শব্দ। তারপরই সব স্থির। রাইফেলের ব্যারেলটা ঝোপের বাইরে দেখা গেল, মাটিতে পড়ে আছে। পড়ার সময় ভাগ্নেকে নিয়ে পড়েছে সলোজা। দেখাদেখি জালুচিও শুয়ে পড়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে সলোজার পাশে চলে এল রানা। চাপা গলায় বলল, 'আরেকজন না থেকেই পারে না!'

ক্রল করে এগোল রানা। মার্সিডিজটাকে ঘুরে থামল একটু, চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল ঝোপের ভেতর। পরমুহূর্তে ঢালু জমির ওপর গড়াতে শুরু করল ও। উপলব্ধি করল, ভুল করে বসেছে ও। শরীরটাকে স্থির করে উঠে দাঁড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওর সামনে পথের ওপর দাঁড়াল একজন লোক। হাতে একটা মেশিন-পিস্তল। পরনে রেনকোট মাথায় ফেল্ট হ্যাট। হ্যাটের জন্যে তার মুখটা ভাল করে দেখতে পেল না রানা। লোকটা গুলি করার জন্যে হাত তুলেছে, অথচ তখনও নিজেকে থামাতে পারেনি রানা। গুলি হলো।

বাতাসে উড়ল ফেল্ট হ্যাট। তার আগেই লোকটার চোখ জোড়ার মাঝখানে একটা গর্ত দেখা গেল। পরের বুলেটটা গুঁড়িয়ে দিল তার চোয়াল। পাশে দাঁড়ানো গাছটার সাথে ধাক্কা খেয়ে ঘাসের ওপর পড়ে গেল সে, কয়েক হাত নেমে গেল গড়িয়ে, তারপর আটকে গেল একটা ঝোপের কিনারায়।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল, রাস্তার ওপর দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে জালুচি, দু'হাত দিয়ে ধরে আছে ওয়ালথার পি. পি.। মাজল থেকে এখনও নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

'ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই,' বাঁকা হেসে বলল জালুচি। 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজ স্বার্থে রক্ষা করতে হয়েছে তোমাকে।' হোলস্টারে ভরে রাখল পিস্তল।

কোন জবাব দিল না রানা।

সরাইখানা থেকে ইতিমধ্যে বেরিয়ে এসেছে দুই যুবক। রাস্তা পেরিয়ে নিচে নেমে এল তারা। বনেটি আর সলোজা আগেই পৌঁচেছে। লাশটা পরীক্ষা করল ওরা। ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠে এল রানা।

একটু পরই মার্সিডিজের পাশে এসে দাঁড়াল সলোজা। 'ওদের একজনকে চিনি। ফারদা। একটা মাফিয়া গান। অপর লোকটাকে কখনও দেখিনি। লাশ দুটোর ব্যবস্থা বনেটির বন্ধুরা করবে।' মাথা নাড়ল সে, গম্ভীর সুরে বলল, 'আরেকটু হলে খতম হয়ে যেত বনেটি! ধন্যবাদ রানা।'

'ধন্যবাদ জালুচিরও পাওনা হয়েছে,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'তা ঠিক,' বলে জালুচির দিকে ফিরল সলোজা। মুখে হাসি নেই। 'একেবারে যা-তা নও তুমি। কাজেই তোমার ওপর একটা চোখ রাখতে হবে আমার।'

'আবার যদি সাহায্যের দরকার হয়, একবার শুধু ডাকলেই পাবে!' ব্যঙ্গের সুরে কথাটা বলে শোফারের পাশে উঠে বসল জালুচি।

বনেটিকে ডেকে নিল সলোজা, মার্সিডিজের ব্যাক সীটে বসল ওরা তিন জন। গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার। বাঁক নিয়ে মেইন রোডে উঠল মার্সিডিজ, সলোজা বলল, 'মিসিলমেরির বাইরে গরু-ছাগল ভর্তি একটা ট্রাক ওভারটেক করেছিল আমাদেরকে, মনে আছে, রানা?' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'ওই ট্রাকেই ছিল ওরা। আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল আমার। লক্ষণ খারাপ, বয়সটা বেয়াদপি শুরু করেছে আমার সাথে।'

কিন্তু আমি কাকে দায়ী করব?—মনে মনে ভাবল রানা। উচিত ছিল দু'জন লোককেই সামাল দিতে পারা। কিন্তু পারেনি ও। জমিটা ঢালু, সেটা মনে রাখা উচিত ছিল। এবং আরও আগে থেকে থামাবার চেষ্টা করা উচিত ছিল শরীরটাকে। ঠিক সময়ে জালুচি গুলি না করলে মারা যেত ও আজ একটু আগে।

সারাটা পথ মনে মনে নিজের সমালোচনা করে কাটাল রানা।

মাঝরাতের একটু আগে ভায়া সান মার্কো স্ট্রীটে পৌঁছুল ওরা। পথ দেখিয়ে ওদেরকে এন্ট্রান্স হলে নিয়ে এল সলোজা। খুদে একটা খুপরি থেকে বেরিয়ে এল বুড়ো অ্যাটেনড্যান্ট। মোমবাতির কাঁপা কাঁপা শিখার আবছা আলোয় লোকটাকে ফ্যাকাসে ভূতের মত লাগল।

'এক ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা করার জন্যে এসে বসে আছেন, সিনর সলোজা,' বলল লোকটা। 'আপনার অফিসে।' বুড়ো আবার তার খুপরির ভেতর গিয়ে ঢুকল। 'ও কি বাড়ি ফেরে না?' জানতে চাইল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল সলোজা, 'কেন যাবে? এই পরিবেশটা ওর ভারি পছন্দ! কোন হৈ চৈ নেই।'

মেহগনি কাঠের দরজা খুলে ওদেরকে পথ দেখিয়ে অফিস কামরায় নিয়ে এল সলোজা। সুন্দর ভাবে সাজানো একটা ঘর। দেয়ালে রোজউডের প্যানেল,

মেঝেতে এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত কার্পেট। সাদা রেনকোট পরা সুদর্শন এক যুবক ডেস্কের ওপর পা তুলে বসে আছে। মাথায় টুইড ক্যাপ। ঠোঁটে সিগারেট। সলোজাকে দেখে ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি?' বলল সে। 'জানো আমার একটা ডেট আছে···!'

তার গলার আওয়াজ শুনে এতক্ষণে বোঝা গেল, যুবক আর কেউ নয়, ওটেলিয়ো ফ্যালকন। পরিবর্তনটা অবিশ্বাস্য। চেনাই দায়।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' বলল সলোজা। 'আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করলে মরে যাবে না মেয়েটা।' কোট খুলে রানার দিকে ফিরল সলোজা। 'আমরা সবাই এখন তোমার অধীন, রানা। বলো কি দরকার?'

'প্রথমে দরকার ভাল একটা ফাস্ট বোট,' বলল রানা। 'আলবেনিয়ান রানে তুমি যেটা ব্যবহার করেছিলে সে রকম কিছু হলে চলবে না। পঁচিশ কিংবা ত্রিশ নট স্পীড থাকতে হবে।'

'ভিরোমা।' বোটের নামটা বলে হাসল সলোজা। 'পালার্মো হারবারেই আছে। একটা সমস্যা মিটল। তারপর?'

'জঞ্জবার কথা আগেই তোমাকে বলেছি। নাখালের বাইরে মদের দোকান আছে তার। জায়গাটা জেলখানা থেকে পনেরো মাইল দূরে। তার কাছ থেকে জেনেছি, এই পনেরো মাইলের মাঝখানে মুয়ালা নামে একটা ফিশিং ভিলেজ আছে। ছয় সাতটা কুঁড়ে ঘর, পুরানো একটা পাথুরে জেটি, এক জোড়া মাছ ধরার নৌকো। মুয়ালা গ্রামটাকে আমরা বেস হিসেবে ব্যবহার করব।'

'আমাদের ছদ্ম পরিচয় দরকার।' সিগারেট ধরাল জালুচি।

'ওই বে-তে আর্কিওলজিক্যাল ডাইভিঙের জন্যে পারমিট দরকার,' বলল রানা। 'রোমের ইসরায়েলি দূতাবাস থেকে যোগাড় করতে পারবে তোমরা। মারানজানা দু'একটা সুতো টানলেই কাজ হবে। আশা করি এটা তার সাধ্যের বাইরে নয়।'

'পানির নিচে নেমে কি খোঁজ করার ভান করব আমরা?' জানতে চাইল ওটেলিয়ো।

'রোমান ধ্বংসাবশেষ,' বলল রানা। 'এতে করে কারও মনে কোন সন্দেহের উদয় হবে না। এলাকাটা রোমান ধ্বংসাবশেষে গিজ গিজ করছে।'

'তার মানে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট লাগবে,' বলল সলোজা। 'অবশ্য সেটা কোন সমস্যা নয়। ভিরোমায় ওসব মজুদ আছে।'

'তার সাথে আরও কিছু যোগ করতে হবে। তিন কি চারটে রোমান ওয়াইন জার চাই আমি। ওগুলো কি, তা তুমি জানো। টিপিক্যাল অ্যামফোরা ষোলো বা সতেরো শো বছর ধরে পড়ে আছে সাগরের তলায়, গায়ে সী-শেলের কর্কশ আবরণ পড়েছে। মার্শালায় ওদিকে নাকি জেলেরা প্রায়ই তাদের জালে পায় এগুলো।'

'আজকাল তারা ট্যুরিস্টদের কাছে বিক্রিও করে। যে-কোন অ্যান্টিকের দোকানে পাওয়া যায়।'

'ইসরায়েলি আর্মির ইউনিফর্ম দরকার হবে আমাদের। সেই সাথে এ-কে অ্যাসল্ট রাইফেল।' সলোজা হাসতে শুরু করায় আবার বলল রানা, 'জানি, মজার ব্যাপার হলো, এ-কে অ্যাসল্ট রাইফেলের একটা গোডাউন আছে তোমার। কোথায় যেন পাঠাবে ওগুলো—বেলফাস্ট নাকি বাহরাইন?'

জালুচি জানতে চাইল, 'কবে রওনা হতে চাই আমরা?'

'আগামী শুক্রবারটা মিস করলে আরও এক হপ্তা অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা। 'সময় একটা বড় ফ্যাক্টর, কাজেই এই শুক্রবারেই। কিন্তু···আজ সোমবার, বুধবারের মধ্যে সব জিনিস বোটে তুলে নিয়ে কাপু পাসারোয় হাজির হতে পারব কি?'

'না পারার কি আছে!' বলল সলোজা।

জালুচিকে বলল রানা, 'তার মানে, আবহাওয়া অনুমতি দিলে বৃহস্পতিবার মুয়ালায় পৌঁছে যাব আমরা।'

'সব কিছু যদি ঠিক ঠাক মত ঘটে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সব ঠিকমত ঘটবে কি ঘটবে না জানি না বলেই তো জীবন এত উত্তেজনাকর। তুমি বরং সকালেই ফিরে গিয়ে মারানজানাকে সব কথা জানাও। আর কালকের প্রথম ফ্লাইটেই জেরুজালেমে পাঠিয়ে দাও জজবাকে। সে যেন মুয়ালায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে বৃহস্পতিবার রাতে।'

'তুমি?'

'এখানে আমার অনেক কাজ,' বলল রানা। 'আমি বোটে করে কাপু পাসারোয় ফিরব।'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো তর্ক করতে চায় জালুচি, কিন্তু সে কিছু বলার আগেই ওটেলিয়ো বলল, 'এবার আমি যেতে পারি?'

'ঠিক আছে যাও,' বলল সলোজা। 'কিন্তু সকাল আটটার মধ্যে ফিরে না এলে আমি তোমার কান কেটে নেব।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ওটেলিয়ো। অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য দেখা গেল ঘরের এক কোণে। একটা চেয়ারে বসে দিব্যি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে বনেটি। সেদিকে চোখ পড়তে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সলোজা। 'এদেরকে নিয়ে কার কি করার আছে বলো তো!' হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'ওহো, তোমাকে দেখাবার মত একটা জিনিস আছে, রানা। নতুন একটা গান।'

ওয়াচ-চেন থেকে চাবি খুলে নিয়ে কোণের ছোট একটা দরজা খুলল সে। বোতাম টিপে আলো জ্বালল। কাঠের সিঁড়ির ছোট ছোট কয়েকটা ধাপ বেয়ে তাকে অনুসরণ করে আন্ডারগ্রাউন্ড করিডরে নেমে এল ওরা। করিডরের দু'পাশে হোয়াইটওয়াশ করা দেয়াল। আরও একটা বোতামে চাপ দিল সে। করিডরের শেষ প্রান্তে এক সার টার্গেট আলোকিত হয়ে উঠল। টার্গেটগুলো বিভিন্ন দেশের ইউনিফর্ম পরা আক্রমণোদ্যত সৈনিক। টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে ভেতর থেকে টিনের একটা বাক্স বের করল সলোজা। বাক্সের ওপর স্টেনসিল দিয়ে রাশান ভাষায় কি যেন লেখা রয়েছে।

'একটা স্টেচকিন,' বলল সে। 'সত্যিকার মেশিন-পিস্তল। মাউজারের পর এত

ভাল জিনিস আর দেখিনি। প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট ব্রাউনিংয়ের চেয়ে ভাল। যদি চাও, পুরোপুরি অটোমেটিক অবস্থায় চালাতে পারো।'

বাক্সটা খুলছে রানা, এই সময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল জালুচি। কাঠের একটা হোলস্টারে রয়েছে স্টেচকিনটা, দেখতে প্রায় ব্রাউনিংয়ের মতই।

'পাঁচ ইঞ্চি ব্যারেল, বিশ রাউন্ড ম্যাগাজিন', বলল সলোজা। 'ভয়ঙ্কর একটা গান, বিশেষ করে কাঠের হোলস্টারটাকে যদি স্টক হিসেবে ব্যবহার করো। মানুষ আকারের একটা টার্গেটকে দেড়শো গজ দূর থেকেও ভেদ করতে পারবে। ঠিক যেখানে মারতে চাও।'

'আমি চ্যালেঞ্জ করছি,' বলল জালুচি। 'রাজি, রানা?'

রানার কাছ থেকে স্টেচকিন নিয়ে প্রথমে বাঁ হাত দিয়ে, তারপর ডান হাত দিয়ে, সবশেষে দু'হাত দিয়ে ওজন অনুভব করল জালুচি। একটা অ্যামুনিশন ক্লিপ দিল তাকে সলোজা। বলল, 'স্লাইডের পিছনে, বাঁ দিকে সেফটি সিলেকটর। মাঝখানে সেমি অটোমেটিক। ওপরে অটোমেটিক।'

সতর্কতার সাথে লক্ষ্যস্থির করে প্রথম টার্গেটের মাথায় গুলি লাগাল জালুচি। তারপর পরপর পাঁচবার গুলি করল সে। তিনটে গুলি লাগল হার্ট এলাকায়, একটার কাছ থেকে আরেকটার দূরত্ব সামান্য। বাকি দুটো কিনারা ঘেঁষে লাগল।

'মন্দ নয়,' বলল সে। 'তবু, আমার মনে হয় ট্রিগারটা আরও হালকা করলে ভাল হত।'

অটোমেটিকের ঘরে সিলেকটর তুলে দ্বিতীয় টার্গেটে অবশিষ্ট ম্যাগাজিনটা শেষ করল সে। টার্গেট ঝাঁঝরা হয়ে গেল। কোন কথা না বলে অস্ত্রটা রানার হাতে তুলে দিল সে।

রানাকে আরেকটা ম্যাগাজিন দিল সলোজা। রিলোড করল রানা। লক্ষ্যস্থির করল। তৃতীয় টার্গেটকে লক্ষ্য করে গুলি করল ছয় বার। হার্টের কিনারায় লাগল একটা বুলেট। একটা বাদে বাকি সবগুলো কাঁধে লাগল। ওই একটা একেবারেই ব্যর্থ হলো, টার্গেটকে ছুঁতেই পারল না।

ব্যঙ্গের সুরে হাসল জালুচি। 'আজ তুমি সুবিধে করতে পারছ না, কি বলো?' রানার কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দিল সে। 'চললাম।' বলে দরজার দিকে এগোল।

'দাঁড়াও,' অর্ডার করল সলোজা। 'মনে করে দেখো কিছু ভুলে রেখে যাচ্ছ কিনা!'

একগাল হাসল জালুচি। পকেট থেকে এনভেলাপটা বের করে রাখল টেবিলের ওপর। 'আমি তো ভেবেছিলাম তোমরাই ভুলে গেছ, আর বোধহয় মনেও পড়বে না! দেখা হবে, রানা।'

কাঠের ধাপ বেয়ে উঠে গেল জালুচি। দরজাটা তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। এনভেলাপটা খুলে ব্যাংক ড্রাফটা চেক করল সলোজা।

'সকালেই টাকাটা ক্যাশ করে নিয়ো,' বলল রানা।

'উত্তর দাও রানা,' অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাল সলোজাকে। 'একটু আগের ব্যাপারটা কি? জালুচিকে তুমি জিততে দিলে কেন?'

'যাতে ও বিশ্বাস করে আমার চেয়ে অনেক ভাল হাত ওর,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে

বলল রানা। 'কেউ যদি নিজেকে সেরা ভেবে আনন্দ পায়, তাতে ক্ষতি কি?'

এরপর রানা পরপর তিনবার এত দ্রুত ফায়ার করল যে আওয়াজ শুনে বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য যে-কোন লোকের মনে হবে একটাই গুলি হয়েছে। অবশিষ্ট টার্গেটগুলোর প্রত্যেকটির দুই চোখের মাঝখানে একটা করে বুলেট ঢুকে গেল।

টেবিলের ওপর স্টেচকিন নামিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, সত্যি একটা আশ্চর্য গান। রওনা হবার সময় মনে করিয়ে দিয়ো, সাথে রাখব একটা।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল রানা।

সাত

বুধবার। কাপু পাসেরো। ভিলার নিচে ক্ষুর আকৃতির বে-তে পৌঁছুল ওরা। মাঝ রাতে পালার্মো ত্যাগ করেছিল বোটে, ওয়েস্টার্ন রুট ধরে সিসিলিয়ান চ্যানেল আর গলফো ডি গেলার ভেতর দিয়ে মার্শালাকে পাশ কাটিয়ে এসেছে ওরা।

দুটো বয়ার সাথে বে-র মাঝখানে বাঁধা রয়েছে সেসনা। পাথুরে জেটির দিকে এগোচ্ছে ভিরোমা, এই সময় মেঠো পথে দেখা গেল ল্যান্ডরোভারটাকে। একটুও আশ্চর্য হলো না রানা। দুর্গ প্রাচীর থেকে নিশ্চয়ই সারাক্ষণ সাগরের দিকে নজর রাখার ব্যবস্থা আছে।

হুইলহাউসে রয়েছে সলোজা। বনেটি আর ওটেলিয়ো ভিরোমার কিনারায় দাঁড়িয়ে জেটি ধরে ফেলে ধাক্কাটা সামাল দিল। একটা লাইন নিয়ে রেলিং টপকাল রানা। লুপ তৈরি করে বোলার্ডে গলাচ্ছে সেটা, এই সময় ল্যান্ডরোভার থেকে নেমে এগিয়ে এল জালুচি। পিছনে মাইক আটানা।

'হ্যালো, রানা! সব ঠিক আছে তো?'

ছোট বড় অনেকগুলো ক্ষত দেখা গেল মাইক আটানার মুখে, বাঁ চোয়ালে স্টিচ পড়েছে। পুরানো ক্ষতগুলোর সাথে এগুলো যোগ হওয়ায় মুখে কোথাও অক্ষত চামড়া নেই বললেই চলে। এখন শুধু কুৎসিত নয়, বীভৎস দেখাচ্ছে চেহারাটা।

'তোমার সাথে ওটা কে?' প্রশ্ন করল রানা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আটানা। হাতের স্টার্লিং সাব-মেশিনগানটা কাঁধ থেকে নামাল। চেহারা দেখে মনে হলো, নিজেকে সামলে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে।

'আগের মতই ফুর্তিতে আছ তাহলে!' বলল জালুচি। 'শোনো, সিনর মারানজানা তোমাদের তলব করেছেন। তোমাকে আর সলোজাকে। অন্য দু'জন এখানে থাকতে পারে।'

'সলোজাকে কেন?'

'আমার কাছ থেকে ওর সম্পর্কে শুনে সিনর মারানজানা ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়েছেন,' বলল জালুচি। 'এমন একজন গুণী লোক, তাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন তিনি।'

'আমিও বুড়ো ভামটাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছি,' হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল সলোজা। 'বয়স তো আমার চেয়ে খুব কম নয়, কিন্তু তার চামড়া কি আমার মত টাইট? রোজ সকালে কি সে তিন সের মাংস খেয়ে হজম করতে পারে? সূর্য ওঠার আগে দৌড়াতে পারে তিন মাইল? রোজ রাতে নতুন মেয়ে সামলাতে পারে?'

'খবরদার!' সাবধান করে দিল রানা। 'এসব প্রশ্ন করো না তাকে! লজ্জা পাবে!'

হো হো করে হেসে উঠল সলোজা।

সলোজার বুক লক্ষ্য করে সাব-মেশিনগান তুলল আটানা, বলল, 'অনুমতি দিন সিনর, জালুচি, ঝাঁঝরা করে দিই শরীরটা।'

'তোমাকে নিয়ে এই এক জ্বালা!' বলল জালুচি। 'রসিকতাও বোঝো না!' ইঙ্গিতে সলোজার বাঁ কোমরে ঝুলন্ত স্প্রিং হোলস্টারটা দেখাল সে। হোলস্টারে একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পয়েন্ট থ্রী এইট রয়েছে। 'এটা এখানে রেখে যেতে হবে, সলোজা।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল সলোজা, ঝুঁকে হুইলহাউসের ভেতর তাকাল, ছুঁড়ে দিল সেটা চার্ট টেবিলের ওপর।

রানার দিকে ফিরল জালুচি। 'কিছু আছে তোমার কাছে?'

কথা না বলে হাত দুটো ওপরে তুলল রানা। ওকে সার্চ করল জালুচি। কিন্তু ইংরেজীতে যাকে বলে স্মল অব দি ব্যাক, বিশেষজ্ঞদের ধারণা অস্ত্র লুকিয়ে রাখার জন্যে ওটা একটা নিরাপদ এবং ভাল জায়গা, সেখানে জালুচির হাতের স্পর্শ অনুভব করল না রানা। জালুচির তরফ থেকে এটা একটা সিরিয়াস ভুল। তার এই অমনোযোগিতা মনে রাখল রানা।

সার্চ শেষ করে সন্তুষ্ট হলো জালুচি। 'তোমার এই জিনিসটা আমার খুব পছন্দ। পরিস্থিতি বুঝতে দেরি করো না। চলো, যাওয়া যাক তাহলে।'

জেটিতে রয়ে গেল আটানা। হাঁটুর ওপর স্টার্লিং রেখে একটা বোলার্ডের ওপর বসল সে। ল্যান্ডরোভারের ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা আর সলোজা। ড্রাইভ করছে জালুচি।

'কিটি কেমন আছে?' জানতে চাইল রানা।

'চমৎকার,' হাসিমুখে বলল জালুচি। 'লাভলি গার্ল। ওকে দেখলেই আমার নিজের ছোট বোনের কথা মনে পড়ে যায়।' রানার হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে গেল, কিন্তু সেটা দেখতে পেল না জালুচি। বলে চলল, 'এত ভাল পিয়ানো বাজায়, অথচ চর্চায় কোন রকম ফাঁকি নেই! একটা মেয়ে বটে! খুব আনন্দে আছে। কিছুই টের পায়নি। লিলিও তার সাথে কিছুটা সময় কাটায়।'

'সেই সাথে প্রাউ পাসোডেনা আর ডোবারম্যান কুকুরটাও,' বলল রানা। 'আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছিল কিটি?'

'না! বরং আমাকে বলল, কাজ শেষ হলে এক মিনিটও দেরি করবে না আঙ্কেল রানা!'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

উঠানে এসে থামল ল্যান্ডরোভার। গাড়ি থেকে নেমে বাগানে ঢুকল ওরা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল হাই টেরেসে।

দুর্গ প্রাচীরের সামনে দুটো ওয়াকিং স্টিকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সালভাদর মারানজানা, তাকিয়ে আছে বে-র দিকে। তার পিছনে লাঞ্চের জন্যে সাজানো হয়েছে টেবিল। একটা সিংহাসন আকৃতির চেয়ার ফেলা হয়েছে মারানজানার জন্যে, সেটার মুখোমুখি চেয়ারটা রানার জন্যে ফেলা হয়েছে, বোঝা গেল চেয়ারের সামনে টেবিলের ওপর একটা বিয়ারের বোতল আর মগ দেখে। আর সবার জন্যে একটা করে ওয়াইনের বোতল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েটার। বোরো আর গাটো সেই আগের মতই সোয়েটার গায়ে পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকে ভাঁজ করা হাত।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল মারানজানা। প্রথমে রানাকে তারপর সলোজাকে দেখল সে।

'ইনিই তাহলে সিনর সলোজা,' বলল মারানজানা। 'পুরানো জাহাজ, তবে ধ্বংসাবশেষ নয়। আই কংগ্র্যাচুলেট ইউ, সিনর সলোজা!'

ছড়িতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মারানজানা। এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। তাকে ধরে চেয়ারে বসতে সাহায্য করল ওয়েটার। তারপর গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে সেটা তার হাতে ধরিয়ে দিল। মৃদু একটা চুমুক দিয়ে ওয়াইনের স্বাদ নিল মারানজানা। তাকাল রানার দিকে।

'বলো, স্যার, তোমার খবর কি?'

'কিটিকে দেখতে চাই,' বলল রানা। 'তার আগে কোন কথা নয়।'

ইতস্তত না করে সামান্য একটু মাথা ঝাঁকাল মারানজানা। তাকাল জালুচির দিকে। 'ঠিক আছে জালুচি। পাঁচ মিনিট।'

খিলানের নিচে দিয়ে বাগানের আরেক অংশে চলে এল জালুচি, তাকে অনুসরণ করল রানা। 'ভালয় ভালয় অপারেশনটা শেষ হয়ে গেলে সিনর মারানজানা তোমার ওপর কৃতজ্ঞ বোধ করবেন, রানা!' হঠাৎ থেমে রানাকে পাশে চলে আসার সুযোগ দিয়ে বলল জালুচি। 'তুমি জানো না, তার একটা কোমল দিকও আছে!'

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে, কিন্তু ঘুসিটা আসতে দেখে লাফ দিয়ে সরে গেল জালুচি। 'আরে, তোমার কি মাথা খারাপ হলো!' সকৌতুকে বলল সে। 'সারাক্ষণ যদি এই রকম মারমুখো হয়ে থাকো, তোমার সাথে কাজ করব কিভাবে?'

কিছু একটা আভাস দিল জালুচি। এক মুহূর্ত পর অর্থটা অনুমান করতে পারল রানা। জালুচি বোধহয় বলতে চাইল, অপারেশনে রানার সাথে সে-ও থাকবে! সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা।

আজ কিটি পিয়ানো বাজাচ্ছে না। কিন্তু হাসি আর কুকুরের ডাক শুনতে পেল রানা।

'স্বীকার করি, তোমার সাথে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি আমরা,' নিরাপদ দূরত্বে সরে আছে জালুচি, ঘন ঘন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে রানাকে। 'কিন্তু

কাজের পদ্ধতি সবার তো এক রকম হয় না! কি আর করবে বলো! এখন তোমার শুধু কিটির নিরাপত্তার কথা চিন্তা করা উচিত। সত্যি বলছি, ফুলের মত নিষ্পাপ একটা মেয়ে, ওর কিছু একটা ঘটলে সাংঘাতিক দুঃখ পাব আমি। সেজন্যেই এত কথা বলা।'

জালুচির কোমরে পিস্তল রয়েছে, কিন্তু তবু মনে মনে একটা হিসেব করে বুঝতে পারল রানা, ইচ্ছে করলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে এই মুহূর্তে খুন করতে পারে সে। কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই।

আবার মুখ খুলতে যাচ্ছে জালুচি, তাই দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'আর যদি একটা কথা বলো, আমি ফিরে যাব। আমাকে দেখাবার জন্যে সাথে করে নিয়ে আসবে তুমি কিটিকে।'

'সিনর মারানজানাকে দিয়ে ধমক খাওয়াতে চাও বুঝি?' হো হো করে হেসে উঠল জালুচি। 'বেশ। এই চুপ করলাম।'

নিচু একটা পাঁচিলের সামনে থামল ওরা। পাঁচিলের ওদিকে বাগান। ঘাসের ওপর সতরঞ্চি বিছানো রয়েছে, তাতে বসে আছে কিটি। পাশে লিলি। বারবার একটা টেনিস বল ছুঁড়ে দিচ্ছে কিটি, ব্যগ্রভাবে ছুটে গিয়ে সেটা মুখে করে ফিরিয়ে আনছে ডোবারম্যান কুকুরটা। কাছেই একটা পাথরের বেঞ্চ, তাতে বসে আছে প্রাউ পাসোডেনা। উল বুনছে।

'চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন!' অবাক কণ্ঠে বলল জালুচি, 'পাসোডেনা ছাড়া আর কাউকে সহ্যই করতে পারে না কুকুরটা! অথচ কিটিকে কেন যে এত পছন্দ হলো ওর!'

মুখ তুলে ওদেরকে দেখতে পেল লিলি। নিমেষে মিলিয়ে গেল মুখের হাসি, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে। স্পষ্ট শুনতে পেল রানা, লিলিকে জিজ্ঞেস করছে কিটি, 'কি ব্যাপার?'

রানার শার্টের আস্তিন ধরে টান দিল জালুচি। 'চলো, ফিরি। কুকুরটাকে আপসেট করা উচিত হবে না আমাদের, তাই না?'

রক্তচক্ষু মেলে জালুচির দিকে তাকাল রানা।

কিন্তু এবার আর জালুচির চেহারায় কৌতুকের ভাব ফুটল না। চটে উঠে বিরক্তির সাথে বলল, 'তোমার সাথে কথা বলাই দেখছি দায়!'

কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, জালুচিকে পাশ কাটিয়ে এগোল দ্রুত পায়ে। হাই টেরেসে উঠে এসে দেখল, মারানজানা আর সলোজা দুই মাথা এক করে একটা ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল্টি চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। ইসরায়েলি কোস্ট লাইন পরীক্ষা করছে ওরা।

মুখ তুলে তাকাল মারানজানা। 'এই যে, মি. রানা! কেমন লেখলে কিটিকে? নিশ্চয়ই কোন অভিযোগ নেই?'

মারানজানার সামনের চেয়ারটা টেনে বসল রানা। 'কিটি প্রসঙ্গ থাক।'

কাঁধ ঝাঁকাল মারানজানা। 'বেশ। তাহলে পালার্মোয় কি ঘটল তাই দিয়ে শুরু করো?'

'আর্কিওলজিক্যাল ডাইভিঙের জন্যে ইসরায়েলি দূতাবাস থেকে পারমিট

যোগাড় করেছ?' জানতে চাইল রানা।

পকেট থেকে একটা এনভেলাপ বের করল জালুচি। 'এই যে।' বলল সে। 'এক রাশ টাকা লেগেছে এটা যোগাড় করতে।'

জালুচির হাত থেকে পারমিটটা নিয়ে পরীক্ষা করল রানা। জেনুইন কাগজ-পত্র, জাল নয়। এনভেলাপটা নিজের কোটের পকেটে রেখে দিল ও।

'সন্তুষ্ট?' জানতে চাইল মারানজানা।

জবাব না দিয়ে অ্যাডমিরাল্টি চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, বলল, 'আমরা যদি আজ দুপুরে রওনা হই, পরশু সকালের দিকে মুয়ালায় থাকব। ওখানে জজবাকে দরকার হবে আমার। সে যদি হাজিরা না দেয় আমরা ডুববে।'

'জজবা ডোবাবে না,' বলল মারানজানা। 'প্রচুর টাকা খাচ্ছে সে।' বাক্স থেকে সিগার বের করে নিজে একটা নিল, একটা বাড়িয়ে দিল সলোজার দিকে। কিন্তু সলোজা মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল তাকে। 'তার আগে, মি. রানা, তোমার প্ল্যানটা কি জানতে চাই আমি।'

'ভিরোমা নিয়ে মুয়ালা উপকূলে পৌঁছুব আমরা। সবাই জানবে বে-তে রোমান ধ্বংসাবশেষ খোঁজার জন্যে আমরা কয়েকজন আর্কিওলজিস্ট এসেছি, সাথে কয়েকটা অ্যামফোরা আছে, রাতের অন্ধকারে সেগুলো সাগরে ফেলে দিয়ে সকালে গ্রামের লোকজনের সামনে আবার তোলা হবে। এরপর কারও মনে কোন সন্দেহ থাকবে বলে মনে হয় না।'

খানিক চিন্তা ভাবনা করল মারানজানা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'নট ব্যাড, মি. রানা। তারপর? কারাগারে হানা দেবে কিভাবে?'

'জালুচির মুখে নিশ্চয়ই ওটেলিয়ো ক্যালকনের কথা শুনেছ?' মাথা ঝাঁকাল মারানজানা। বলে চলল রানা, 'যেভাবে ঠিক করা হয়েছে, মানে মেয়েদের সাথে কারাগারে ঢুকবে ও। ভেতরে ঢোকার পর ওর কাজ হবে উত্তর প্রাচীরের কাছে পৌঁছে সেন্ট্রি দু'জনকে কাবু করা।'

'করা বললেই করা যায় কি?' মারানজানার কপালে চিন্তার রেখা দেখা গেল। 'কাজটা মাত্র একজনের জন্যে খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'ওটেলিয়ো একাই একশো,' বলল রানা। 'গ্রীন বেরেট ছিল ও। হালকা একটা লাইন থাকবে ওর সাথে, নিচে ফেলে দেবে সেটা। পাহাড়ের নিচে, পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকব আমি আর বনেটি। ওটেলিয়োর লাইনের সাথে একটা ক্লাইম্বিং রোপ বাঁধব আমরা। ওটেলিয়ো ওটা টেনে তুলে নেবে ওপরে, বেঁধে দেবে শক্ত কিছুর সাথে। এরপর বনেটির সামনে কোন সমস্যা থাকবে না। পাহাড়ের পোকা বলা যেতে পারে তাকে। ওপর থেকে ওরা দু'জন টেনে তুলবে আমাকে আর সলোজাকে।'

'যদি ধরে নিই সব ঠিকঠাক মত ঘটবে, তাহলে এর চেয়ে ভাল প্ল্যান আর হতে পারে না।'

'ওটেলিয়ো কাপড় বদলাবে, তারপর আমরা কোন রকম লুকোচুরি না করে সবার সামনে দিয়ে এগোব কমান্ডান্টের বাড়ির দিকে। কারাগার রক্ষীরা আমাদের দেখেও কিছু বলবে না, কারণ আমাদের পরনে থাকবে তাদেরই মত সামরিক

ইউনিফর্ম। মেয়েদের ওপর সাংঘাতিক দুর্বলতা আছে কর্নেল খানজুমের, কাজেই ধরে নেয়া যায়, শুক্রবার রাতে সাংঘাতিক ব্যস্ত থাকবে সে। তাকে কাবু করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে বলে মনে হয় না।'

'তারপর?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল মারানজানা। 'তারপর কি ঘটবে?'

'আমার নির্দেশে তোমার সৎছেলে ববিকে নিজের বাড়িতে আনাবে কর্নেল খানজুম,' বলল রানা। 'ববিকে নিয়ে মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে আসব আমরা, খানজুমের গাড়ি নিয়ে। সোজা মুয়ালায় এসে বোটে চড়ব। রাতের ওই সময় উপকূল এলাকায় গিজ গিজ করবে মাছ ধরার নৌকো আর বোটগুলো। আমাদের বোটের মাস্তুলে দু'একটা নেট ঝুলিয়ে নেব আমরা, তাহলেই কেউ আর আমাদেরকে আলাদা ভাবে সনাক্ত করতে পারবে না।'

ম্যাপের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকল মারানজানা। এক মগ ভর্তি বিয়ার শেষ করল রানা। অবশেষে মুখ তুলল মারানজানা, তাকাল সলোজার দিকে। 'আপনি কি বলেন, সিনর সলোজা?'

'রানার সাথে যাচ্ছি আমি, তা থেকেই প্ল্যানটা সম্পর্কে আমার ধারণা বুঝে নিন।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না!' চিন্তিত ভাবে বলল মারানজানা। 'প্ল্যানটা ভাল নয় তা বলছি না। কিন্তু এতে অনেক যদি আর কিন্তু আছে। আরও শিওর কোন উপায় নেই, মি. রানা? আরও নিরাপদ কিছু?'

হো হো করে হেসে উঠল সলোজা। 'আজব মানুষ তো আপনি, মারানজানা। আগুনে ঝাঁপ দিতে বলছেন, অথচ জানতে চাইছেন নিরাপদে ঝাঁপ দেয়া যায় কিনা!'

'অন্য কারও নিরাপত্তার কথা ভাবছি না আমি,' গম্ভীর সুরে বলল মারানজানা। 'আমি আমার ছেলের কথা ভেবে চিন্তিত। দলটা নিরাপদে পৌঁছে আবার বেরিয়ে আসতে না পারলে তাকে আমি পাব না সেটাই আমার মাথাব্যথার কারণ।'

'আপনার জানা উচিত, এ-ধরনের অ্যাসাইনমেন্টে শিওর বা নিরাপদ কোন পন্থা নেই,' হাসতে হাসতে বলল সলোজা। 'সাদামাটা সত্য হলো সব যদি ঠিকঠাক মত ঘটে, আমরা সফল হব। কিন্তু মাত্র একটা ব্যাপারেও যদি আমাদের ধারণা মিথ্যে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাসের গোটা ঘরটাই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।'

ম্যাপের দিকে তাকাল আবার মারানজানা। চোখ না তুলেই এক সময় বলল, 'জালুচি কি যেন বলতে চায়।'

মুখ দেখে কিছু বোঝা না গেলেও মনে মনে গাল দিল রানা, কুত্তার বাচ্চা! জালুচি এখন কি বলবে আন্দাজ করতে পেরেছে ও।

'অজ্ঞা কি, বলো-বলো,' জালুচির দিকে ফিরে উৎসাহ দেবার ভঙ্গি করল সলোজা। 'আমরা সবাই তোমার কথা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছি!'

নিঃশব্দে হাসল জালুচি। 'ব্যাপারটি তোমার পছন্দ হবে না, রানা। কিন্তু পছন্দ না হলেও, মেনে নিতে হবে।'

ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকাল রানা। 'ভণিতা না করে যা বলবার সংক্ষেপে

বলো।' সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে আগেই।

'ধরো, ইসরায়েলি সামরিক ইউনিফর্ম পরে কারাগারের উঠান ধরে এগোচ্ছ তুমি, এই সময় একজন সার্জেন্ট বা গার্ড যদি তোমাকে থামায়, নিজেদের ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করে বা আর কিছু না শুধু গুডনাইট বলে, তুমি কি করবে তখন?'

রানা কিছু বলার আগেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সলোজা। একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল জালুচি।

'এত হাসির কি ঘটল?' জানতে চাইল সে। 'রানা কি হিব্রু ভাষা বলতে পারে?'

'অনর্গল!' বলে আর এক দফা গলা ছেড়ে হাসল সলোজা।

'তুমি একটা বুদ্ধু, জালুচি,' ঘোষণা করল মারানজানা। 'এত কায়দা না করে, সোজাসুজি বললেই তো হয় যে মি. রানা আর সলোজার নিরাপত্তার দিকটা দেখার জন্যে ওদের সাথে তুমিও যাচ্ছ।'

গম্ভীর সুরে বলল জালুচি, 'হ্যাঁ। আমিও যাচ্ছি, রানা।'

সরাসরি মারানজানার দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু কথা ওল্টাচ্ছ তোমরা। আমি যদি রাজি না হই?'

সাথে সাথে জবাব দিল মারানজানা, 'তাহলে মনে করব, কিটির বিপদ হবে জেনেও আমাদের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করছ তুমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। যাবে ও।'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মারানজানার চেহারা। 'এ-জন্যেই তোমাকে আমার এত পছন্দ, স্যার! ইউ আর এ স্পোর্ট।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'গোসল করব। এসো সলোজা।'

সলোজাকে পিছনে নিয়ে হাই টেরেস থেকে নেমে এল রানা। নিজের কামরার দিকে যাবার সময় বলল, 'এই সুযোগ আমি ছাড়ব না, সলোজা। ফিরিয়ে আনব না বলেই সাথে করে নিয়ে যেতে রাজি হলাম।' কিন্তু কথাটা বলেই বুঝল, এটা তার রাগের বিস্ফোরণ। জালুচিকে ফিরিয়ে না আনলে জটিলতা শুধু বাড়ানোই হবে।

আট

সলোজাকে আলাদা একটা কামরা দেয়া হয়েছে। গোসল করে ওখানেই বিশ্রাম নেবে সে।

কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। আরেকটা তোয়ালে দিয়ে মাথার পানি মুছছিল ও, তাই লিভিংরুমে ঢুকেই দেখতে পেল না লিলিকে। খোলা দরজার দিকে চোখ পড়ল খানিক পর, দেখল, টেরেসে একা বসে আছে সে। রানার উপস্থিতি টের পেলেও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না। টেরেসে বেরিয়ে এল রানা। সামনাসামনি বসল একটা চেয়ারে। 'তারপর?'

নিচের বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে লিলি, তাকিয়েই থাকল। মুখের চেহারা

শান্ত। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা আহত ভাব। রানার দিকে না তাকিয়েই ভারী গলায় জানতে চাইল, 'কি করতে হবে আমাকে? কি করলে তোমার…' হঠাৎ থেমে গেল সে।

'ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, সেটা যেখানে ফেলতে চেয়েছিলে, আমার মাথায়, পড়েছেও সেখানে,' মৃদু হাসল রানা। 'তোমার কাছ থেকে আর কি আশা করার থাকতে পারে আমার?'

সামনের টেবিল থেকে পানির গ্লাসটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে ঠেকাল লিলি। ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল গ্লাসটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেটার দিকে। আবার যখন কথা বলল সে, বোঝা গেল গলার আওয়াজটা শান্ত স্বাভাবিক রাখার জন্যে নিজের সাথে যুঝতে হলো তাকে।

'কিটি—এই ক'দিনেই ওর ওপর মায়া পড়ে গেছে আমার। এমন সরল মেয়ে হয় না।'

'বিপদে ফেলার জন্যে সরল মেয়েদের মত ভাল টার্গেট আর কিছু হয় না।' রানার কথাও শেষ হলো, সেই সাথে শুরু হলো বাজনা। কোথায় যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে কিটি। গভীর মনোযোগের সাথে কান পাতল রানা। করুণ একটা সুর তুলেছে কিটি, বুকের ভেতরটা কি এক অজানা দুঃখে ছটফট করে উঠল রানার।

অনেক, অনেকক্ষণ পর আবার যখন লিলির দিকে খেয়াল দিল রানা, দেখল, নিঃশব্দে কাঁদছে সে। রানাকে তাকাতে দেখে ভাঙা গলায় বলল, 'আসলে আমি…রানা, আমি বলতে চাই…যা ঘটেছে সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমি…আমি…'

'বুঝলাম, তুমি দুঃখিত,' বলল রানা। 'কিন্তু জানতে পারি কার জন্যে? কিটির জন্যে নাকি তোমার নিজের জন্যে? আমার জন্যে দুঃখিত, এ-কথা বোলো না, হাসি সামলাতে পারব না।'

কথাগুলো শক্ত হয়ে গেল, কিন্তু হজম করতে লিলির অসুবিধে হলো বলে মনে হলো না রানার। এরপরও মুখ তুলে সরাসরি ওর দিকে সে তাকাল দেখে মনে মনে মেয়েটার সাহসের প্রশংসা না করে পারল না ও।

'তোমার যা খুশি বলতে পারো,' বলল লিলি। 'এসব আমার প্রাপ্য কিন্তু যদি মনে করো তোমার ওপর অন্যায় করেছি বলে পা ধরে মাফ চাইব, ভুল করবে। জীবনে অনেকের কাছে অনেক কারণে মাফ চেয়েছি, নিজেকে ছোট করেছি, কিন্তু আর নয়।' উঠে দাঁড়াল সে। 'শুনলাম জালুচিও নাকি তোমাদের সাথে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'নজর রেখো ওর ওপর। যতটা ভাবছ ব্যাপারটা তারচেয়ে অনেক বেশি জটিল।'

কথাটা শুনে একটুও অবাক হলো না রানা। কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে জানতে চাইল, 'হঠাৎ এ-কথা বলার মানে?'

চেহারায় উদ্বেগ আর অনিশ্চয়তার একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল লিলি। অভিনয়ে কোন খুঁত [illegible] মনে মনে ভাবল রানা। লিলি বলল, 'ঠিক জানি না। সত্যি বলছি। তবে বুঝ[illegible], এর মধ্যে সাংঘাতিক কিছু একটা আছে। তুমি যাতে সতর্ক

থাকো সেজন্যেই কথাটা জানিয়ে রাখলাম।'

'বেশ, জানলাম। আর কিছু জানাবার আছে? মানে, আর কিছু জানাতে বলা হয়েছে তোমাকে?'

আবার রেগে উঠল লিলি। চেহারাটা লাল হয়ে উঠল, চোখ দুটো যেন দু'টুকরো কাঠ-কয়লার আগুন, এর আগে লিলির এই মূর্তি দেখেনি রানা। ছোঁ দিয়ে টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে গিয়েও দিল না, বিদ্যুৎগতিতে ছুঁড়ে মারল সেটা পাঁচিলের দিকে। পাঁচিলের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল গ্লাস। 'ইউ বাস্টার্ড!' বলে চরকির মত ঘুরল আধপাক, হন হন করে হেঁটে চলে গেল।

এই সময়ে সিঁড়ি বেয়ে টেরেসে উঠে এল সলোজা।

'জালুচির মুখে শুনলাম তুমি এখানে আছ,' বলল সলোজা। 'হেই, রানা, ওঠার সময় সিঁড়িতে একটা মেয়েকে দেখলাম, ঝড়ের মত পাশ ঘেঁষে চলে গেল। রাগে ফোঁস ফোঁস করছে। ব্যাপারটা কি বলো তো? জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে? বলল কি জানো? বলল, গো টু হেল! ইয়ং জেনারেশনের হলোটা কি বলো তো?'

'তোমার সমান বয়স হলে ধরতে পারব দোষটা,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'এখন পর্যন্ত আমিও ওদের একজন।'

'আহা চটো কেন!' সকৌতুকে বলল সলোজা। 'আমি যখন ইয়ং জেনারেশনকে গালাগাল করি, তোমাকে বাদ দিয়েই করি। কারণ, তুমি আমার হিরো। তাছাড়া, মনের দিক থেকে আমিও কি ওদের একজন নই?'

উঠে বেডরুমে চলে এল রানা, পোশাক পরতে শুরু করল। দরজার কবাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সলোজা। 'আমাদেরকে নিয়ে লাঞ্চে বসতে চায় মারানজানা। তারপর ভিরোমাকে দেখতে যাবে।'

'অপেক্ষা করুক ও। আমার মাথায় আরও জরুরী কাজের চিন্তা রয়েছে। জালুচি আমাদের সাথে যাবে, এই কথাটা বনেটি আর ওটেলিয়োকে এখনই জানানো দরকার। পরে আর সময় পাব কিনা জানি না। ভিরোমায় আরও কিছু কাজ আছে আমার।' পোশাক পরা শেষ করল ও। 'চলো।'

'কিন্তু চলো বললেই হলো? যাবে কিভাবে? ওরা বাধা দেবে না?'

মৃদু হাসল রানা। 'দিনে দিনে ছেলেমানুষ হচ্ছ নাকি, সলোজা? আমার ওপর আস্থা রাখতে শেখো। অন্তর দিয়ে চাইলে সব করা যায়। এসো।'

টেরেসে বেরিয়ে এল রানা, ওকে অনুসরণ করল সলোজা। বাগানের ভেতর দিয়ে পিছন দিকে চলে এল ওরা। হাই টেরেসটাকে এড়িয়ে গেল, ওখানে বসে আছে মারানজানা। উঠানে ল্যান্ডরোভারটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। গেটটাও খোলা। কেউ নেই আশপাশে। প্যাসেঞ্জার সীটে বসল সলোজা। তার পাশে ড্রাইভিং সীটে রানা। গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি এই সময় সাঁৎ করে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল গাটো। হেঁড়ে গলায় চিৎকার জুড়ে দিল সে। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে ওরা।

মেঠো পথ ধরে তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে এল রানা, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করে থামল পাথরের তৈরি জেটির সামনে। পাশেই নোঙর করা ভিরোমা। বনেটি আর ওটেলিয়ো স্টার্নে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। রেলিঙে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

আটানা।

লাফ দিয়ে ডেকে নামল রানা। কাঁধ থেকে স্টার্লিং সাব-মেশিনগান নামিয়ে এগিয়ে এল আটানা। 'ব্যাপারটা কি?' ল্যান্ডরোভারের দিকে তাকাল একবার। 'সিনর জালুচি কোথায়?'

'আসছে,' বলল রানা।

'আসছে মানে?' থমকে দাঁড়াল আটানা। 'আপনাদেরকে একা পাঠিয়ে দিলেন?'

এমন ভঙ্গি করল রানা, যেন আটানাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে দিক বদলে ধাক্কা দিল তাকে। সেই সাথে তার শার্টের কলার মুঠো করে ধরল, কোমর বাঁকা করে উরু ঘোরাল, সেটার ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে রেলিঙের ওপর পড়ল আটানা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এক মুহূর্ত ঝুলে রইল সে, তারপর সাব-মেশিনগান ইত্যাদি সহ ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে গেল।

দ্রুত বনেটি আর ওটেলিয়োর সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

দু'জন একসাথে জানতে চাইল, 'মি. রানা, কি ব্যাপার?'

'সময় নেই, রানা,' পিছন থেকে বলল সলোজা। 'জালুচি আসছে।'

কাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল রানা। মেঠো পথের দূর প্রান্তে দেখা গেল মার্সিডিজটাকে। 'কিছু না,' বনেটি আর ওটেলিয়োর দিকে ফিরে বলল ও, 'একটা জরুরী কথা বলতে এলাম। প্ল্যানটা একটু বদলানো হয়েছে। দলের সাথে জালুচিও যাচ্ছে, আমাদের ওপর নজর রাখার জন্যে। কাজেই সাবধান! গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে তোমাদেরকে যতটুকু বলেছি তার বেশি আমিও কিছু জানি না, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এর ভেতর আরও অনেক গভীর কিছু আছে। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে হবে ওর ওপর। ওকে দেখে যতটা মনে হয় তারচেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান আর নিষ্ঠুর ও।'

চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে ওটেলিয়ো বলল, 'ওকে আমি একাই সামলাতে পারব।'

'ঠিক এই কথাই বলেছিল বিলি দি কিড সম্পর্কে একুশ জন লোক,' বলল রানা। 'মনে করে দেখো, তাদের পরিণতি কি হয়েছিল।' বলে আর দাঁড়াল না রানা, ছুটে ঢুকে পড়ল হুইলহাউসে।

সাঁতার কেটে সৈকতে উঠল আটানা। মার্সিডিজ থেকে নেমে তাকে ধরে বসিয়ে দিল জালুচি। তার পিছনে দাঁড়িয়ে বোটের দিকে তাকিয়ে আছে সোয়েটার পরা বোরো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে জেটিতে উঠে এল জালুচি, তাকে অনুসরণ করল বাকি দু'জন। জেটির শেষ মাথায় এসে থামল জালুচি, চেহারায় কৌতুক নিয়ে তাকাল রানার দিকে, হুইলহাউস থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে ও।

'ব্যাপারটা কি, রানা?'

'ওর সাথে ধাক্কা খেয়েছি,' বলল রানা। 'নির্ভেজাল অ্যাক্সিডেন্ট।'

'সন্দেহ নেই। গোপন কথাটা নিজের লোকদের বলা শেষ হয়েছে তোমার? শেষ না হয়ে থাকলে আরও দু'মিনিট সময় নাও। তারপর চলো, মি. মারানজানা

তোমাদের সবার জন্যে লাঞ্চ সামনে নিয়ে অপেক্ষা করছেন।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, এই সময় সাব-মেশিনগান বাগিয়ে ধরে লাফ দিয়ে রেলিং টপকাতে চেষ্টা করল আটানা। কিন্তু ঠিক সময় মত একটা পা বাড়িয়ে দিল জালুচি, ল্যাং খেয়ে জেটির ওপরই আছাড় খেল আটানা। কিন্তু সাথে সাথে উঠে বসার চেষ্টা করল সে। দু'পা এগিয়ে তার কনুইয়ের ওপর জুতো দিয়ে চেপে ধরল জালুচি। 'কোন রকম বাড়াবাড়ি নয়, বুঝতে পেরেছ?'

জালুচির দিকে মুখ তুলল আটানা, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, কিন্তু পরমুহূর্তে আহত কুকুরের মত নিস্তেজ হয়ে গেল সে।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'আর কবে যে ওর শিক্ষা হবে!'

'ও কথা বোলো না,' বলল জালুচি। 'এমন লোক তুমি বিস্তর পাবে, যাদের সারাজীবনেও শিক্ষা হয় না। আমার কথা অস্বীকার করতে পারো?' নির্মল হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। 'এসো, রানা। মার্সিডিজে তুমি আমার পাশে বসবে। বাকি সবাই ল্যান্ডরোভারে চড়ে যাবে।'

রাজকীয় আয়োজন সামনে নিয়ে লাঞ্চে বসল ওরা। প্রচুর ওয়াইন পান করল মারানজানা, খাবারও ওদের চেয়ে বেশি খেল সে, এবং সেই সাথে অনর্গল কথা বলে গেল।

লাঞ্চ প্রায় শেষ হয়ে এল, অথচ কাছে পিঠে একবারের জন্যেও দেখা গেল না লিলিকে। বোধহয় কিটির সাথে আছে। এত কথা বলল মারানজানা, তার পোষ্যদের অনেককে নিয়ে হালকা দু'একটা রসিকতাও করল, কিন্তু লিলির নামটা পর্যন্ত একবার মুখে আনল না সে।

লাঞ্চ শেষ হয়ে যাবার পর মারানজানা জানাল, বোট দেখতে যাবে। জালুচির সাহায্যে মার্সিডিজ পর্যন্ত এল সে। বাকি সবাই ল্যান্ডরোভারে চড়ল।

জেটির কাছে পৌঁছে মার্সিডিজ থেকে নামানো হলো মারানজানাকে। জেটির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বোটের খবরাখবর নিল সে। সলোজার সাথে তাকে ঝাড়া আধঘণ্টা কথা বলতে দেখে বোঝা গেল, বোটের টেকনিক্যাল ডিটেলস তার নখদর্পণে।

জালুচি মারানজানাকে সাথে করে নিয়ে চলে যাবার পর ইকুইপমেন্ট চেক করার কাজে হাত দিল রানা। প্রথমে হাতে তালিকা নিয়ে জিনিসগুলোর নাম পড়ে গেল সলোজা, সেগুলো মেলাল বনেটি। তারপর ওটেলিয়োর সাহায্য নিয়ে আবার সব চেক করল রানা।

সলোজাকে নিয়ে হুইলহাউসে ফিরে এল রানা। চার্ট নিয়ে বসল ওরা। ওদিকে বনেটি আর ওটেলিয়ো ডেক থেকে চারটে পঞ্চাশ গ্যালনের ড্রাম বয়ে নিয়ে গিয়ে ট্যাংকগুলো ভরল।

'কেমন মনে হচ্ছে, সলোজা?' জানতে চাইল রানা।

'কোন অশুভ লক্ষণ তো দেখছি না! রেডিওর ওয়েদার রিপোর্ট পেয়েছি। থ্রী টু ফোর উইন্ড। বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। শেষ রাতের দিকে তুমুল হতে পারে।' একটু থেমে প্রসঙ্গ বদল করল সলোজা। 'শালা বুড়বাক জালুচিকে এড়িয়ে যেতে পারলে

রাতে একটু ঘুমাতে পারতাম!'

বাইরে থেকে বনেটির গলা ভেসে এল, 'কেউ আসছে।'

মেঠো পথ ধরে ছুটে এল ল্যান্ডরোভার, থামল জেটির পাশে। দরজা খুলে নামল লিলি। মাথার স্ট্র হ্যাট। চোখে গাঢ় রঙের চশমা। পরনে বিকিনি। কাঁধে একটা বড়সড় বীচ ব্যাগ। ডেকের দিকে একবার তাকাল সে, তারপর জেটির পাশ দিয়ে পানির কিনারার দিকে এগোল।

এরপর ল্যান্ডরোভার থেকে নামল জালুচি। জেটির ওপর দিয়ে হেঁটে এসে শেষ প্রান্তে দাঁড়াল সে। 'হেই, রানা, আমাদের রওনা হতে দেরি আছে নাকি?'

'না।'

'কিন্তু সিনর মারানজানা যে তোমাদের সবার সাথে শেষ একবার দেখা করতে চান?'

তীর থেকে ডাইভ দিয়ে সাগরে পড়ল লিলি। তার সাঁতার কাটার দক্ষ ভঙ্গিটা মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা। তর্ক করা বৃথা, কাজেই সবার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে রেলিং টপকাল রানা, সবাইকে পিছনে নিয়ে ল্যান্ডরোভারের দিকে এগোল।

হাই টেরেসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল সালভাদর মারানজানা। ওদেরকে দেখে সহাস্যে অভ্যর্থনা জানাল সে, কিন্তু কেউ তেমন কোন সাড়া না দিয়ে চুপচাপ একটা করে চেয়ার টেনে বসল। প্রত্যেককে যার যার রুচি মত ড্রিঙ্ক পরিবেশন করল ওয়েটার।

নিজের হাতের গ্লাসটা একটু ওপরে তুলে বলল মারানজানা, 'এ টোস্ট, জেন্টলমেন। ফেয়ার উইন্ড অ্যান্ড গুড ফরচুন।'

গোটা ব্যাপারটাই প্রতি মুহূর্তে হাস্যকর প্রহসন হয়ে উঠছে।

টোস্টের পর একটু রূঢ় কণ্ঠে বলল রানা, 'এবার আমরা উঠি। রওনা হওয়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

'মি. রানা!' চেহারায় আহত একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে বলল মারানজানা। 'আমার কাজে যাচ্ছ তুমি, স্যার। সেজন্যে তোমার প্রতি আমি ভারি কৃতজ্ঞ। কিন্তু রওনা হবার আগে আরও এক গ্লাস করে হয়ে যাক। এটা আমার অনুরোধ। তারপর তোমার সাথে একটা কথা হবে আমার, কানে কানে।'

আরেক গ্লাস খালি করে ছড়ি জোড়ার ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল মারানজানা। 'কথাটা তেমন গোপনীয় কিছু নয়। ইচ্ছে করলে তোমার বন্ধুরাও আমাদের সাথে আসতে পারেন। তোমাকে যা বলব, ওদেরও সেটা ইন্টারেস্টিং বলে মনে হতে পারে।'

প্যারাপেটের দিকে এগোল মারানজানা। আরেক গ্লাস ওয়াইন হাতে নিয়ে তার পিছু পিছু চলল জালুচি। তার পিছনে সলোজা আর রানা। জালুচির হাত থেকে ওয়াইনের গ্লাসটা নিল মারানজানা, ছোট্ট একটা চুমুক দিল, তারপর দুর্গ প্রাচীর থেকে ঝুঁকল নিচের দিকে। একমুহূর্ত পরই সিধে হলো সে। একে একে তাকাল সবার দিকে। কেউ নড়ছে না বা কথা বলছে না।

'লম্বা একটা ড্রপ, স্যার!' রানার চোখে চোখ রেখে বলল সে। 'কেউ পড়লে বা কাউকে ফেলে দিলে তার আর বাঁচার কোন আশা নেই!'

কেউ কোন কথা বলল না।

আবার নিজের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল মারানজানা। 'মি. রানা, অনুমতি দিলে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

একচুল নড়ল না রানা।

অনুমতি আশা করা বৃথা বুঝতে পেরে আবার মুখ খুলল মারানজানা। 'গ্রীক মিথলজি সম্পর্কে জানা আছে তো, মি. রানা?'

'গেট টু দ্য পয়েন্ট!' চাপা গলায় বলল রানা।

'এই মুহূর্তে থিসিউসের কিংবদন্তীর কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে, মি. রানা।' গ্লাসে ছোট ছোট আরও দুটো চুমুক দিয়ে সেটা জালুচির হাতে ধরিয়ে দিল সে, কোটের পকেট থেকে বাক্স বের করে একটা সিগার ধরাল। মাথাটা এক পাশে কাত করে আকাশের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল সে। ক্রিট থেকে যখন ফিরে এল সে, তার ক্রুরা কালো পাল তুলেছিল। কালো পাল তোলার অর্থ হলো, ব্যর্থ অভিযান। মজার ব্যাপার হলো, কাজটা করা হয়েছিল ভুল করে। কিন্তু তা তো আর জানার কথা নয় ইজিউস দা কিঙের! তিনি ওই কালো পাল তোলার অর্থ করলেন, তাঁর ছেলে মারা গেছে। এরপর কি হলো?' সপ্রশ্নদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মারানজানা।

রানা জানে, এরপর রাজা ইজিউস আত্মহত্যা করেন। কিন্তু চুপ করে থাকল ও।

'দুঃখে আত্মহত্যা করেন রাজা,' বলল মারানজানা। 'কাজেই, মি. রানা, ফেরার সময় তোমাকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি কোনরকম ভুল হয়, তার খেসারত তোমাকেই দিতে হবে। এবং কিটিকে।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিগার চিবাল মারানজানা, তারপর আবার বলল, 'তোমাদের ফেরার সময় হলে এখানে এই হাই টেরেসে অপেক্ষা করব আমি, মি. রানা। আমার সামনে থাকবে কিটি। যাকে তুমি স্নেহ করো, যার ভাল-মন্দের ব্যাপারে তুমি উদ্বেগবোধ করো। এখানে দাঁড়িয়ে আমি প্রথমে দেখতে চাইব তোমাদের বোটের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছেলে। যদি না দেখি,' কাঁধ ঝাঁকাল মারানজানা, 'তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, ইন এ ম্যানার অফ স্পিকিং, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।'

ইচ্ছে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটার টুঁটি চেপে ধরে, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে রাখল রানা। তিন সেকেন্ড পর নিজের অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল ও। 'তোমার ছেলেকে উদ্ধার করে আনার চেষ্টা করব আমি, মারানজানা। অন্তর দিয়ে চেষ্টা করলে কোন কাজে ব্যর্থ হই না আমি। তোমার ছেলেকেও ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে আসব। বিনিময়ে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে কিটিকে।'

'অবশ্যই! অবশ্যই!' তাড়াতাড়ি ঠোঁট থেকে সিগার নামিয়ে বলল মারানজানা।

'এর অন্যথা হলে?'

'মি. রানা!' আবার মারানজানার চেহারায় আহত ভাব ফুটে উঠল। 'তুমি

আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না!'

'এর অন্যথা হলে?' সেই একই সুর, চোখে একই ঠাণ্ডা দৃষ্টি, একই প্রশ্ন।

'আমি কথা দিয়ে কথা রাখি, মি. রানা!' নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল মারানজানা।

রানা সামনে বাড়তে শুরু করতেই ওর পথরোধ করে দাঁড়াল জালুচি। মারানজানা হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'বাঘের বাচ্চা! একেই বলে বাঘের বাচ্চা! আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট, স্যার। মি. রানা, আমি তোমাকে পরিপূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলছি, এর অন্যথা হলে, তোমার যা খুশি তাই করতে পারবে।'

'আমি তোমাকে খুন করব!' বলে চরকির মত আধপাক ঘুরল রানা, হন হন করে এগোল সিঁড়ির দিকে। সবাই অনুসরণ করল ওকে। ল্যান্ডরোভারে চড়ে বসল ওরা, বোরো ওদেরকে জেটির পাশে পৌঁছে দিল। কাছেপিঠে কোথাও দেখা গেল না লিলিকে। লিলির জন্যে সেটা ভালই হলো, কারণ এই মুহূর্তে প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে আছে রানা, সামনে পড়ে গেলে কি হত বলা যায় না। সবার আগে ল্যান্ডরোভার থেকে নেমে হন হন করে এগোল রানা। জেটি থেকে লাফ দিয়ে পড়ল বোটের ডেকে। পিছন থেকে ওর একটা হাত ধরে ফেলল সলোজা।

থরথর করে কেঁপে উঠল রানার সারা শরীর। 'আই শ্যাল কিল হিম! আই শ্যাল কিল দা বাস্টার্ড!' নিজের কানেই গলাটা কর্কশ শোনাল।

'অবশ্যই!' শান্ত গলায় বলল সলোজা। 'তার চেয়ে পুণ্য কাজ আর কি হতে পারে!' রানাকে একটা ইজিপশিয়ান চুরুট দিল সে। 'আমরা এবার রওনা হব। এসো, হুইল ধরো।'

সেটা মন্দ নয়, ভাবল রানা। অন্তত হাত দুটোকে কিছু একটা দিয়ে বুঝ দেয়া যাবে। হুইলহাউসে এসে স্টার্টার চেপে ধরল ও। সাথে সাথে গুঞ্জন তুলল ইঞ্জিন। নোঙর তুলল ওটেলিয়ো আর বনেটি। সেসনাকে পাশ কাটিয়ে বিরাট একটা বাঁক নিল রানা, তারপর বোটকে নিয়ে চলল খোলা সাগরের দিকে।

নয়

চারদিক অন্ধকার করে দিয়ে রাত নামছে। ফার্স্ট ওয়াচের দায়িত্বটা নিজে নিয়েছে রানা, প্রায় ঘণ্টাখানেক হলো ফিরে গেছে সবাই। হুইলহাউসে রানা একা। নেভিগেশন লাইট অন করে বোটের কোর্স চেক করল ও। তারপর অফ করে দিল আলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সাগরের দিকে তাকাল আবার। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ভাবল, যদি ব্যর্থ হয়, পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। কাজেই, ব্যর্থ হওয়া চলবে না।

একটা ছন্দ বজায় রেখে এদিক ওদিক দুলছে মাস্টহেড। সাগর থেকে ছলকে ওঠা পানির ছিটে ঝাপসা করে দিচ্ছে জানালার কাঁচ। দু'পয়েন্ট স্টারবোর্ডের দিকে পরিষ্কার দেখা গেল একটা স্টীমারের লাল আর সবুজ নেভিগেশন লাইট। চেহারাটা গম্ভীর হয়ে আছে রানার। মারানজানার ওপর ঘৃণায় সারা শরীর এখনও রী রী করছে

ওর। বোটকে অটোমেটিক পাইলটের ওপর ছেড়ে দিয়ে সুইভেল চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল ও।

বিস্বাদ লাগল সিগারেট। অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখল সেটা। তারপর চার্ট টেবিলের নিচে হাত গলিয়ে একটা স্প্রিং ক্যাচ রিলিজ করল। ঝুলে পড়ল একটা ফ্ল্যাপ, সেটার সাথে স্প্রিং ক্লিপের সাহায্যে আটকানো রয়েছে একটা স্টেচকিন মেশিন-পিস্তল।

ক্লিক করে মৃদু শব্দে রানার পিছনে খুলে গেল দরজা। ফ্ল্যাপটা দ্রুত হাতে বন্ধ করার চেষ্টা করল ও, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। পিছন থেকে নরম গলায় লিলি বলল, 'চমৎকার!'

'তুমি এখানে কেন?' জানতে চাইল রানা।

'তোমরা সবাই ডিলায় না যাওয়া পর্যন্ত সাঁতার কাটলাম আমি, তারপর বোটে উঠে লুকিয়ে পড়লাম ইঞ্জিনরুমে। বীচ ব্যাগে করে কাপড় চোপড় সব আগেই নিয়ে বেরিয়েছিলাম।'

'এসব কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর নেই,' বলল রানা।

'আমি বোটে কেন?' তিক্ত একটু হাসল লিলি। 'এই সহজ ব্যাপারটা ধরতে পারছ না? আমি এখানে, তার কারণ মারানজানাকে সহ্য করতে পারছি না। আমি এখানে, তার কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'এখন তাহলে কি করা উচিত আমার?' চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'প্রেম নিবেদন করছ, গলে যাব?'

এগিয়ে এল লিলি। আবার থামল। অন্ধকারেই থাকল তার শরীর, শুধু কমপাসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা।

'সেটা তোমার অভিরুচি,' বলল লিলি। 'আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে, তাই বললাম।' আরও দু'পা এগিয়ে রানার একেবারে কাছে চলে এল সে। রানার কাঁধে একটা হাত তুলে দিল। পিঠে তার নরম বুকের স্পর্শ অনুভব করল রানা। 'আমার ওপর নির্দেশ আছে, তোমার মন জয় করার জন্যে সম্ভাব্য সব করতে হবে আমাকে।'

লিলির কোমর জড়িয়ে ধরল রানা। 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে? মারানজানা?'

'হ্যাঁ।'

'জালুচি জানে?'

'অবশ্যই।'

'তার মানে, জালুচিকে সাহায্য করার জন্যে পাঠানো হয়েছে তোমাকে। আমি কি ভাবছি না ভাবছি তা জেনে নিয়ে জালুচিকে জানাতে হবে তোমার।' চার্ট টেবিলের নিচে হাত গলিয়ে ফ্ল্যাপটা আবার ফেলে দিল রানা। 'এটার কথা জানিয়ে দিয়ে শুরু করতে পারো তোমার কাজ।'

'তা পারি,' রানার ডান কানে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বলল লিলি। 'একটা ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। গভীর কোন উদ্দেশ্য আছে জালুচির। সেটা যে কি জানতে পারলে হত।'

'এসব কথা বলে তুমি কি আমার মন জয় করতে চাইছ? তোমাকে বিশ্বাস

করার কোন কারণ আছে কি? একবার ঠকেছি, মনে আছে?'

'ভুলিনি,' বলল লিলি। 'কিন্তু আমি বলব, আরও একবার আমাকে তুমি বিশ্বাস করে দেখো। আমি তোমার উপকার করতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু অপকার যে করব না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। মনে রেখো, তোমার বা আমার সম্পর্কে কথা বলছি না আমরা,এটা কিটির প্রসঙ্গ, তার জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার।' মৃদু গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে। 'তুমি বিশ্বাস করো বা না করো, তাতে কিছু এসে যায় না কিন্তু এর সাথে যে কিটিকেও জড়ানো হবে তা আমি প্রথম জানতে পারি জালুচি তাকে পালার্মো থেকে এখানে নিয়ে আসার পর।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'ধরে নাও, তুমি আমার মন জয় করতে শুরু করেছ। দেখা যাক কি ঘটে।' চার্ট টেবিলের নিচের ফ্ল্যাপটা বন্ধ করে দিল ও। তারপর হাত উঁচু করে বাঙ্কহেডের ওপর থেকে আরও একটা ফ্ল্যাপ ফেলল। এটাতে ক্লিপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা ইসরায়েলি উজি সাব-মেশিনগান।

'ওটা নয়, এটার কথা বলবে জালুচিকে। খুব কাজের মেয়ে ভাবছে তোমাকে।'

'ঠিক আছে।'

রানার গা ঘেঁষে থাকল লিলি। ওর দুই হাঁটুর মাঝখানে আটকে আছে তার ডান পা। ইন্টারকমের সুইচ অন করে বেলের বোতাম টিপল রানা।

সলোজার গলা পাওয়া গেল। 'ইয়েস, ক্যাপটেন?'

'জালুচিকে চাই এখানে। তুমিও আসতে পারো। এখানে আমি একটা বোঝা আবিষ্কার করেছি।'

দু'মিনিটের মাথায় হুইলহাউসে পৌঁছুল ওরা। জালুচিকে পিছনে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সলোজা। লিলিকে দেখেই থমকে দাঁড়াল সলোজা। 'সর্বনাশ!'

সলোজাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল জালুচি। 'ব্যাপারটা কি!'

'দেখেও বুঝতে পারছ না?' একটু গর্বের সাথে বলল রানা, 'লিলি দল বদল করেছে।'

চমৎকার অভিনয় করল জালুচি। কথাটা শোনার সাথে সাথে টকটকে লাল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'কুত্তী! সিনর মারানজানা তোমাকে জ্যান্ত পুঁতবে!' কথা শেষ করেই, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে লিলিকে ধরতে গেল সে, কিন্তু রানা তার বুকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বাধা দিল।

'খবরদার!' রুখে দাঁড়াল রানা। 'কেউ ওর গায়ে হাত তুলতে এলে আমি তার হাত ভেঙে দেব। এখন থেকে বনেটি আর ওটেলিয়োর মত লিলিও আমার হেলপার। ওকে অপমান করা হলে আমি বোট নিয়ে ভিলায় ফিরে যাব। লিলির ব্যাপারে আলোচনা যা হবার তা মারানজানার সাথে হবে আমার। তুমি নাক গলাবার কেউ নও।'

'নিজের পায়ে কুড়ুল মারছ, রানা!' ব্যঙ্গের সুরে বলল জালুচি। 'যদি ভেবে থাকো ওই কুত্তী তোমার কোন উপকারে লাগবে, মস্ত ভুল করবে তুমি। রূপ দেখেই মজে গেলে? আশ্চর্য! কত হাত ঘুরে তারপর এখানে পৌঁচেছে, সে খবর রাখো? প্যারিসে যে বাড়িটায় থাকত ও, সেখানে রাতের বেলায় কি ঘটত, বলেছে

তোমাকে? খদ্দেরদের পকেট কাটত ওরা! আরও কত কি! শুনতে চাইলে বলো...'

জালুচিকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল লিলি, কিন্তু দু'জনের মাঝখানে চলে এসে বাধা দিল সলোজা। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করল জালুচি, হো হো করে হাসছে সে। লিলি যাতে পিছন থেকে তাকে ধাওয়া না করতে পারে সেজন্যে দরজার কবাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সলোজা।

ঝট্ করে ঘুরল লিলি, রাগে লাল হয়ে উঠেছে চেহারা।

হাসিমুখে বলল রানা, 'ঠিক বুঝলাম না কে ভাল অভিনয় করল! তুমি, না কি জালুচি?'

বিদ্যুৎগতিতে একটা হাত তুলল লিলি, কিন্তু চড়টা পৌঁছবার আগেই হাতটা ধরে ফেলল রানা। 'আর কি ভাবে বিশ্বাস করাব তোমাকে?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লিলি। 'ডান হাতটা কেটে ফেলব?' এই প্রথম লিলির গলায় স্বরে নৈরাশ্যের সুর বাজল।

'ঠিক আছে,' লিলির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল রানা, 'বিশ্বাস করেছি মনে করলে যদি খুশি হও, মনে করো তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছি। সলোজা, নিচে পৌঁছে দিয়ে এসো লিলিকে। বনেটি আর ওটেলিয়োকে জানাও সব।'

দরজার দিকে এগোল লিলি, পিছন থেকে বলল রানা, 'সাব-মেশিন গানের কথাটা বলো ওকে। লক্ষ করে দেখো, কি রিয়্যাকশন হয়।'

হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল ওরা। সুইভেল চেয়ারে বসে চিন্তায় ডুবে গেল রানা। লিলিকে একটা সমস্যা বলে মনে হলো ওর, যার কোন সমাধান এই মুহূর্তে জানা নেই ওর। অটোমেটিক স্টিয়ারিঙের লক খুলে পোর্ট সাইডের দিকে এক পয়েন্ট কোর্স বদল করল ও। হাত দুটো হুইলের ওপরই থাকল। অন্ধকার সাগরের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে রইল অনড়।

দু'ঘণ্টা পর এক মগ কফি নিয়ে ভেতরে ঢুকল সলোজা। 'এবার খানিক বিশ্রাম নাও তুমি, রানা।'

কিছু না বলে মাথাটা শুধু একটু কাত করল রানা। কোর্স জানিয়ে হুইল ছেড়ে দিল ও।

'আসলে কি ঘটল তখন ব্যাপারটা?' জানতে চাইল সলোজা।

'ঠিক বুঝিনি। শুধু এইটুকু জানি, সব কথা আমাদেরকে জানায়নি মারানজানা। এর মধ্যে গোপন কিছু একটা আছে, সেজন্যেই আমাদের সাথে জালুচিকে পাঠানো হয়েছে।'

'মেয়েটার ব্যাপারটা কি?'

যা যা ঘটেছে সব বলল রানা। উজি সাব-মেশিনগানের কথাটাও জানাল।

'হুঁ,' গম্ভীর দেখাল সলোজাকে। 'লিলি ওটার কথা জালুচিকে বললে জালুচি মনে করবে লিলি চমৎকার ভাবে তার দায়িত্ব পালন করছে?'

'তাই তো মনে হয়।'

'লিলিকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

'জানি না,' বলল রানা। 'মনে রেখো স্টেচকিনের কথাটা জানে সে।'

'উজির কথা বলল, কিন্তু স্টেচকিনের কথা বলল না, তাতেই কি ধরে নেব লিলি আমাদের দলে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সলোজা। 'বুঝবে কিভাবে? ওগুলো সরিয়ে নিয়ে যাবে, এত বোকা জালুচি নয়। অন্তত খেলার এই প্রথম পর্যায়ে তো নয়ই।'

'হ্যাঁ। কাজেই অপেক্ষা করে দেখা ছাড়া করার কিছুই নেই আমাদের।' দরজার দিকে এগোল রানা। 'একটু ঘুমাব। তিন ঘণ্টার মধ্যে তুলে দিয়ো আমাকে।' দরজা খুলে ডেকে বেরিয়ে এল ও। বৃষ্টির মধ্যে মাথা নিচু করে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

আফটার কেবিনে ঘুমাল রানা। ঘুম ভাঙল ভোর তিনটের দিকে। উল্টোদিকের বাঙ্কে গায়ে চাদর দিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে লিলি, চেহারায় কোন উদ্বেগ বা অশান্তির ছায়া নেই।

বনেটি আর ওটেলিয়ো ফরওয়ার্ড কেবিনে আছে, জানে রানা। সেলুনে পৌঁছে দেখল, একটা বেঞ্চ সীটে শুয়ে আছে জালুচি। দেখে মনে হলো ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না ও। কিছু এসে যায় না তাতে। সেলুন থেকে বেরিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে এগোল ও।

ডেক ধরে এগোবার সময় চোখেমুখে পানির ছিটে লাগল। সাগর এখন আর শান্ত নয়, ফুঁসছে। দরজা খুলে হুইলহাউসে ঢুকল ও। দু'সারি দাঁতের মাঝখানে চুরুট নিয়ে হুইলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সলোজা। তামাকের উৎকট গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। রানার নাকটা কুঁচকে উঠতে দেখে একটু হাসল সলোজা।

বলল, 'বলে সময় নষ্ট কোরো না। কিভাবে যে গন্ধটা সহ্য করি তা আমি নিজেও জানি না।'

'অভ্যেস,' বলল রানা। 'সাগরের কি অবস্থা?'

'চমৎকার! কোর্স ঠিক আছে স্পীডও ভাল।' একটু থেমে বলল, 'আধ ঘণ্টা হলো বেয়াড়া হয়ে উঠেছে ঢেউগুলো, তবে তেমন কিছু নয়। ওয়েদার রিপোর্ট পাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু একটা শব্দও পরিষ্কার রিসিভ করতে পারছি না। ওদিকে কোথাও ইলেকট্রিক স্টর্ম শুরু হয়েছে।'

দিগন্তরেখার কাছে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। সলোজাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে হুইল ধরল রানা। 'তিন কি চার ঘণ্টা পর আবার একটু বিশ্রাম নেব আমি।'

'আমি ঠিক সময়ে আসব,' বলে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল সলোজা।

মুঠোর ভেতর জ্যান্ত হয়ে উঠেছে হুইলটা। বাইরে তুমুল বাতাস, নেভিগেশন আলোর ভেতর উড়িয়ে নিয়ে আসছে বৃষ্টির ছাঁট। একটা সিগারেট ধরাল রানা। নিঃসঙ্গ, একা লাগছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লিলি, হাতে একটা ট্রে। কফি, সেই সাথে ভাজা মাংসের গন্ধ পেল রানা। চার্ট টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রেখে একটা টুল টেনে বসল তাতে লিলি। স্যান্ডউইচে কামড় বসিয়ে বলল রানা, 'শুনলাম জালুচির কানে কানে কথা বলতে দেখা গেছে তোমাকে।'

'ভুল শোনোনি।'

'উজির কথা বলেছ ওকে?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'বলেছি, জানালা দিয়ে তোমাকে ওটা চেক করতে দেখেছি।'

'কি বলল?'

'তেমন কিছু না,' কাঁধ ঝাঁকাল লিলি। 'বলল, ব্যাপারটা সে-ই সামলাবে, আমি যেন চোখ-কান খোলা রাখি। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লেই জানাতে হবে ওকে।'

স্টারবোর্ডের দিকে, দিগন্তরেখার কাছে একটা আলো দেখা গেল।

'কি ওটা?'

'ক্রিটের লাইট হাউজ।'

স্যাভউইচগুলো সাবাড় করল রানা। খানিক ইতস্তত করে লিলি বলল, 'কিছু যদি মনে না করো, তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'করো।'

'নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছ তুমি আমাকে,' বলল লিলি, 'কিন্তু ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারি, তোমার সম্পর্কে আসলে আমি কিছুই জানি না। এই রকম মনে হয় কেন?'

'তুমি কি বলতে চাইছ নিজের সম্পর্কে তোমাকে আমি মিথ্যে কথা বলেছি?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'কি জানি! হতে পারে তোমাকে আমি বুঝতে পারিনি। সেজন্যেই হয়তো এই রকম মনে হচ্ছে।'

'এইটুকু বলতে পারি, তোমার সাথে কোন অন্যায় আচরণ করিনি আমি,' বলল রানা। 'দু'একটা মিথ্যে যদি বলেও থাকি, তোমার ভালর জন্যে, তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই বলেছি। অনেক ইনফরমেশন গোপন করে গেছি তোমাকে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার অনুভূতি, ফিলিংস, এসব জানাতে গিয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিইনি আমি কখনও।'

'তুমি বিয়ে করেছ?' হঠাৎ মৃদু গলায় জানতে চাইল লিলি।

'চিরকুমার থাকব।'

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল লিলি। 'এখনও আমার সাথে এই রকম কঠিন ব্যবহার করবে তুমি?'

'কঠিন ব্যবহার?'

'কিছু আশা করে প্রশ্নটা করিনি তোমাকে,' বলল লিলি। 'চিরকুমার থাকবে বলে আমাকে তুমি নিরাশ করতে চাইলে নাকি?'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ,' বলল রানা। 'তবে একটু যে নিরাশ করতে চাইনি, তাও নয়। এই রকম নিরাশ সব মেয়েকেই আমি করে থাকি। তা না হলে, মেয়েরা পরে দুঃখ পায়।'

হুইলহাউস থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল লিলি। ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ পেল না রানা, কারণ লিলি চলে যাবার পরপরই তুমুল ঝড়

উঠল। ঢেউয়ের ধাক্কায় বোট উল্টে পড়তে চায়।

চার্ট পরীক্ষা করল রানা। কোর্স বদল করল দু'পয়েন্ট। সেই সাথে বাড়িয়ে দিল স্পীড। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সলোজা। বুলেটের মত বৃষ্টির ফোঁটা ঢুকে পড়ল হুইলহাউসের ভেতর। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল সলোজা। হলুদ একটা অয়েলস্কিন পরেছে সে।

'ঝড়?'

'খুব বাড়াবাড়ি করবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা।

পরবর্তী আধঘণ্টা দু'জনেই হুইলহাউসে থাকল ওরা। ঝড়ের গতি ধীরে ধীরে কমে এল। সলোজাকে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে নিচে নেমে গেল রানা।

পরের দিন একেবারে শান্ত থাকল সাগর। ভোরের দিকে একটু বেড়েছিল বাতাসের গতিবেগ, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর আবার সেটা মন্থর হয়ে পড়েছে। নতুন কিছু ঘটেনি। সলোজার কাঁধে হুইলের দায়িত্ব দিয়ে নিচে নেমে গেল রানা।

সেলুনে ঘুমাচ্ছে জালুচি। কিংবা ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। কিন্তু লিলিকে কোথাও দেখা গেল না। আফটার কেবিনে চলে এল রানা। লিলি বোধহয় গ্যালিতে আছে, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে বাঙ্কের ওপর শুয়ে পড়ল ও। ঘুম দরকার। কিন্তু চোখ বুজেছে দু'মিনিটও হয়নি, অন্তত রানার তাই মনে হলো, হঠাৎ মৃদু নাড়া খেয়ে ভেঙে গেল ঘুমটা। চোখ মেলে দেখল, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিলি।

'কি ব্যাপার, লিলি?' বাঙ্কের ওপর উঠে বসল রানা। 'ক'টা বাজে?'

'একটানা চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছ। বারোটা।'

'সলোজা···'

'তিনিই তো পাঠালেন আমাকে।'

তাড়াহুড়ো করে মুখ-হাত ধুয়ে লিলির পিছু পিছু সেলুনে চলে এল রানা। সামনে সেদ্ধ ডিম, স্যান্ডউইচ, আর মাখন লাগানো রুটি নিয়ে বসেছে সলোজা। রানাকে দেখে চোখে মুখে প্রশংসার ভাব ফুটিয়ে তুলল সে। 'বুঝলে, রানা, এই মেয়ের স্যান্ডউইচ আর কফির হাত দারুণ!' লিলিকে এক হাত দিয়ে নিজের পাশে টেনে নিল সে। রানার দিকে তাকিয়ে বলল লিলি, 'দেখলে তো, অন্তত একজন আমাকে ভালবাসে!'

'প্রেম করার পর সময় পেলে আমাকেও কিছু মুখে দেবার জন্যে এনে দিয়ো।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল লিলি।

'হুইলে কে?' জানতে চাইল রানা।

'জালুচি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'কেন, বনেটি আর ওটেলিয়ো কি করছে?'

'নিজের চোখেই দেখে এসো।'

ফরওয়ার্ড কেবিনের দরজা খুলে ভেতরে তাকাল রানা। গন্ধেই বুঝল কি ঘটেছে। একটা বাঙ্কের ওপর বসে আছে বনেটি, দুই উরুর মাঝখানে একটা বালতি, তাতে বমি করছে। ওটেলিয়ো ডেকের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে, গোঙাচ্ছে সে। দরজা বন্ধ করে বলল রানা, 'খারাপ।'

'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ওদের কান ছিঁড়ে নেব।'

হঠাৎ সিদ্ধান্ত বদল করল রানা। বলল, 'আমি ওপরে যাচ্ছি। লিলিকে ওখানেই পাঠিয়ে দিয়ো।'

ডেকে উঠতে বেশ একটু সময় লাগল রানার। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে বোট, স্থির ভাবে কোথাও পা ফেলা কঠিন। পানির ছিটে লেগে ভিজে গেল রানা। হুইলহাউসে ঢুকে দেখল হুইল ধরে দাঁড়িয়ে আছে জালুচি।

'এসো,' বলল সে। 'মুখে দেবার মত কিছু তৈরি হয়েছে ওখানে?'

'হয়েছে,' জালুচির কাছ থেকে হুইল নিয়ে বলল রানা। 'কেমন বুঝছ?'

'খারাপ কিছু নয়। এইমাত্র রেডিওর ওয়েদার রিপোর্ট চেক করেছি। উইন্ড ফোর্স সেভেন। বড় বড় ঢেউ। বৃষ্টি। বনেটি আর ওটেলিয়োর খবর কি?'

'পড়ে আছে।'

নিঃশব্দে হাসল জালুচি। 'গেলাম,' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর হুইলহাউসে ঢুকল সলোজা। 'যাও, কফি খেয়ে এসো।'

দরজা খুলে বেরিয়ে যাবে রানা, এই সময় উজি সাব-মেশিনগানের কথা মনে পড়ে গেল ওর। হুইলহাউসে অনেকক্ষণ একা ছিল জালুচি।

ফ্ল্যাপ ফেলে দিল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সলোজা।

'এখনও রয়েছে! লিলি কি বলেনি ওকে?'

'বলল তো বলেছে।'

উজিটা হাতে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করল রানা। দেখে মনে হলো, সব ঠিকই আছে। অ্যামুনিশন ক্লিপটা খুলল ও। চেক করে রেখে দিল আবার আগের জায়গায়। সাব-মেশিনগানটা রেখে দিতে যাচ্ছে ও, এই সময় কথাটা মনে পড়ল ওর। ফায়ারিং পিনটা ঠিক আছে কিনা দেখা দরকার।

আছে। কিন্তু ফাইল দিয়ে ঘষে ভোঁতা করে দিয়ে গেছে জালুচি।

সেটা সলোজাকে দেখাল রানা।

'বুড়বাক!' জালুচিকে গাল দিল সলোজা। চার্ট টেবিলের ফ্ল্যাপ ফেলে স্টেচকিনটা হাতে নিল সে। রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

স্টেচকিন পরীক্ষা করে কোথাও কোন ত্রুটি দেখল না রানা। দুটো অস্ত্রই জায়গামত রেখে দিল ও।

'তার মানে লিলি সত্যি কথা বলছে। ওকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো?'

'এখনও কিছু বলতে চাই না আমি,' বলল রানা।

'উজির ব্যাপারে কি করবে বলে ভাবছ?' জানতে চাইল সলোজা। 'জালুচিকে চার্জ করবে?'

'লাভ নেই। আমরা জানি, সেটাই আপাতত যথেষ্ট।'

খুশি মনে নিচে নেমে এল রানা। লাঞ্চ সেরে আফটার কেবিনে চলে গেছে জালুচি। লিলির বাঙ্কে শুয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। রানাকে খেতে দিয়ে ডেকে বেরিয়ে গেল লিলি। আধ ঘণ্টা পর হুইলহাউসে ফিরে এল রানা। দেখল, সলোজার সাথে কথা বলছে লিলি। দরজা খুলে রানা ভেতরে ঢুকতেই উত্তেজিত ভাবে ঘাড় ফেরাল লিলি, বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি, রানা!'

দিগন্তরেখার কাছে কালচে কি যেন একটা দেখল রানাও। বৃষ্টির মধ্যে ভাল দৃষ্টি চলে না। কিন্তু আরও আধ ঘণ্টা পর বৃষ্টি থামতে পরিষ্কার দেখা গেল ইসরায়েলি উপকূল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওটা কেপ ইসরাত!'

নিরাপদ কারাগার-২

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৮২

এক

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল আবহাওয়া। দূরের উপকূল রেখা আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল ওদের চোখে। কুয়াশা নেই, থেমে গেছে বৃষ্টি। সাগর এখন প্রায় শান্তই বলা যায়। বেলা দুটো। ঝড় নেই, সময় বাঁচাবার জন্যে স্পীড বাড়াবার এই সময়, কিন্তু তা না বাড়িয়ে আরও বরং কমিয়ে আনা হয়েছে—রানার নির্দেশ। বোটের পাশ ঘেঁষে একের পর এক ছুটে চলেছে খুদে জলযান, তাদের মনে সন্দেহ জাগাতে চায় না ও। মাছ ধরার ছোট ছোট নৌকো ওগুলো। জেলেরা তেমন খেয়াল করে দেখল না বোটটাকে। কে কার আগে গভীর সাগরে পৌঁছুতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে ওদের মধ্যে।

তীরের কাছাকাছি পৌঁছুল বোট। মুয়ালা বে-তে ঢোকার পথটা সরু একটা প্যাসেজ মাত্র, দু'পাশে দুটো কিনারা ভাঙা, উঁচু-নিচু শৃঙ্গ। দুই বোন নামে পরিচিত এরা, চার্টে তাই বলা হয়েছে। প্যাসেজ পেরিয়ে বিশাল একটা খাঁড়িতে প্রবেশ করল বোট, তীরভূমি চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে খাঁড়িটাকে। সাদা বালি চিক চিক করছে সৈকত জুড়ে, পিছনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাম গাছ। পাথরের তৈরি একটা জেটি দেখতে পেল ওরা, জেটির সাথে বাঁধা রয়েছে এক জোড়া মাছ ধরার বোট। পাম গাছের ফাঁক দিয়ে মাত্র ছয় সাতটা বাড়ি দেখা গেল।

চ্যানেলের যেখানে নোঙর ফেলল ওরা সেখানে পানির গভীরতা আট কি দশ ফ্যাদম। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ডেকে বেরিয়ে এসে রানা, জালুচি আর লিলির সাথে রেলিঙের সামনে দাঁড়াল সলোজা। কনুই দিয়ে জালুচির পাঁজরে গুঁতো মারল সে। 'ইসরায়েলি মেয়েরা কিন্তু দুনিয়ার সেরা, তা জানো?'

'ওসব জেনে কাজ নেই আমার,' অকারণে চটে উঠে বলল জালুচি।

রানা লক্ষ্য করল, জালুচিকে চটে উঠতে দেখে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল লিলি। ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে নেমে এল ওটেলিয়ো আর বনেটি। একটানা অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে দু'জনেই, কিন্তু মদের নেশা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

লিলিকে বলল রানা, 'ওদেরকে কিছু খেতে দেয়া যায় কিনা দেখো। হাতে অনেক কাজ। কিন্তু এই অবস্থায় ওরা কুটোও নাড়তে পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

পোষা ছাগলের মত তাড়িয়ে ওদের দু'জনকে নিচে নিয়ে গেল লিলি।

'এবার?' জানতে চাইল সলোজা। 'কি করব আমরা এখন?'

'বোট থেকে নেমে পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করব আমি,' বলল রানা। 'জজবা হয়তো ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে। আমার সাথে আসছ তুমি?'

'আমি?' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সলোজা। ইঙ্গিতে জালুচিকে দেখাল সে। 'এই সুন্দর খোকাকে নিয়ে যেতে পারো। ওর বোধহয় একটু এক্সারসাইজও দরকার।'

সলোজা হয়তো ভেবেছিল, বোট ছেড়ে যেতে রাজি হবে না জালুচি। কিন্তু রানার সাথে যাবার সুযোগ পেয়ে খুশিই দেখাল তাকে। বোট থেকে ডিঙি নামাতে রানাকে সাহায্য করল সে

আউটবোর্ড মোটরের স্টার্টার বাটনে চাপ দিল রানা। তীরের দিকে ছুটে চলল ডিঙি। চারদিকে তেমন কোন ব্যস্ততা বা ভিড় নেই। একটা ফিশিং বোটের হুইলহাউস থেকে মাথায় পাগড়ি বাঁধা এক ইহুদী বেরিয়ে এসে কৌতূহলী চোখে তাকাল ওদের দিকে। তীরে, ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর। সৈকতে পৌঁছে ডিঙি থেকে নামল ওরা।

'কোথায় যাব?' জানতে চাইল জালুচি। 'জজবা যে এখনও পৌঁছায়নি সে তো বোঝাই যাচ্ছে।'

'আমাদের জন্যে অপেক্ষা করার কথা তার,' বলল রানা। 'আশপাশে একটু খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার।'

'কাউকে দেখতে পাচ্ছ নাকি যে খোঁজ নেবে?'

নির্জন সৈকতের ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। তারপর পাম গাছগুলো লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল। পাথরের তৈরি জেটি ছাড়িয়ে এল ওরা। ঘরগুলো ঝোপ-ঝাড় দিয়ে ঘেরা। দূর থেকে দেখা গেল, একটা ঘরের চালে মাছ ধরার জাল বিছানো রয়েছে, চওড়া বারান্দায় সারি সারি কাঠের বাক্স আর নানা ধরনের তৈজস-পত্র। বোঝা গেল, এটা একটা গ্রাম্য মুদীখানা।

ঢোলা জোব্বা পরা এক লোক ঘরের ভেতর বসে ধূমায়িত কাপে চুমুক দিচ্ছিল, ওদেরকে দেখে তাড়াতাড়ি কাপটা নামিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল সে। তার চেহারায় উত্তেজনার ছাপ দেখা গেলেও, রানার তীক্ষ্ণ চোখে ধরা পড়ল, লোকটা ওদেরকে দেখে মোটেও আশ্চর্য হয়নি। জালুচিকে সাবধান করে দেয়া দরকার, কিন্তু এই মুহূর্তে কথা বলতে যাওয়াটা বোকামি হবে বুঝতে পেরে চুপ করে থাকল ও। এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ অচেতন বলে মনে হলো জালুচিকে, লোকটার দিকে ভাল করে একবার তাকায়ওনি সে। অদূরে দেখা গেল জলপাই গাছের ঝোপ; মাঝখানে দুটো ঘর। পাশেই একটা তাঁবু। সামনে বুড়ো একটা উট বসে আছে, তার আশপাশে ঘুর ঘুর করছে দুটো ছাগল। ঘরগুলোর পিছনে খা খা শূন্য জমি, কোথাও আর কিছু নেই। সরু একটা মেঠো পথ এঁকেবেঁকে কোথায় জানি চলে গেছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে মাঝবয়েসী লোকটা। বোঝা যায়, ওরা কিছু বলবে সেই আশায় অপেক্ষা করছে সে।

'বিয়ার আছে কিনা জিজ্ঞেস করব?' খানিকটা অনুমতি চাওয়ার সুরে বলল

জালুচি।

লোকটাকে প্রশ্ন করল রানা, 'আমরা যে আসব তা তুমি জানতে, তাই না?'

কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল লোকটা। 'জ্বে। জানতাম।' তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'আপনাদের মধ্যে মেজর রানা বলে কেউ আছেন কি?'

'আমি।'

বেতের দুটো চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বসতে অনুরোধ করল লোকটা। ঘরে ঢুকে দুটো বিয়ার নিয়ে বেরিয়ে এল তখুনি। বলল, 'আমার দোস্ত জজবা আজ সকালে আমার কাছ থেকে হয়ে গেছে। সে-ই বলেছে, আপনারা আসবেন। এই কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে সে, সন্ধের আগেই।'

লোকটার নাম সায়েফ। একটু বেশি কথা বলে। দু'মিনিট কাটতে না কাটতে জানা গেল, এই দোকান ছাড়াও একটা মাছধরার নৌকোর অর্ধেক মালিক সে। এরপর শুরু হলো তার প্রশ্নের পালা। সংক্ষেপে বলল রানা, উপকূল এলাকায় ডুব দিয়ে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করার পারমিট নিয়ে এসেছে ওরা। সেই সাথে জানাল, এ-সম্পর্কে স্থানীয় কোন জেলে যদি মূল্যবান কোন তথ্য দিতে পারে, তাকে বকশিশ দেয়া হবে।

আরেক প্রস্থ বিয়ার এল। এই সময় মেঠো পথে দেখা গেল মান্ধাতা আমলের একটা ফোর্ড ট্রাক। ট্রাকের পিছনটা ক্যানভাস দিয়ে ছাওয়া। জলপাই গাছের ঝোপের পাশে ব্রেক কষে থামল সেটা।

হুইলের পিছন থেকে নামল জজবা। সেই আগের লিনেন স্যুটটাই পরে আছে সে, ধুলো-বালি লেগে এখন সেটা ময়লা হয়ে গেছে। মাথায় স্ট্র হ্যাট। চেহারাটা ম্রিয়মাণ, যেন এইমাত্র কোথাও থেকে বেদম মারধর খেয়ে এল। চোখে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা।

ঘামে ভেজা, নোংরা একটা রুমাল দিয়ে কপাল আর গলা মুছল সে। ধাপ ক'টা টপকে উঠে এল বারান্দায়। রানার দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসল। 'যাক, আপনারা তাহলে ভালয় ভালয় পৌঁচেছেন!'

'অন্য রকম কিছু ভেবেছিলে নাকি?' ফস্ করে জানতে চাইল জালুচি।

'না! সেকি! ছি! তওবা!' দ্রুত মাথা নাড়ল জজবা।

'তোমাকে এমন কাহিল দেখাচ্ছে কেন?' জানতে চাইল রানা। কথা শেষ করে নিঃশব্দে সায়েফের দিকে জজবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও।

'আমার বন্ধু,' বলল জজবা। 'ওর সামনে আমরা সব কথা আলোচনা করতে পারি।' বারান্দার মেঝেতেই ধপ করে বসে পড়ল সে। 'কাহিল কি আর সাধে দেখাচ্ছে, স্যার! কোথাও যদি একটু ভুল-তাল হয়ে যায়, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হবে।' ভিজে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল সে। 'ডেঞ্জারাস একটা কাজে হাত দিয়েছি, স্যার। কর্নেল খানজুম হিংস্র জানোয়ারেরও অধম, নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে মজা পায়, তার কথা মনে পড়লেই কলজে শুকিয়ে যাচ্ছে আমার। তার হাতে পড়লে মনে হবে ফায়ারিং স্কোয়াড শতগুণ ভাল ছিল···'

'কোথাও কোন ভুল-তাল হবে না, কাজেই কর্নেলের হাতে পড়ছি না আমরা,'

বলল জালুচি। 'মনে জোর আনো, গা ঝাড়া দাও। যে লোক বারবার মরে তাকে মানুষ ঘৃণা করে।'

কিন্তু জালুচির এসব কথা জজবার চেহারায় কোন পরিবর্তন আনতে পারল না। সায়েফের হাত থেকে বিয়ারের ক্যান নিয়ে ঢক ঢক করে সাবাড় করল সেটা। আপনমনে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল বার কয়েক। তারপর জানতে চাইল, 'আপনাদের প্ল্যানটা কি, স্যার?'

'দুর্গটা একবার দেখতে চাই,' বলল রানা।

'এখন?' মুখ হাঁ হয়ে গেল জজবার।

'হ্যাঁ। সাগর থেকে। ভিরোমা নিয়ে যাব আমরা। ফিরে আসতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

চেহারা আরও শুকিয়ে গেল জজবার। 'কিন্তু, স্যার, তাদমোর এলাকায় বোট দেখলে সন্দেহ হবে ওদের! দোহাই আপনার, এই ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নেবেন না!'

'মাছ ধরার বোট দেখেও সন্দেহ হবে ওদের? ডেকে নেট বিছানো থাকলেও? দুর্গের পাঁচিল থেকে সাগরের দিকে তাকালে মাছ ধরার নৌকা আর বোট তো সারাক্ষণই দেখতে পায় ওরা।'

চেহারা দেখে মনে হলো, খুব বেশি না হলেও মনে একটু সাহস ফিরে এসেছে জজবার। সায়েফকে নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল সে, তার সাথে কি যেন আলাপ করে ফিরে এল তখুনি। কয়েক মিনিট পর ওরা যখন ভিঙির দিকে রওনা হলো, বড় আকারের দুটো জাল দেখা গেল ওদের সাথে।

রেইল টপকে ভিরোমায় চড়েই হুইলহাউসের ভেতর গা ঢাকা দিল জজবা। ইঞ্জিনরুম হ্যাচের ওপর বসে ছিল সলোজা, রানাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল সে। 'ব্যাপারটা কি?'

'এর কথাই বলেছিলাম তোমাকে, সলোজা,' বলল রানা। 'জজবা। দুর্গ দেখতে যাচ্ছি আমরা, তাই ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে ব্যাটা।'

চটাস করে কপাল চাপড়াল সলোজা। 'হায় মেরীর ছাওয়াল, কত কাণ্ডই দেখব!' এদিক ওদিক মাথা নাড়তে নাড়তে হুইলহাউসে গিয়ে ঢুকল সে, ইলেকট্রিক উইঞ্চের বোতাম টিপে নোঙর তুলল।

আকাশ ছোঁয়া শৃঙ্গ, পাহাড়ের খাড়া গা, উঁচু-নিচু পাথর ছাড়া আর কিছু দেখার নেই তাদমোরে। দুর্গম এলাকাটার ওপর চোখ বুলালেই গা ছমছম করে, মনে হয় এটা একটা অভিশপ্ত জায়গা পৌঁছুতে ওদের প্রায় সন্ধে হয়ে গেল। বৃষ্টিটা আবার বেড়েছে। দুর্গটাকে পরিষ্কার দেখা না গেলেও যতটুকু দেখা গেল মনে সংশয় আর দ্বিধা জাগাবার জন্যে সেটুকুই যথেষ্ট।

বোটের মাস্তুল থেকে স্টার্নের রেল পর্যন্ত ঝুলছে জাল, তার ভেতর গা ঢাকা দিয়ে চোখে বায়নোকুলার তুলল রানা। দক্ষিণ দুর্গ প্রাচীরের নিচে পাহাড়ের পাঁচিলটা খাড়া এবং মসৃণ, কোন মানুষের পক্ষে ওই পাঁচিল বেয়ে ওঠা অসম্ভব। নিচে পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে আছে অসংখ্য কালো পাথরের চাঁই, মস্ত

ঢেউগুলো ছুটে এসে সেগুলোর গায়ে ধাক্কা খেয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছে, প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠছে গোটা পার্বত্য এলাকা। পাহাড়ের পায়ের কাছে সরু একটা কার্নিস দেখা গেল, তীর বা সৈকত বলতে ওইটুকুই।

বিনকিউলারটা বনেটির হাতে ধরিয়ে দিল রানা। মনোযোগ দিয়ে ঝাড়া এক মিনিট পাহাড়ের খাড়া গা দেখল সে, তারপর ওটা রানাকে ফেরত দিয়ে বলল, 'আমার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। হাতে সময় আর যন্ত্রপাতি পেলে কারও সাহায্য লাগবে না, আমি একাই উঠতে পারব। আর যদি রশি পাই, তরতর করে উঠে যাব।'

'অন্ধকারেও?'

'সবচেয়ে সুবিধে তো অন্ধকারেই,' হেসে উঠে বলল বনেটি। 'নিচের দিকে তাকালে কিছু দেখতে পাব না।'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল রানা। বিনকিউলারটা এবার জালুচির হাতে ধরিয়ে দিল ও। বনেটির চেয়ে দ্বিগুণ সময় নিয়ে পাহাড়ের গা পরীক্ষা করল জালুচি, বলল, 'দু'জন সেন্ট্রি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ের এমন খাড়া গা বাপের কালেও আমি দেখিনি।'

'চড়তে পারবে কিনা বলো।'

'তুমি পারবে?'

মুখ বুজে থাকল রানা। গম্ভীর দেখাল লিলিকে। এমন কি সলোজার মুখেও হাসি নেই। বড় একটা বৃত্ত রচনা করে বোট ঘুরিয়ে নিল সে। ফিরে চলল ওরা।

'বরং আমাকে একটু উৎসাহ দাও, সলোজা,' হুইলহাউসের জানালায় হেলান দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'তোমাকে তো আর পাহাড় বেয়ে উঠতে হচ্ছে না, কাজেই এত মুষড়ে পড়ার কিছু নেই।'

সলোজা উত্তর দেবার আগেই, দরজার পাশ থেকে কোলা ব্যাঙের মত আওয়াজ করে উঠল জজবা, 'মি. রানা, স্যার, দোহাই আপনার, এই পাগলামি বাদ দিন! ওই পাহাড় বেয়ে কারও পক্ষে ওঠা সম্ভব নয়! কেউ যদি চেষ্টা করে, তাকে মরতে হবে!'

'মাই গড!' আঁৎকে উঠল সলোজা। 'অথচ এই ছুঁচোটার ওপর ভরসা রাখতে বলা হয়েছে আমাদের!'

খোলা দরজার সামনে দেখা গেল জালুচিকে। ঠোঁটের কোণে একটা সিগারেট গুঁজল সে, তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল জজবার দিকে। খস্ করে দিয়াশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল। 'ব্যাপার কি, জজবা?' কঠিন সুরে জানতে চাইল সে। 'সিনর মারানজানা কি তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেন না?'

'প্লীজ, সিনর জালুচি,' করুণ আবেদনের ভঙ্গি ফুটে উঠল জজবার চেহারায় এবং কথার সুরে। 'সিনর মারানজানা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি টাকা দেন আমাকে। সেজন্যে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ...'

'এই বুঝি তোমার কৃতজ্ঞতার নমুনা! রানাকে বুদ্ধি এবং তথ্য যোগান দেবার বদলে ওকে সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে নিরাশ করার চেষ্টা করছ, ওর প্রতিটা কাজে

বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছ। কেন? তবে কি বলতে চাও, কাজটা নেবার আগে এর প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই তুমি জানতে না?'

দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে জজবা। কোটরাগত চোখ দুটো চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক ঘুরছে, যেন পালাবার একটা পথ খুঁজছে সে। সব শেষে আবার জালুচির মুখের ওপর স্থির হলো তার ভয়ার্ত দৃষ্টি। অনেক চেষ্টা করে একটা ঢোক গিলল সে।

আঁধার বলল জালুচি, 'সিনর মারানজানা চালবাজি পছন্দ করেন না। একটা ঘটনার কথা বলি তোমাকে, জজবা, তা থেকে যদি শিক্ষা নিতে পারো! গত বছর আলজিয়ার্সে কসেসু নামে এক লোকের সাথে তিনি ছোটখাট একটা ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসেন। বিদেশী টাকা বিনিময়ের ব্যাপার। ছোটখাট চুক্তি মানে কয়েক লাখ মার্কিন ডলারের ব্যবসা। লেনদেনের শেষ পর্যায়ে হঠাৎ করে বেশি টাকা দাবি করে বসল কসেসু।'

জিভ বের করে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল জজবা। ফিসফিস করে বলল, সিনর, প্লীজ! এসবের সাথে আমার কি সম্পর্ক?'

'ল্যাট্রিনের ভেতর পাওয়া গিয়েছিল কসেসুকে,' বলে চলল জালুচি। 'দেয়ালের সাথে পেরেক গাঁথা অবস্থায়। শুধু হাতে আর পায়ে। ওই অবস্থায় তিন দিন ছিল সে। পেরেক খুলে ল্যাট্রিন থেকে বেরিয়ে আসবে সে উপায় তার ছিল না। ইন্টারেস্টিং ঘটনা, তাই না?'

আতঙ্কে জজবার মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল সে। মনে মনে খুশিই হলো রানা। ওদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে ওর কোন ক্ষতি নেই। তাছাড়া, জজবাকে পুরোপুরি বিশ্বস্ত বলে কখনোই মনে হয়নি ওর, লোকটার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে পারলে সবার জন্যেই ভাল হবে সেটা।

দুই বোনের মাঝখান দিয়ে খাঁড়িতে ঢুকল ওরা, আবার নোঙর ফেলল। সন্ধে উতরে গেছে, চারদিকে ঘন অন্ধকার। কানের পাশে কে যেন খুক করে কাশল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। রেলিঙের সামনে একটা ছায়ামূর্তি।

'আ আমি, স্যার! জজবা। বলছিলাম কি, আমাকে কি আপনার আর দরকার হবে? অনুমতি দিলে আমি চলে যাই।'

'বোটে ওঠো,' বলল রানা।

জজবাকে সৈকতে পৌঁছে দিল রানা। বোট থেকে নেমে গেল জজবা, পিছন থেকে তাকে ডাকল রানা। 'কাল সকালে, কেমন?'

তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল জজবা। দ্রুত এগিয়ে এসে বোটের সামনে থামল সে। স্যার?'

'দশটায়,' বলল রানা। 'এখানে। ট্রাক নিয়ে এসো। চারদিক ঘুরিয়ে দেখাবে তুমি আমাকে। কারাগার, রোড নাখাল। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

'কিন্তু স্যার, কারাগারের আশপাশে ঘুরঘুর করা সাংঘাতিক ঝুঁকির ব্যাপার! আমাদের যদি দাঁড় করানো হয়?'

'দাঁড় করানো হলে কি বলতে হবে তা ভেবে বের করো। সারারাত সময়

রয়েছে তোমার হাতে। সকাল দশটায় এখানে তোমাকে চাই আমি। আর হ্যাঁ, কাস্টম অথরিটিকে আমাদের কথা বলতে ভুলো না।' ডিঙি ঘুরিয়ে নিয়ে ভিরোমার দিকে রওনা হলো রানা।

দুই

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে সেলুনে নেমে এল রানা। সবাই রয়েছে এখানে। সবার জন্যে কাপে কফি ঢালছে লিলি। ওটেলিয়ো আর বনেটিকে দেখে মনে হলো, নেশার ঘোরটা কাটিয়ে উঠেছে তারা। সেলুনের ভেতর শান্ত, হাসি-খুশি পরিবেশ।

'ছেঁড়া তার বলে মনে হলো লোকটাকে,' বলল সলোজা। 'তুমি কি বলো?'

'জালুচি ওর ভেতর দোজখের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে,' বলল রানা। 'আমিও একটু রগড়ে দিয়েছি। আশা করা যায় এতেই কাজ হবে।'

'শালার চাঁদমুখ আবার কখন দেখতে পাব আমরা?' জানতে চাইল জালুচি।

'কাল দশটায়। ট্রাক নিয়ে আসবে, ওকে সাথে নিয়ে আশপাশটা ঘুরে দেখব আমি।'

এই প্রথম জালুচির গলার স্বরে কোনরকম চ্যালেঞ্জের সুর বাজল না। তার কাছে এখন সবকিছুর ঊর্ধ্বে কাজ। 'তোমার সাথে আর কে যাচ্ছে?'

এ-ব্যাপারে আগেই চিন্তা-ভাবনা করেছে রানা। 'নাখালের সেট-আপ দেখতে হবে ওটেলিয়োকে, কাজেই আমার সাথে যাচ্ছে ও। আরও একজন যেতে পারো, কিন্তু কে যাবে তা তোমার আর বনেটির ব্যাপার।'

পকেট থেকে গোল একটা মুদ্রা বের করল জালুচি। 'হেড, না টেইল?' জানতে চাইল সে।

'হেড,' বলল বনেটি।

বুড়ো আঙুলের টোকা দিয়ে মুদ্রাটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল জালুচি। ডেকের ওপর পড়ল সেটা। ঝুঁকে দেখল সবাই। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জালুচির মুখ। রানার দিকে ফিরে বলল, 'আমি কি করব বলো! নিয়তি তোমার সাথে আমাকে আঠা দিয়ে আটকে রেখেছে।'

'ঘুমাতে যাবার আগে আরেকটা কাজ,' বলল রানা। 'অ্যামফোরাগুলো সাগরে ফেলে দেবার ব্যবস্থা করো।'

'কাস্টমস চেকিং আশঙ্কা করছ? এত তাড়াতাড়ি?' বিস্মিত দেখাল সলোজাকে।

'নাখালে পৌঁছে ওদেরকে খবর দেবে জজবা। ওরা এসে যেন দেখতে পায় সাগরের তলা থেকে ওগুলো তুলছি আমরা। কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে সাগর থেকে একটা অ্যামফোরা তুলে আনা, অপারেশনটা সৈকত থেকে দেখবে সবাই। বেলা আরও একটু চড়লে তুমি বা বনেটি আবার ডুব দেবে সাগরে, যদি কিছু পাও তো ভাল, তা না হলে আমাদেরই আরও একটা অ্যামফোরা তুলে

আনবে। কাজের ধরনটা জানা আছে তোমাদের, কাজেই ব্যস্ততা দেখাতে অসুবিধে হবে না, কি বলো?'

'ঠিক আছে।'

ফরওয়ার্ড হোল্ডে ছিল অ্যামফোরাগুলো। জোড়া হাতলওয়ালা মাটির তৈরি ওয়াইন জার ওগুলো, প্রত্যেকটায় দশ গ্যালন করে মদ ধরে। ফিনিশিয়ান, রোমান, গ্রীক—পুব মেডিটেরেনিয়ানের সব জায়গায় পাওয়া যায়। জেলেদের জালে অহরহ ওঠে, বিশেষ করে তারা যখন ট্রলিং করে।

ডেকে বেরিয়ে এল সবাই। মেইন হোল্ডের হ্যাচ খোলা হলো। ভেতরে নামল ওটেলিয়ো আর বনেটি। মোট চারটে অ্যামফোরা, একটা একটা করে তুলল ওরা। রানা আর জালুচি সেগুলো বয়ে নিয়ে এল স্টারবোর্ড দিকের রেইলের কাছে। ধরাধরি করে ফেলা হলো পানিতে।

হাতে আর কোন কাজ নেই, কাজেই যে যার কেবিনে চলে গেল। ডেকে রইল শুধু রানা একা। একটা সিগারেট ধরিয়ে রেলিঙে ভর দিল ও, তাকিয়ে আছে তীরের দিকে। জলপাই ঝোপের পিছনে বেদুইনদের তাঁবু, সেখান থেকে মন উদাস করা বাজনা ভেসে আসছে। নিশুতি রাতের বাতাস করুণ সংগীতের মূর্ছনায় কেমন যেন ভারী হয়ে উঠল।

'কি ভাবছ?' লিলির গলা।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল সে। মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। রানা কিছু বলছে না দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল, 'আবার বৃষ্টি আসতে পারে।' নাক টেনে ঘ্রাণ নিল সে। 'কাঠ পোড়ার গন্ধ পাচ্ছ?'

'বেদুইনরা আগুন জ্বেলেছে,' বলল রানা। একটু থেমে আবার বলল ও, 'চলো দোকান থেকে এক কাপ করে কফি খেয়ে আসা যাক। একটু উৎসব করি।'

সরে এসে রানার গায়ে গা ঠেকাল লিলি। 'উৎসব?'

'হ্যাঁ।'

'কি উপলক্ষ্যে?'

'জালুচিকে স্টেচকিনের কথাটা জানাওনি তুমি,' বলল রানা। 'উৎসবের জন্যে এর চেয়ে ভাল উপলক্ষ্য আর কি হতে পারে?'

অনুভব করল রানা, লিলির শরীর শক্ত হয়ে গেল। 'উজি···ওটা কি সরিয়ে নিয়েছে জালুচি?'

'না। তবে কিছু দিয়ে ঘষে ভোঁতা করে দিয়েছে ফায়ারিং পিনটা।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল লিলি, তারপর জানতে চাইল, 'এখন তাহলে বিশ্বাস করো আমি তোমার দলে?'

হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে ইচ্ছে করল না রানার। ডেকে কেউ নেই, সেলুন বা হুইলহাউস থেকেও কারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সিগারেট ফেলে দিয়ে রশি টেনে ডিঙিটাকে বোটের গায়ের কাছে নিয়ে এল রানা। রেইল টপকে নেমে পড়ল তাতে। 'আসছ?' জানতে চাইল ও।

ডেকের আলোয় ম্লান দেখাল লিলির চেহারা। কিন্তু কোন রকম ভাবাবেগের

ছাপ নেই সেখানে। কিছুই বলল না। রেইল টপকে নেমে পড়ল ডিঙিতে, বসল রানার পাশে। মোটর স্টার্ট দিয়ে ডিঙি ছেড়ে দিল রানা। তীরের দিকে ছুটে চলল ওরা।

দোকান খুলে রেখে বসে বসে ঝিমুচ্ছিল সায়েফ, ওদেরকে দেখে সটান উঠে দাঁড়াল সে। ঘরের এক কোণে মস্ত একটা আগুন জ্বলছে, পাশে বসে মুরগীর রোস্ট তৈরি করছে সায়েফের বউ। আগুনের আঁচে পুড়ে লালচে হয়ে গেছে মুরগী, দেখে জিভে পানি এসে গেল রানার। 'কফি খেতে এলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে একটা রোস্ট দাও, ভাগ করে খাই আমরা।'

'সকালে জেলেরা এই খেয়ে বেরোয়,' বলল সায়েফ। 'অর্ডারের চেয়ে দু'একটা বেশিই তৈরি করি, পেট ভরে খেতে পারেন।'

সায়েফের বউটা শুধু অল্পবয়েসী নয়, অপরূপ সুন্দরী। মুরগীর রোস্টে কামড় দিয়ে মনে মনে স্বীকার করতে হলো, তার রান্নার হাতটাও দারুণ। কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল লিলি। 'একটু হাঁটব, তোমার খারাপ লাগবে?'

'চলো।' দাম মিটিয়ে দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল ওরা। সৈকতে পৌঁছে জুতো খুলে ফেলল লিলি। পাম গাছের ভেতর দিয়ে অনেক দূর এগোল ওরা, বাঁক ঘুরে আবার চলে এল সৈকতে। বেদুইনদের তাঁবু ছাড়িয়ে ক্রমশ দূরে সরে এল ওরা, কিন্তু বাজনার আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে এখনও। আবার বৃষ্টি আসবে সে সম্ভাবনা নেই। কেটে গেছে মেঘ। নির্জন শুয়ে আছে সৈকত, কোথাও জনমনিষ্যির ছায়া পর্যন্ত নেই। অগভীর পানিতে নেমে গেল লিলি।

'সাবধান,' বলল রানা। 'অন্ধকারে পর্তুগীজ ম্যান-অফ-ওয়র বা আর কিছু মাড়িয়ে ফেলতে পারো!'

'মন চাইছে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটুক,' বলল লিলি। মুখ তুলে তারাগুলোর দিকে তাকাল সে। 'রাতটা বড় সুন্দর, তাই না? এমন একটা রাতে বেঁচে আছি, এ যেন পরম সৌভাগ্য।'

অকাল মৃত্যু খুব কাছাকাছি থাকলে, অনেকের এই রকম অনুভূতি হয়, কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও নিজেকে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল রানা। সময়টা উপভোগ করছে, করুক।

আবার বলল লিলি, 'এর আগে কখনও এই রকম অনুভূতি হয়নি আমার। না, ভুল হলো হয়েছে—সেই কেপ ডি গাটায়, তখনও আমার পাশে ছিলে তুমি।'

'সাবজেক্ট টেরেসে মিস লিলির সাথে প্রেম করে।'

নির্দয়তার পরিচয় দেয়া হয়ে গেল, এবং কথাটা বলেই নিজেকে তিরস্কার করল রানা। কিন্তু ব্যাপারটাকে সাহসের সাথে মোকাবিলা করল লিলি। বলল, 'যা খুশি বলে ব্যঙ্গ করতে পারো, এসব আমার প্রাপ্য।'

লিলির হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে শুকনো বালির ওপর বসাল রানা। নিজেও বসল তার পাশে।

মৃদু কণ্ঠে বলল লিলি, 'তুমি আর ফিরে যেতে পারো না?'

'কেপ ডি গাটায়?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ফেলে আসা জিনিসগুলো নিয়ে আসার জন্যে একবার হয়তো যেতে হবে। কিংবা লোক পাঠাব। আসলে, কোথাও বেশিদিন থাকতে পারি না আমি। আর, ফিরে যাওয়ার কথা যদি বলো, কোথাও ফিরে যাওয়া আমার প্রকৃতিতে নেই।'

'প্রতিটি মানুষের এমন একটা জায়গা থাকা দরকার যেটা তার নিজের,' বলল লিলি। 'লুকোবার একটা জায়গা, রুটস···'

'তুমি যে অর্থে ফিরে যাওয়া বলছ সেভাবে আমরা কেউই কখনও কোথাও বা কারও কাছে ফিরি না,' বলল রানা, 'আবার হয়তো দেখা হয় কারও সাথে, কিন্তু ইতিমধ্যে দু'জনেই আগের বারের থেকে অনেক বদলে গেছি। জায়গার ব্যাপারেও সেই একই কথা।'

'তুমি আসলে নিখাদ একজন নিঃসঙ্গ মানুষ।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিলি। 'কেউ তোমাকে বাঁধবে, তা হবার নয়।'

'মানুষ আসলে সবাই একা···কি হলো?'

উঠে দাঁড়িয়েছে লিলি। 'সাঁতার কাটব,' বলল সে। প্রথমে, শার্ট খুলল তারপর জীনস। একটু ইতস্তত করে ব্রা আর প্যান্টিও খুলল। সৈকত ধরে ছুটে গেল সে। ঝপাৎ করে আওয়াজ হলো পানিতে। কয়েক মুহূর্ত পর তার গলা পেল রানা, 'এসো।'

কোন সাড়া না দিয়ে নিজের জায়গায় বসে থাকল রানা। তারার আলোয় কালচে সাগরের বুকে ঘন কালো একটা সচল ছায়ার মত দেখাচ্ছে লিলিকে। তীর ছেড়ে খুব বেশি দূরে যাচ্ছে না, তবে আড়াআড়ি ভাবে বেশ কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে আসছে দ্রুত।

উঠে পড়ল রানা। পাম গাছের শুকনো পাতা আর ডালপালা কুড়িয়ে জড় করল এক জায়গায়, তারপর আগুন ধরাল। আগুন যখন বেশ গনগনে হয়ে উঠেছে, এই সময় তার লালচে আলোয় এসে দাঁড়াল লিলি। উন্নত বুক থেকে পানি গড়াচ্ছে। আগুনের আলোয় ঝলমল করছে পানির ধারা আর ফোঁটাগুলো। লিলির নগ্ন শরীরটা আশ্চর্য একটা রহস্য বলে মনে হলো রানার। শরীরের খাঁজগুলো অন্ধকারে ঢাকা, চোখের মণিতে নাচছে লকলকে শিখা, ঠোঁট জোড়া ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। এর সাথে তুলনা চলে এমন সুন্দর কিছু শেষ কবে দেখেছে মনে করতে পারল না ও।

এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল লিলি, বলতে পারবে না রানা। হুঁশ ফিরল লিলি যখন হাঁটু মুড়ে বসল ওর সামনে। একটা হাত বাড়িয়ে তার কোমর পেঁচিয়ে ধরল রানা। কাছে টানল। অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল জালুচি। পরনে বেদিং ট্রাঙ্ক। তারমানে সাঁতার কেটে তীরে পৌঁচেছে সে।

'দুঃখিত, রানা,' বলল জালুচি। 'মনে হচ্ছে অত্যন্ত নাজুক একটা মুহূর্তে এসে পড়েছি আমি।'

রানার আলিঙ্গনের ভেতর শক্ত কাঠ হয়ে গেল লিলি। পরমুহূর্তে অবাক কাণ্ড, ঢিল পড়ল তার শরীরে। ঘাড় ফিরিয়ে জালুচির দিকে তাকাল না সে, বলল, 'এতটা

ছোটলোক তুমি হও কি করে, জালুচি? নাকি প্রায়-সময় যে ভদ্রতাটুকু দেখাও তুমি, সেটাই আসলে মুখোশ?'

'আরে,' বলল জালুচি, 'তুমি দেখছি সাংঘাতিক চটে গেছ! ও, আমার সামনে লজ্জা পাচ্ছ বুঝি?'

উঠে দাঁড়াল লিলি। ঘুরল। দু'কোমরে হাত রেখে তাকাল জালুচির চোখে। 'তোমাকে লজ্জা পাব? কেন?'

জালুচির চেহারাটা যেন প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে গুঁড়িয়ে গেল। এ রকম সামান্য একটা কথায় কি এমন আঘাত থাকতে পারে, ভেবে পেল না রানা। বিধ্বস্ত চেহারায় ধীরে ধীরে অদ্ভুত এক বিষণ্ন ভাব ফুটে উঠল। পরার জন্যে বালির ওপর থেকে প্যান্টি আর ব্রা তুলে নিল লিলি, এতক্ষণে নিচু গলায় বলল জালুচি, 'ইউ বিচ! ইউ র‍্যাডি বিচ!'

জালুচির দিকে পিছন ফিরল লিলি, তাকে আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। শার্টের বোতাম লাগিয়ে জীনসটা তুলে নিল। কি বলবে, কি করবে বুঝতে না পেরে চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে থাকল রানা। লিলির কাপড় পরা শেষ হতে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে তার একটা হাত ধরল ও, তারপর সৈকত ধরে হাঁটতে শুরু করল।

অনেকটা দূরে এসে, অন্ধকারের ভেতর রানাকে থামাল লিলি। ওকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে চুমো খেল সে। বলল, 'ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ কেন, কি করেছি?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

কি এক আনন্দে হেসে উঠল লিলি। 'তোমার এই জিনিসটাই সবচেয়ে ভাল লাগে আমার। এত বুদ্ধি, এত কাঠিন্য অথচ ভেতরে তুমি এখনও অবোধ শিশুর মত সরল আর নিষ্পাপ।'

বোকা বনে গেল রানা। কোন্ প্রসঙ্গে কি বলছে লিলি, কিছুই ঢুকল না ওর মাথায়।

হাত ধরাধরি করে বোটের দিকে ফেরার সময় জানতে চাইল রানা, 'জালুচির ব্যাপারটা আসলে কি বলো তো?'

'প্রশ্নটা আরও অনেক আগেই আশা করেছিলাম আমি।'

'ব্যাপারটা কি?'

'অ্যাক্সিডেন্ট,' সংক্ষেপে বলল লিলি।

'অ্যাক্সিডেন্ট মানে?' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'অ্যাক্সিডেন্ট মানে অ্যাক্সিডেন্ট!' গম্ভীর সুরে বলল লিলি। 'চড়া খেসারত দিতে হয়েছে ওকে। এর চেয়ে ওর মরে যাওয়া ভাল ছিল।' একটু থেমে আবার বলল লিলি, 'অ্যাক্সিডেন্টটার পর থেকে কোন মেয়ের সাথে শুতে পারে না জালুচি। সবাই জানে, বেচারা তার পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলেছে।'

ফেরার পথে আর কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে। শত্রু হলেও, জালুচির জন্যে দুঃখ বোধ করল রানা।

*

তেল আবিব থেকে পেট্রল বোট এল পরদিন সকাল ন'টার কিছু পর। সলোজাকে

নিয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট চেক করছে রানা, এই সময় ওদেরকে সাবধান করে দিল বনেটি।

'একটা বোট আসছে।'

দিনের প্রথম ডাইভ শেষ করে এইমাত্র পানির নিচ থেকে উঠে এসেছে রানা। একটা অ্যামফোরার সাথে লাইন বেঁধে রেখে এসেছে ও, সেটা এখন টেনে তুলছে সলোজা আর বনেটি। রেইলের ওপর দিয়ে ডেকে নামানো হলো অ্যামফোরাটাকে, তার গা থেকে পানি গড়িয়ে চারদিকে খুদে পুকুরের সৃষ্টি হলো। জিনিসটার গায়ে সী শেল বাসা বেঁধে আছে, দেখে বিশ্বাস হয় অনেক যুগ ধরে সাগরের তলায় পড়ে ছিল এটা।

কমলা রঙের ওয়েট স্যুটের ওপরের অর্ধেক পরে আছে রানা, তার সাথে একটা ফেস মাস্ক, অ্যাকুয়ালাঙ। জালুচি বেরিয়ে এল ডেকে, তাকে দেখে ইশারায় কাছে ডাকল রানা। 'অকারণে ঘুর ঘুর না করে, তাড়াতাড়ি অ্যাকুয়ালাঙ পরে ব্যস্ততার ভান করো!'

বিনা তর্কে রানার নির্দেশ মেনে নিল জালুচি। রানার কাঁধে একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে দিল লিলি; তারপর হাতে ধরিয়ে দিল জ্বলন্ত সিগারেট। সোয়েটার আর জীনস পরে আছে লিলি।

'নিচে গিয়ে বিকিনি পরো,' তাকে বলল রানা। 'চুলে চিরুণী বুলিয়ে চোখে সানগ্লাস লাগাও। সামান্য একটু মেকআপ নিতেও ভুলো না। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে এসো। কাছেপিঠে সুন্দরী একটা মেয়ে থাকলে অনেকে তাকে ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। যাও!'

লিলিও কোন তর্ক না করে রানার নির্দেশ মেনে নিল। কাছে চলে এসেছে বোট, তৈরি হবার জন্যে হাতে বেশি সময় নেই ওদের। এমন কিছু আহামরি নয় বোটটা। পুরানো আমলের পঞ্চাশ ফুট ডিজেল লঞ্চ, বড়জোর পনেরো নট স্পীড তুলতে পারে। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ছয় জন ইউনিফর্ম পরা নাবিক। স্টার্নে একটা মার্কিন লাইট সাব-মেশিনগান দেখা গেল, সুইভেল মঞ্চে ফিট করা হয়েছে, পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন গানার। সাব-মেশিনগানটা লোড করা হয়েছে একটা হানড্রেড রাউন্ড ড্রাম দিয়ে। গানারের পিছনে একটা পোল, ডগায় পত পত করে উড়ছে ইসরায়েলি পতাকা।

ভিরোমার পাশে চলে এল পেট্রলবোট। একজন নাবিক একটা লাইন ছুঁড়ে দিল, সেটা ধরে ফেলল বনেটি আর ওটেলিয়ো। সদ্য ভাঁজ ভাঙা খাকী ইউনিফর্ম আর নেভী ক্যাপ পরা একজন অফিসার বেরিয়ে এল হুইলহাউস থেকে। সোজা উঠে এল ভিরোমায়। এগিয়ে এসে তার পথরোধ করে দাঁড়াল রানা।

রানার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে অফিসার বলল, 'আমি কোস্ট গার্ড সার্ভিসের লেফটেন্যান্ট উবে। আপনি?'

তর্জনী দিয়ে বোটের ডেক দেখিয়ে বলল রানা, 'পালার্মো থেকে ভিরোমা।' সলোজার দিকে ফিরল ও। 'আমাদের কাগজপত্র সব ঠিক আছে তো, সলোজা?'

হুইলহাউসে ঢুকে তখুনি আবার বেরিয়ে এল সলোজা। তার হাত থেকে

ডকুমেন্টগুলো নিয়ে উবের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। লোকটা সেগুলো পরীক্ষা করছে, এই সুযোগে তাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল রানা। অল্প বয়স, বড়জোর বাইশ। চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ। নিখুঁত ভাবে কামানো দাড়ি, কিন্তু সরু একজোড়া গোঁফ আছে। প্রয়োজন ছিল না, তবু বলল রানা, 'বোটের কাগজপত্র ছাড়াও এখানে ডুব দেবার জন্যে আপনাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পারমিট আছে।'

অনেকক্ষণ ধরে কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করল অফিসার। কপালের মাঝখানে একটা ভাঁজ ফুটল। মুখ তুলে জানতে চাইল, 'আর্কিওলজিক্যাল ডাইভিং?'

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে বলল রানা। 'আপনার মূল্যবান মতামত পেলে খুশি হব আমরা। এই যে, দেখুন, এইমাত্র এটা তুলে আনা হয়েছে সাগর থেকে।' ডেকের ওপর পড়ে থাকা ভিজে অ্যামফোরাটা দেখাল রানা।

জিনিসটা দেখে চোখ জোড়া বড় বড় হয়ে উঠল অফিসারের। 'বাহ্! খুব সুন্দর জিনিস! নিশ্চয়ই অনেক দাম হবে? কি ওটা···রোমান?'

মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহুঁ। আমরা রোমান ধ্বংসাবশেষ খুঁজছি বটে, কিন্তু পেয়েছি একটা ফিনিশিয়ান। রোমান যে নয়, সে ব্যাপারে আমরা শিওর।'

এগিয়ে গিয়ে অ্যামফোরাটা পরীক্ষা করল উবে। তারপর মুখ তুলে জানতে চাইল, 'তার মানে আপনারা একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন?'

'শুধু কাঠ, একটা স্টার্নপোস্ট আর কয়েকটা অ্যামফোরা,' বলল রানা। 'ওই রকম আরেকটা তোলার জন্যে আবার ডাইভ দিতে যাচ্ছিলাম···'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে এল লিলি। কালো বিকিনি, সোনালী স্যান্ডেল, গাঢ় রঙের সানগ্লাস। তার দিকে চোখ পড়তে অফিসারের তো বটেই, রানারও চোখ আটকে গেল। হাতে করে একটা ট্রে নিয়ে এসেছে লিলি, তাতে গ্লাস ভর্তি বিয়ার।

লিলির সাথে উবের পরিচয় করিয়ে দিল রানা। জাপানীদের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল উবে লিলিকে। রানা বলল, 'মাফ করবেন, অফিসার, আমি আর দেরি করতে পারি না।'

জালুচিকে ইঙ্গিত দিল রানা, জায়গামত বসিয়ে নিল ফেস মাস্ক, তারপর মই বেয়ে রেইলের ওপর উঠে ঝাঁপ দিল পানিতে। এয়ার সাপ্লাই চেক করার জন্যে পানির ঠিক নিচেই একটু থামল ও, বুড়ো আঙুল খাড়া করে সিগন্যাল দিল জালুচিকে, তারপর ঘোলা সবুজাভ পানির ভেতর দিয়ে অনুসরণ করল লাইনটাকে।

পঞ্চাশ কি ষাট ফিট নিচে বিশাল জায়গা জুড়ে সামুদ্রিক ঘাসের বিস্তার। ঘাসের ফাঁকে, রানার ঠিক নিচেই একটা অ্যামফোরা পড়ে রয়েছে। ওর ডান দিকে খানিকটা জায়গা ফাঁকা, সেখানে বালির ওপর পড়ে রয়েছে আরেকটা। হাতে লাইন ধরে রানার পাশে এসে থামল জালুচি। রানার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে নামতে শুরু করল সে, তাকে অনুসরণ করল রানা। লাইনের প্রান্ত দিয়ে অ্যামফোরাটাকে শক্ত করে বাঁধা হলো। লাইনে তিনটে টান দিয়ে সিগন্যাল দিল জালুচি। বোট থেকে লাইন টানা শুরু হলো। অ্যামফোরাটাকে অনুসরণ করল ওরা।

পানির ওপর মাথা তুলে ওরা দেখল ওটেলিয়ো আর বনেটি অ্যামফোরাটাকে

এরই মধ্যে ডেকে তুলে নিয়েছে। কোন দিকে কোন খেয়াল নেই অফিসার উবের, লিলির সামনে দাঁড়িয়ে কবুতরের মত অনবরত বাক-বাকুম, বাক-বাকুম করে যাচ্ছে। হাতে বিয়ারের একটা গ্লাস রয়েছে বটে, কিন্তু তাতে চুমুক দিতে ভুলে গেছে সে।

ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে অ্যাকুয়ালাঙ খুলল রানা। ওর দিকে উবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল লিলি। ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল অফিসার। 'নতুন কিছু পেলেন, নাকি একই জিনিস?'

'অ্যামফোরা পাওয়াও ভাগ্যের কথা, অফিসার,' বলল রানা। 'প্রেজেন্ট করলে একটা নেবেন নাকি? তেল আবিবের মিউজিয়ামে যদি পাঠিয়ে দেন, ওদের খাতায় আপনার নাম লেখা থাকবে।' একটু থেমে আবার বলল রানা, 'অবশ্য এই অপারেশনের প্রগ্রেস রিপোর্ট দেবার জন্যে ওদের সাথে পরে এক সময় আমরাও যোগাযোগ করব।'

'চমৎকার আইডিয়া!' খুশি হয়ে উঠল অফিসার। কিন্তু এরপর যা বলল, শুনে খুশি হতে পারল না রানা। 'উপকূলের এই অংশে আরও দিন দুই থাকছি আমি, কাজেই তেল আবিবের দিকে রওনা হবার আগে আর একবার এসে অ্যামফোরাটা নিয়ে যাব। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই!'

রানার দিকে পিছন ফিরল উবে, লিলির হাত ধরে চুমো খেল তাতে। বলল, 'সিনোরিনা, আপনার সাথে আবার দেখা হবে জেনে মনে শান্তি পেলাম।' বলে আর দাঁড়াল না সে, বা পেছন ফিরে রানার দিকেও তাকাল না, সোজা নেমে গেল পেট্রলবোটের ডেকে। লাইন খুলে ছুঁড়ে দিল বনেটি আর ওটেলিয়ো, দিক বদলে এগোতে শুরু করল লঞ্চ। দুই বোনের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা, হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

এতক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল সলোজা। 'কি বুঝলে, রানা?'

'কাজ হয়েছে,' বলল রানা। 'আপাতত পেট্রল বোট নিয়ে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই।'

রানার কথাও শেষ হলো, সাথে সাথে তীরে দেখা গেল জজবার ফোর্ড ট্রাক। জলপাই গাছের ঝোপের কাছে থামল সেটা।

তিন

সাগর এবং মরুভূমির মাঝখানে বিস্তীর্ণ একটা এলাকা রয়েছে ইসরায়েলে; যেখানে সবুজ ঘাস, ফসল ভরা ক্ষেত-খামার এবং ফল-ফুলের গাছ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদমোরের উপকূল অংশে এসব কিছু নেই, যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু পাথর আর কঠিন পাথর। যেখানে পাথর নেই সেখানে আছে বালি। ধূ ধূ মরুভূমি।

ট্রাকের পেছনে রয়েছে জালুচি আর ওটেলিয়ো, সামনে জজবার পাশে রানা।

আগের চেয়ে আরও শুকনো লাগছে জজবার চেহারা। সারাটা পথ একটাও কথা বলেনি সে। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ছাড়া তার কাছ থেকে অন্য কোন শব্দ পায়নি রানা।

মেঠো পথটা ধরে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে এসেছে ওরা। পথের পাশে এরপর পড়ল রেল লাইন। প্রশ্ন করায় এই প্রথম মুখ খুলল জজবা। জানা গেল, মিলিটারি ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করে না এই রেল লাইন। আরও কয়েক মাইল পর পথের পাশ থেকে সরে গেল রেল লাইন, হারিয়ে গেল পাহাড় শ্রেণীর আড়ালে।

মিনিট দশেক পর মেঠো পথ ছেড়ে সরু একটা পাথুরে উপত্যকায় চলে এল ওরা। খানিক দূর এগিয়ে ট্রাক দাঁড় করাল জজবা, বলল, 'এবার হাঁটতে হবে।' রানার দিকে না তাকিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল সে।

তাকে অনুসরণ করে উপত্যকার শেষ প্রান্তে চলে এল ওরা। সরু একটা গিরিপথের ভেতর দিয়ে খানিকদূর এগিয়ে কাঁটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল জজবা। আশপাশে কেউ না থাকলেও, ফিসফিস করে কথা বলল সে, 'সাবধান! খুব সাবধান! কারাগারের কাছে চলে এসেছি আমরা! খুব কাছে!'

মাথা নিচু করে এগোল রানা, সামনের ঝোপের ভেতর ঢুকে চোখে বিনকিউলার তুলল। সাথে সাথে লাফ দিয়ে চোখের সামনে চলে এল কারাগারের ফটক। মাত্র একশো গজ দূরে।

রাস্তার শেষ প্রান্তে দেখা গেল ময়লা আর ছেঁড়া ফাটা কাপড় পরা একদল কয়েদীকে। তাদের সামনে আর পেছনে প্রহরী। কয়েদীদের প্রত্যেকের পায়ে লোহার বেড়ী, হাতে একটা করে কোদাল। রাস্তা পেরিয়ে পাহাড়ের বাঁকে হারিয়ে গেল তারা।

আচমকা শোনা গেল তীক্ষ্ণ হুইসেলের আওয়াজ। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল একটা রেলওয়ে ইঞ্জিন। কয়েকটা বক্সকার টেনে নিয়ে আসছে।

এটা একটা স্টীম ইঞ্জিন। খুঁটিয়ে দেখল রানা। কারাগারের প্রধান ফটকের সামনে থামল সেটা। ফটক খুলে বেরিয়ে এল একদল সৈনিক। বক্সকার থেকে আরোহীরাও নেমে পড়ল, ট্রেনের পাশে সার বেঁধে দাঁড়াল তারা। আরোহীদের মধ্যে লোহার বেড়ী পরা কয়েকজন কয়েদী রয়েছে, বাদ বাকি সব সৈনিক।

ফটক খুলে বেরিয়ে আসা সৈনিকরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে সার্চ শুরু করল। একদল সার্চ করল ট্রেন, আরেক দল আরোহীদের। সবশেষে পায়ে হেঁটে ফটক পেরোল আরোহীরা, শেষ লোকটাকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকল ট্রেন। ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়া হলো ফটক।

'মেয়েদের বেলায় কি করা হয়?' জানতে চাইল রানা।

ইঙ্গিতে প্রধান ফটকের গায়ে ছোট দরজাটা দেখাল জজবা। 'ওটার ভেতর দিয়ে একজন একজন করে গলতে হয় মেয়েদের। আজ রাতে আমার সাথে তেতাল্লিশটা মেয়ে থাকবে…'

'চুয়াল্লিশ,' বলল জালুচি। 'আমাদের দলের মক্ষিরাণীর কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?'

জালুচির দিকে ফিরল ওটেলিয়ো। চোখ গরম করে বলল, 'মুখ সামলে কথা

বলো। ফের যদি আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি মারার চেষ্টা করো, ঘুসি মেরে সব ক'টা দাঁত ফেলে দেব আমি তোমার!'

'আহা, চটো কেন! আমি তো···' আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল জালুচি, ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল রানা।

'চোপ!' বলল ও। 'আমাদের কারও সাথে লাগতে এসো না, জালুচি। তুমি বাড়াবাড়ি করলে অপারেশন বাতিল করব আমি।'

চেহারা গম্ভীর করে তুলে চুপ করে থাকল জালুচি।

ট্রাকে ফিরে এল ওরা। এবারও ড্রাইভিং সীটে বসল জজবা। ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চলল সে। কিন্তু আবার বাঁক নিয়ে মুয়ালার দিকে না ঘুরে সোজা এগিয়ে চলল। আরও সাত কি আট মাইল সামনে নাখাল। হাজার তিনেক লোকের আগোছাল একটা গ্রাম। অসংখ্য পাম গাছ, তার ভেতর যার যেখানে খুশি ঘর তৈরি করেছে। প্রায় সবগুলো বাড়ির দেয়াল হোয়াইট ওয়াশ করা। একটাই চওড়া রাস্তা, দু'পাশে দোকান-পাট।

হারবারটা ছোট, পানির কিনারা ঘেঁষে জজবার মদের দোকান। ভেতরটা এই দিন-দুপুরেও অন্ধকার, কিন্তু খদ্দেরের অভাব দেখা গেল না। পাঁচিল ঘেরা একটা উঠান ঘুরে দোকানের পিছন দিকে চলে এল জজবা। ট্রাক থেকে নামল সবাই। পিছনের গেট দিয়ে উঠানে ঢুকল ওরা। সেখান থেকে আরেকটা দরজা পেরিয়ে দোকানের পিছনের বাড়িতে চলে এল। কেউ কোথাও বেহালা বাজাচ্ছে, কিন্তু কাঁচা হাত, বারবার বেসুরো হচ্ছে। নিজের অফিস কাম লিভিং রুমে নিয়ে এসে ওদেরকে বসাল জজবা। আসবাবগুলো দামী, কিন্তু একটার সাথে আরেকটা মানায়নি। চোখ ঝলসানো, উৎকট গাঢ় রঙের ছড়াছড়ি চারদিকে। জানালার পর্দাগুলো উজ্জ্বল হলুদ, টকটকে লাল রঙের কার্পেট, বিছানার চাদরটা ঘন সবুজ।

ট্রেতে আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল হুইস্কি। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে পরিবেশন করল জজবা। নিজেও নিল, এবং সবার চেয়ে বেশি খেল।

'আপনাকে এখানে নিয়ে আসার কারণ,' রানাকে বলল সে, 'কারাগারে যে সব মেয়েকে নিয়ে যাই আমি তাদের দু'একজনকে নমুনা হিসেবে দেখানো। আসুন।'

রানাকে নিয়ে একদিকের দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল জজবা। শার্টার খুলল। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে একটা মদের দোকান দেখতে পেল রানা। ভেতরে অনেকগুলো মেয়েকে দেখা গেল। একঝলক দেখেই বোঝা যায়, দিনের পর দিন অত্যাচার ও অনাচারে বারোটা বেজে গেছে শরীরের। সস্তাদরের বারবনিতা এরা। রুক্ষ। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দৃশ্যটা জালুচিও দেখল।

'মাই গড!' আঁতকে উঠল সে। 'এদের মাঝখানে তোমাকে রূপকথার রাজকুমারী বলে মনে হবে, ওটেলিয়ো! তোমাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে সোলজারদের মধ্যে। ঢোকার পরপরই না প্রাণটা খোয়াতে হয় তোমাকে!'

সতর্ক হবার কোনরকম সুযোগ না দিয়েই জালুচির মুখ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক ঘুসি চালাল ওটেলিয়ো। মনে মনে জালুচির প্রশংসা না করে পারল না রানা। ঘুসিটা আসছে দেখে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে গেল সে, ঘুসিটা নাকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে

গেল, ছুঁতে পারল না। ঘুরে গিয়েই হিপ থ্রো করল জালুচি, ছিটকে ডেস্কের ওপর গিয়ে পড়ল ওটেলিয়ো। ডেস্কের গায়ে এক সেকেন্ড ঝুলে থাকল সে, তারপর কাঁচের অ্যাশট্রে আর গ্লাস নিয়ে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর। কিন্তু পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল সে। ইতিমধ্যে কাছে চলে এসেছে জালুচি। এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে পারবে ওটেলিয়ো, তা সে ভাবতে পারেনি, কাজেই একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। সুযোগটা পুরোপুরি নিল ওটেলিয়ো। ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে জালুচির তলপেটে গুঁতো মারল সে, একই সাথে চোয়ালে বসিয়ে দিল জোর ঘুসি।

সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল জালুচি। কিন্তু টলমল করছে শরীরটা। অবস্থা দেখে মনে হলো, দম ফুরিয়ে গেছে তার। কিন্তু ওটা যে তার একটা ফাঁদ, টের পেল না ওটেলিয়ো। আন-আর্মড কমব্যাটের সমস্ত কৌশল ভুলে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গেল সে, ঠিক এই সময় ঝপ্ করে তার ডান হাত ধরে মোচড় দিল জালুচি। হাতটা ভাঁজ হয়ে গেল কনুইয়ের কাছে, কনুই থেকে নিচের অংশ তার পিঠের সাথে সেঁটে ধরল জালুচি, তারপর ঠেলে নিয়ে এল পাঁচিলের গায়ে। পাঁচিলের সাথে প্রচণ্ড জোরে নাক-মুখ ঠুকে দিয়ে তাকে ছেড়ে দিল সে। মেঝেতে পড়ে গেল ওটেলিয়ো, আর উঠল না।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা ঘটনাটা ঘটতে পাঁচ কি ছয় সেকেন্ডের বেশি লাগেনি। বাধা দেবার সময় বা সুযোগ কোনটাই পায়নি রানা। ওটেলিয়ো পড়ে যাবার পর আবার তার দিকে জালুচি এগোতে শুরু করছে দেখে একটা হাত তুলে জালুচির বুকে থাবা বসাল ও, তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল ওটেলিয়োর পাশে।

মৃদু গোঙাচ্ছে ওটেলিয়ো। মাথা নাড়ছে। ভাঙা নাক থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। জজবার বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে জগ ভর্তি পানি আর ন্যাপকিন নিল রানা। নাকের ক্ষত ধুয়ে রক্তটুকু মুছে দিল ও। এক সেকেন্ড পরই চোখ মেলল ওটেলিয়ো, কিন্তু তার ঝাপসা দৃষ্টি দেখে বোঝা গেল, কয়েক মুহূর্ত আগের ঘটনা কিছুই স্মরণ করতে পারছে না সে। পরমুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠল চোখ দোড়া, দ্রুত উঠে বসার চেষ্টা করল সে। রানাকে বাধা দিতে হলো না, পাঁজরের কাছে তীব্র ব্যথা অনুভব করে ককিয়ে উঠল সে, শুয়ে পড়ল আবার। বুকের নিচে বাঁ দিকটা খামচে ধরল। বোঝা গেল, পাঁজরের একটা কি দুটো হাড়ে চিড় ধরেছে।

মুখ তুলে জালুচির দিকে তাকাল রানা। 'শুয়োর! কি সর্বনাশ করেছ বুঝতে পারছ?'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জালুচি। জোর করে হাসতে চেষ্টা করল সে। 'তোমাকে বোকা বানাচ্ছে ও, রানা! কিছুই হয়নি, সবটাই ওর ভান!'

ওটেলিয়োর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ। জজবার দিকে ফিরল রানা। 'কাছাকাছি কোন ডাক্তার আছে?'

'আছে,' দ্রুত বলল জজবা। 'লোক পাঠাচ্ছি।'

ডেস্কের কিনারায় বসল জালুচি। উদ্বিগ্ন, নার্ভাস দেখাল তাকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসল রানা। অপেক্ষা করা ছাড়া করার কিছু নেই এখন।

বিশ মিনিট পর ডাক্তারকে পথ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে এল জজবা। ডাক্তারের মাথা জোড়া টাক, মানুষটা ছোটখাট, পরনে ব্রাউন কালারের গ্যাবার্ডিনের স্যুট। ওটেলিয়োকে একটা ইঞ্জেকশন দিল সে, পরীক্ষা করে বলল, পাঁজরের দুটো হাড়ে চিড় ধরেছে। বুকের একটা অংশ স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিল সে, জানাল, নাকের জন্যে কিছুই করার নেই তার। এর জন্যে এক্সপার্ট সার্জন দরকার। কয়েকটা পেইন কিলার ট্যাবলেট দিল সে। তারপর জজবার কাছ থেকে ফি নিয়ে চলে গেল।

জালুচির গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করল রানার, কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হবে না ভেবে ক্ষান্ত হলো ও। দুশ্চিন্তায় চেহারাটা কালো হয়ে গেছে জজবার।

'কি হবে এখন, স্যার?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে। 'সব রেডি করে রেখেছি, এই সময় এ কি ঘটল!' হঠাৎ তার চোখের দৃষ্টিতে আশার আলো জ্বলে উঠল। 'বোধহয় অপারেশনটা বাতিল করতে হবে, তাই না, স্যার? হ্যাঁ, তাছাড়া আর উপায় কি!' জিভ আর টাকরা সহযোগে চুক-চুক আওয়াজ করল সে। 'এত আয়োজন, এত মাথা ঘামানো, সব ভেস্তে গেল!'

'আপাতত মুয়ালায় ফিরে যাচ্ছি আমরা,' বলল রানা। 'ওখানে গিয়ে ঠিক করব কি করা হবে। মাথা ঘামানোর দায়িত্বটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। এসো, সাহায্য করো।'

জজবার সাহায্য নিয়ে ওটেলিয়োকে ট্রাকে তুলল রানা। সেই থেকে চুপ করে আছে জালুচি, চেহারায় অপ্রতিভ একটা ভাব। ঘটনাটার তাৎপর্য অনুধাবন করে ভয়ে কুঁকড়ে গেছে সে। ট্রাকের সামনের অংশে তোলা হলো ওটেলিয়োকে। তার পাশে বসল রানা। কারও সাথে কথা না বলে ট্রাকের পেছনে উঠল জালুচি।

রানাকে অবাক করে দিয়ে অত্যন্ত দ্রুত আঘাতটা সামলে উঠছে ওটেলিয়ো। অবশ্য পেইন কিলার ট্যাবলেটগুলোর অবদানই সবচেয়ে বেশি। মুখে জোর করে একটু হাসি টেনে বলল সে, 'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না, মি. রানা। তেমন কিছু হয়নি আমার। ঠিক হয়ে যাব।'

ধরাধরি করে ফরওয়ার্ড র‍্যাঙ্কে শুইয়ে দেয়া হলো ওটেলিয়োকে। তার দেখাশোনার ভার লিলির ওপর দিয়ে সেলুনে চলে এল রানা। হাতের তালুতে মুখ ঠেকিয়ে চেয়ারে বসে আছে সলোজা, সামনে মদের বোতল আর গ্লাস। চেহারাটা থমথম করছে। রানাকে দেখেই মুখ থেকে হাত নামাল, শিরদাঁড়া খাড়া করে জানতে চাইল, 'কি হবে এখন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি না। বলছে, একসাথে অনেকগুলো পেইন-কিলার ট্যাবলেট খেলে ও নাকি কাজটা চালিয়ে নিতে পারবে।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'কিন্তু আমার তা মনে হয় না। তাছাড়া, মুখটা লুকাবে কিভাবে? সন্ধের মধ্যে ওটা এমন ফুলবে, মনে হবে নাকের ওপর আরেকটা নাক গজিয়েছে। চেনাই যাবে না ওকে।'

দাঁতে দাঁত ঘষে জালুচির দিকে ফিরল সলোজা। 'শালা বুড়বাক! জুতিয়ে

তোমার পিঠের চামড়া তুলে নিলেও আমার গায়ের ঝাল মিটবে না। এমন সর্বনাশ কেউ করে! কি হবে এখন! রশি টানার জন্যে ভেতরে কেউ না থাকলে গোটা অপারেশন বাতিল করে দিতে হবে!'

দোরগোড়ায় দেখা গেল লিলিকে। কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তাকে বাধা দিল রানা। 'জানি কি বলতে চাও। কিন্তু তা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়?' শান্ত কিন্তু দৃঢ়তার সাথে জানতে চাইল লিলি। 'কঠিন বাস্তবকে এড়িয়ে গিয়ে লাভ নেই, রানা। ওটেলিয়ো ছাড়া দলে আর কেউ নেই যাকে তোমরা মেয়েগুলোর সাথে জেলখানার ভেতর পাঠাতে পারো। ওটেলিয়ো বাদ। কাজেই আমাকেই যেতে হয়।'

'না,' বলল রানা। 'তোমার কাজ নয় এটা।'

কিন্তু কথাটা বলেই লক্ষ্য করল ও সলোজা কোন মন্তব্য না করে চুপ করে আছে। লিলির দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে সলোজা, তার পিছনে ভুরু কুঁচকে বেঞ্চের ওপর বসে আছে জালুচি।

'ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে দেখো, লিলি,' বলল সলোজা। 'ভেতরে ঢুকে কি কি করতে হবে, সে-সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে তোমার?'

'আছে।'

'ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে সাধারণ কোন সৈনিক বা অফিসার তোমাকে দখল করবে। যেভাবে হোক তার হাত থেকে রেহাই পেতে হবে তোমার। তারপর সোজা চলে যেতে হবে দক্ষিণ পাঁচিলের দিকে।'

'ওখানে দু'জন সেন্ট্রি আছে,' বলল রানা। 'অসম্ভব, সলোজা! লিলি কোন চান্সই পাবে না।'

'পাবে না বলছ কেন?' বলল সলোজা। 'হাতে রিভলভার থাকলে অনেক অসাধ্য সাধন করা যায়। তোমাদের সাথে আমাকেও অবশ্য ভেতরে ঢুকতে হবে, অতিরিক্ত আরও একজন লোক দরকার হবে তোমাদের।'

'নিজের ওপর বিশ্বাস আছে আমার,' বলল লিলি। 'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? এতদূর এসে ফিরে যাবার তো কোন মানে হয় না!' দ্রুত এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল সে। একটা হাত ধরল। 'তুমি আর না বোলো না, প্লীজ! পারব, আমি জানি। দেখো!'

আবার মাথা নাড়ল রানা। 'ভেতরে ঢোকার সময় কি ঘটবে, সেটা একমাত্র আল্লাই জানে! তারপর দু'জন সেন্ট্রি···! উঁহুঁ, এতে আমি মত দিতে পারি না!'

অথচ পরমুহূর্তে মনে হলো রানার, নেহায়েত বাজে বকছে সে। কাজেই আমাকেই যেতে হয়—লিলির এই কথাটাই ঠিক। আর কোন বিকল্প নেই ওদের সামনে।

'তোমার আপত্তিটা কোত্থেকে আসছে, রানা?' শান্তভাবে জানতে চাইল লিলি, 'মন, নাকি মাথা থেকে?'

এই প্রশ্নের একটাই উত্তর থাকতে পারে, অন্তত তাই মনে হলো রানার, কাজেই জজবার দিকে ফিরে বলল ও, 'ঠিক আছে। আগের প্ল্যানই বহাল থাকল।

শুধু ওটেলিয়োর বদলে কারাগারে নিয়ে যাবে তুমি লিলিকে।'

চোখ বুজে ছিল জজবা, বোধহয় মনে মনে প্রার্থনা করছিল, অপারেশনটা যেন বাতিল করা হয়। রানার কথা শেষ হতেই চোখ মেলল সে, হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা, তারপর প্রায় কেঁদে ফেলার মত ভঙ্গি করে জানতে চাইল, 'ওখানে কতখানি বিপদ হতে পারে জেনেও একটা মেয়েকে পাঠাবেন, স্যার?' শেষ চেষ্টা করে দেখছে সে অপারেশনটাকে বাতিল করা যায় কিনা। ইঙ্গিতে লিলিকে দেখাল। 'ওনার যা রূপ, কর্নেল খানজুমের চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই। সারারাত এক মুহূর্তের জন্যেও কাছছাড়া করবে না ওনাকে···'

'এসব ব্যাপারে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না,' ধমকের সুরে বলল রানা। 'মেয়েদের কারাগারে নিয়ে যাবার ব্যাপারে কি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছ, তাই বলো।'

'ঠিক আছে, স্যার!' অনেকটা অভিমানের সুরে বলল জজবা। 'আপনি যা বলেন! দুটো ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হবে ওদেরকে। পিছনের ট্রাকটা আমি চালাব। এখানে, দোকানের সামনে ট্রাক থামাব আমি, মিস লিলি উঠে পড়বেন। ন'টার সময় ওদেরকে ডেলিভারি দেব আমি।'

'আমি তৈরি হয়ে থাকব,' বলল লিলি।

হতাশ ভঙ্গিতে আবার মাথা নাড়ল জজবা। 'এর নাম স্রেফ পাগলামি! উদ্ভট পাগলামি!' রানা চটে উঠল কিনা দেখার জন্যে ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফেরাল সে। 'আমি এবার যেতে পারি, স্যার?'

জজবাকে জেটি পর্যন্ত পৌঁছে দিল রানা। ফেরার পথটা পেরুতে প্রচুর সময় নিল ও। ব্যাপারটা নিয়ে যতই চিন্তা করল ততই খারাপ লাগতে লাগল ওর। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও ভুলল না, এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

চার

বিকেলের বাকি সময়টা তৈরি হবার পেছনে ব্যয় করল ওরা। ইউনিফর্ম কোন সমস্যার সৃষ্টি করল না, কারণ ইসরায়েলি সেনাবাহিনী যে-ক'ধরনের ইউনিফর্ম ব্যবহার করে তার সবগুলো যোগাড় করে নিয়ে এসেছে সলোজা। এই সময় ইসরায়েলি আর্মি, দুনিয়ার প্রায় সব প্যারা-মিলিটারি অর্গানাইজেশনের মত, ক্যামোফ্লেজড ব্যাটলড্রেস এবং আফ্রিকা ক্যাপ ব্যবহার করছে। গোটা ইউনিফর্মেই অমঙ্গলের একটা ছাপ আছে।

ওদের প্রত্যেকের ভাগে একটা করে মার্কিন এ-কে অ্যাসল্ট রাইফেল এবং বেল্টের খোপে ঢোকানো অতিরিক্ত একশো আশিটা করে রাউন্ড পড়ল। শুধু রানা পেল একটা স্টেচকিন মেশিন-পিস্তল। তিনটে করে গ্রেনেড পেল প্রত্যেকে। এছাড়া ওদের সাথে থাকল দুশো ফিট ক্লাইম্বিং রোপের এক জোড়া কয়েল।

ওটেলিয়োর পোশাক পরবে লিলি। তৈরি হবার জন্যে কাপড়চোপড় নিয়ে আফটার কেবিনে চলে গেল সে। ঢিলেঢালা একটা মিনি ড্রেস, সামনে থাকবে

একটা স্মোক। আফটার কেবিনে ঢুকে রানা দেখল, ওর জন্যে অপেক্ষা করছে লিলি। মিনি ড্রেস পরার আগে তার কোমরে দুশো ফিট সরু নাইলনের রশি পেঁচিয়ে দিল রানা। রশির শেষ প্রান্তে একটা ইলেকট্রিক টর্চ বেঁধে নেবে লিলি। দুর্গ প্রাচীর থেকে রশির সাথে এই টর্চটাও নামিয়ে দেবে সে, খাড়া পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে টর্চের আলো দেখে বুঝতে পারবে ওরা ঠিক কোথা দিয়ে নামছে রশিটা।

প্রস্তুতি পর্বে এতটুকু উত্তেজিত হলো না লিলি। ফুল লোড করা চার ইঞ্চি সাইলেন্সারসহ সেসকা অটোমেটিক নিয়ে সলোজা যখন কেবিনে ঢুকল, তখনও সম্পূর্ণ শান্ত থাকল সে। অটোমেটিকটা লিলির হ্যান্ডব্যাগে ভরে দিল সলোজা। তারপর পকেট থেকে বের করল একটা ছুরি আর খানিকটা সার্জিক্যাল টেপ।

'তোমার উরুতে বেঁধে দেব ছুরিটা,' লিলিকে বলল সে। 'এটা যে তোমার সাথে আছে, তা কিন্তু ভুলে যেও না। নাও, কাপড় তোলো।'

হাসি চেপে সলোজার হাত থেকে ছুরিটা নিল লিলি, বুড়ো আঙুল দিয়ে বোতামে চাপ দিতেই ধারাল পাতটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। শিউরে উঠল লিলি। 'অসম্ভব!'

'কি অসম্ভব?' দ্রুত জানতে চাইল সলোজা।

'এই ছুরি···এই ছুরি···' ভয়ে চোখ বুজল লিলি, দ্রুত মাথা নাড়ল, '···এই ছুরি আমি কারও গায়ে বেঁধাতে পারব না!'

'রাজি হবার পর এখন আর সে-কথা বললে হবে কেন!' চটে উঠে বলল সলোজা।

চোখ মেলে রানার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল লিলি। 'কিন্তু···রানা, ছুরি ব্যবহার করতেই হবে, তোমারও কি তাই ধারণা?'

উত্তর দিল সলোজা, 'কারাগারে ঢোকার পর আবার আমাদের সবাইকে তুমি দেখতে চাও, নাকি চাও না? যদি চাও, তাহলে কোন রকম ইতস্তত করা চলবে না।' ছুরিটা লিলির উরুতে বেঁধে দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কাপড়চোপড় পরা শেষ করে মাথায় চিরুণী বুলাল লিলি। রানা ওকে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে বুঝতে পেরে একটু হেসে জানতে চাইল, 'কি দেখছ?'

'ভাবছি তোমাকে দেখে কর্নেল খানজুমের কি অবস্থা হবে,' বলল রানা। 'কর্নেল যে আর কাউকে তোমার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবে না এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

একটু আগে ভয় পেয়ে থাকলেও, সেটা কাটিয়ে উঠেছে লিলি। 'হাজার হোক অফিসার,' বলল সে, 'সাধারণ একজন সৈনিকের হাতে পড়ার চেয়ে তার হাতে পড়া অনেক ভাল। কি ঘটবে না ঘটবে তা যখন ঘটবে তখন দেখা যাবে। ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করি না।'

'তোমার ভয় করছে না, সত্যি?' যতটা না কৌতূহল তারচেয়ে বেশি উদ্বেগ প্রকাশ পেল রানার সুরে।

অবাক দেখাল লিলিকে। 'না!'

'ভেরি গুড!'

এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল লিলি। রানার শার্টের একটা বোতাম দু'আঙুলে নাড়তে নাড়তে বলল, 'কাজটা যদি পারি আমি, তাতে কি আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে, রানা?'

'ওসব আমি ভুলে গেছি, লিলি,' বলল রানা।

চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল লিলির। 'ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।' রানা কিছু বলতে যাচ্ছে লক্ষ্য করে বাধা দিল সে। 'থাক, তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাই না। কিন্তু একটা কথা তোমার পরিষ্কার জানা দরকার। মারানজানা, বা তার ছেলের জন্যে ঝুঁকিটা নিচ্ছি না আমি। নিচ্ছি কিটির জন্যে।'

লিলির হাত ধরে সেলুনে ফিরে এল রানা। কেউ কিছু বলল না, তবে সবাই তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। অপর দরজা দিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ডিঙিতে নামছে দু'জন, এই সময় ডেকে বেরিয়ে এল জালুচি।

রেলিঙে ভর দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। খানিক ইতস্তত করে বলল, 'দেখো, রানা; যা ঘটে গেছে তার জন্যে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। ঠিক আছে?'

'ও, তুমি বুঝি তাই মনে করো, জালুচি?' ঝাঁঝের সাথে বলল লিলি। 'দুঃখ প্রকাশ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে?'

'জাহান্নামে যাও!' বলে ঘুরে দাঁড়াল জালুচি, হন হন করে হেঁটে চলে গেল।

মোটর স্টার্ট দিয়ে ডিঙি ছেড়ে দিল রানা। তীরের দিকে ছুটে চলল ডিঙি।

জজবার বন্ধুর দোকানের পাশে ট্রাকের অপেক্ষায় ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা। খানিক পরই ইঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া গেল। রাস্তাটা অন্ধকার, তবু আলো জ্বালেনি জজবা। ট্রাকটা দোকানের পাশে এসে থামল। ভেতর থেকে চেঁচামেচি আর বেসুরো গলার গান ভেসে আসছে।

'এখনও সময় আছে, লিলি,' বলল রানা। 'ভেবে দেখো।'

এই প্রথম চটে উঠল লিলি। মুখে কিছু বলল না বটে, কিন্তু তেড়ে এল রানার দিকে। কাছে এসে তার মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল। হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল রানার গলা, চুমো খেল ওর ঠোঁটে। পরমুহূর্তে সরে গেল রানার কাছ থেকে।

'মরে গিয়ে যদি ফাঁকি দাও আমাকে, তোমাকে আমি ক্ষমা করব না,' বলল রানা।

ঠাট্টাটা তেমন জুৎসই হলো না, বিশেষ করে এই রকম একটা পরিস্থিতিতে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লিলি, একটা চুমো ছুঁড়ে দিল বাতাসে। একটু হাসল। তারপর হন হন করে এগোল ট্রাকের দিকে।

ট্রাকের ভেতর থেকে একটানা হৈ চৈ, শোরগোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার, মেয়েগুলো মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। নেশা না করে ওদের বোধহয় কোন উপায়ও নেই। লিলির কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। ওদের সাথে নিজেকে মেশাবে কিভাবে ও?

ট্রাকে উঠে জজবার পাশে বসল লিলি। সাথে সাথে ট্রাক ছেড়ে দিল জজবা। দেখতে দেখতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রাক। এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল ইঞ্জিনের আওয়াজ। তারপর আর কিছু শুনতে পেল

না ও। মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল ও।

ভিরোমায় পৌঁছে রান্না দেখল, ওর জন্যে ডেকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে সলোজা, বনেটি আর জালুচি। সবার পরনে ব্যাটল-ড্রেস। ইকুইপমেন্ট লোড করার নির্দেশ দিয়ে পোশাক পাল্টাবার জন্যে নিচে নেমে এল রানা। আবার অনেকদিন পর সামরিক পোশাক পরছে ও। মনে পড়ল, এক সময় এই পোশাক পরার সময় গর্বে ভরে উঠত ওর বুক।

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে আসার সময় লিলির কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল রানা। মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে চাইল ও যে সবচেয়ে আগে লিলি নয়, কিটির নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে ওকে। দু'জনের মধ্যে কিটিই বেশি অসহায়।

ওরা সবাই ডিঙিতে উঠে অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। মৃদু ভট ভট আওয়াজ করছে আউটবোর্ড মোটর। ওদের পাশে নামল রানা। ওদেরকে বিদায় দেবার জন্যে কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছে ওটেলিয়ো, রেইলের কাছে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল সে।

রওনা হলো ওরা। দুই বোনের মাঝখান দিয়ে খোলা সাগরে গিয়ে পড়ল ডিঙি। গোটা চাঁদ থাকার কথা আকাশে, প্ল্যানিং পর্যায়ে ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বেগ বোধ করেছিল রানা, কিন্তু ওদের সাথে সহযোগিতা করছে আবহাওয়া—হালকা মেঘের আড়াল থেকে একবারও উঁকি দিল না চাঁদ। একটু পরই ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো, তার সাথে ধোঁয়াটে কুয়াশা তো আছেই, কয়েক গজের বেশি সামনে কিছু দেখা যায় না।

তীর থেকে আধ মাইলটাক দূরে থাকল ওরা। এর ফলে তীর থেকে ওদেরকে দেখে ফেলার আশঙ্কা কম, আবার তীরের এত কাছাকাছি মাছ ধরার কোন নৌকোর সাথে দেখা হয়ে যাবার ভয়ও নেই। কিন্তু এতে করে ঠিক কোন্ দিকে যাচ্ছে ওরা তা বোঝা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াল। অন্ধের মত আন্দাজে বোট চালিয়ে যাচ্ছে রানা।

পৌঁছুতে আর বেশি দেরি নেই অনুমান করে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। বৈঠা বাইতে শুরু করল ওরা।

কয়েক মুহূর্তে উৎকণ্ঠায় থাকার পর রানার মনে হলো, ভুল করে বসেছে ও। ইঞ্জিন বন্ধ করার ফলে ঢেউয়ের দোলায় টালমাটাল অবস্থা ডিঙির, যেদিকে কাত হয়ে পড়ছে সেদিক থেকেই হুড়হুড় করে পানি উঠছে।

এক জোড়া করে বৈঠা নিয়ে প্রাণপণে টানছে সলোজা আর জালুচি। তাতেও তরী সামলানো কঠিন হয়ে উঠেছে। চার্টে দেখা কারেন্টের কথা মনে পড়ে গেল রানার, এদিকে এই সময় ফোর অথবা ফাইভ নট বেগে স্রোত বইছে।

দূরে পরিষ্কার আভাস পাওয়া গেল তীরের। সাদা ফেনার লম্বা একটা রেখা, অন্ধকারেও দেখা যায়। ঠিক এই সময় এক মুহূর্তের জন্যে মেঘের কোল থেকে উঁকি দিল চাঁদ, তার আলোয় পাহাড়ের ওপর দুর্গটাকে দেখতে পেল রানা পরিষ্কার। গুড় গুড় করে উঠল বুকের ভেতরটা।

স্রোতের মধ্যে পড়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে ডিঙি। কোনরকমে ভেসে থাকার

চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করার নেই ওদের। হুঙ্কার ছেড়ে ডিঙির ওপর চড়াও হচ্ছে একের পর এক ঢেউ। যে কোন মুহূর্তে ভরাডুবি ঘটতে পারে। তীরের কাছাকাছি মাথাচাড়া দিয়ে থাকা পাথরের চাঁইয়ের ওপর আছড়ে পড়ে প্রচণ্ড শব্দে ভাঙছে ঢেউ। আচমকা একটা পাথরের সাথে ঘষা খেল ডিঙি, নিমেষের মধ্যে এক পাক ঘুরে গেল সেটা। একটা বৈঠা ছুটে গেল জালুচির হাত থেকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করল ওরা। নোংরা ফেনা টগবগ করে ফুটছে ওদের চারদিকে। মনের চোখ দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, তীরে পৌঁছুবার আগেই ডুবে যাচ্ছে তরী।

আচমকা চিৎকার করে উঠল বনেটি। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল রানা। ধেয়ে আসছে বিশাল একটা ঢেউ। মনে মনে প্রমাদ গুণল রানা। বুঝল চরম আঘাতটা এড়ানো গেল না। এই নয় ফুট উঁচু ঢেউয়ের হাতেই সব শেষ হতে যাচ্ছে।

কিন্তু ঘটল উল্টোটা। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে পাথরের চাঁইগুলোর ওপর দিয়ে একেবারে তীরের ওপর চলে এল ডিঙি। কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল ডিঙি থেকে। পরমুহূর্তে দেখা গেল ওরা সবাই ডিঙিটাকে টেনে তুলে আনছে শুকনো ডাঙায়। আরও একটা উঁচু ঢেউ ছুটে এল। ওদের সবার হাঁটুতে এসে আছাড় খেল সেটা, যেন আবার ওদেরকে সাগরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। ঢেউটা দ্রুত পিছিয়ে যেতেই আবার কাজ শুরু করল ওরা। শুকনো ডাঙায় পৌঁছে ঘন ঘন হাঁপাতে শুরু করল সবাই।

কয়েক সেকেন্ড পর তাগাদা দিল রানা। ডিঙিটাকে আরও খানিক ওপরে তুলে সৈকতে নিয়ে এল ওরা। ঝুরঝুরে বালির ওপর বসে পড়ল সবাই। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায় পাহাড়ের পাদদেশ।

'মেরীর ছাওয়াল আমাদের নিজ হাতে বাঁচাল,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সলোজা। 'ইস, ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছি।'

বেসুরো শোনাল জালুচির হাসিটা। 'আমরা সবাই বুঝি শুকনো আছি?'

'শেষ পর্যন্ত যে পৌঁছেছি, সেটাই ভাগ্য!' বলল রানা।

ডিঙির রাকস্যাক থেকে একটা থার্মোস ফ্লাস্ক বের করল সলোজা। সেটা সবার হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। অন্ধকার আর বৃষ্টির মধ্যে দুর্গ প্রাচীরের দিকে তাকাল রানা। এক জোড়া আলো দেখা গেল শুধু, প্রাণের কোন চিহ্ন বা সাড়া নেই কোথাও।

'ন'টার সময় ডেলিভারি দেয়া হয়েছে লিলিকে,' বলল জালুচি। 'এখন দশটা তার মানে কারাগারের ভেতর ঘণ্টাখানেক ধরে রয়েছে লিলি। কি করছে ও? এতক্ষণেও দক্ষিণ পাঁচিলের কাছে পৌঁছুতে পারেনি?'

'পৌঁছুবে,' বলল রানা। 'আরেকটু সময় দাও ওকে।'

মাথা নাড়ল জালুচি। 'আশা করে লাভ নেই, রানা। এক ঘণ্টার মধ্যে যখন পৌঁছুতে পারেনি, তার মানে ধরা পড়ে গেছে ও। অথবা আসতে গিয়ে কারও চোখে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছে। ওর দ্বারা যে হবে না, এ আমি আগেই জানতাম।'

'রানা।' হঠাৎ চাপা গলায় গর্জে উঠল সলোজা।

'কি হলো?'

'বুড়বাক জালুচিকে চুপ থাকতে বলে দাও, তা না হলে শালার মাথা ফাটিয়ে দেব আমি!'

'সলোজা, অনেক সহ্য করেছি···,' রেগেমেগে শুরু করল জালুচি, কিন্তু শেষ করতে পারল না।

বাধা দিয়ে সলোজা বলল, 'লিলিকে দেখে যাই মনে হোক, তোমার চেয়ে পুরুষালি গুণ তার একটু বেশিই আছে। একটু অপেক্ষা করো, দেখো কেমন চমকে দেয় তোমাকে।'

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল জালুচি। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে একটা ঝুল পাথরের নিচে সরে এল রানা। সিগারেট ধরাল। ভিজে কাপড়ে ঠাণ্ডা লাগছে ওর। লিলির কথা ভেবে ওরও যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু নিজেকে বারবার এই বলে অভয় দিচ্ছে ও, লিলি পারবে।

'কি যে ঘটছে ওর ভাগ্যে, একমাত্র যীশুই বলতে পারে!' বিড়বিড় করে বলল বনেটি।

ধীরে ধীরে সময় বয়ে যাচ্ছে। সাগরের একটানা গর্জন অসহ্য লাগছে রানার কানে। খানিক পর পর বসার ভঙ্গি বদল করছে ও। কিছুই ঘটছে না। বয়েই চলেছে সময়। লাইটার জ্বেলে রিস্টওয়াচ দেখল ও। বারোটা।

নগ্ন সত্যটা প্রকট হয়ে উঠছে এবার। লিলি যে ব্যর্থ হয়েছে, তাতে বোধহয় আর কোন সন্দেহ নেই। স্থির পাথরের মত বসে আছে সলোজা, কিন্তু সে-ও মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে রানার দিকে বারবার তাকাতে দেখে।

সাড়ে বারোটার দিকে উঠে দাঁড়াল সলোজা। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর মৃদু গলায় বলল, 'লক্ষণ ভাল নয়, রানা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভাল নয়, সলোজা।'

পাঁচ

ক্যাবের ভেতর ডিজেলের ঝাঁঝ। সীটের ওপর এককালে গদি ছিল, এখন কাঠের ওপর শুধু টিনের পাত। গরমে দম আটকে আসার অবস্থা হলো লিলির। জজবার মত নির্লিপ্ত ড্রাইভার জীবনে কখনও দেখেনি ও। উঁচু-নিচু মেঠো পথের ওপর দিয়ে তুমুল গতিতে ট্রাক ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে। আরোহীদের বারোটা বাজছে, কিন্তু সেদিকে তার কোন খেয়ালই নেই। ট্রাকের পেছন থেকে মেয়েগুলো অশ্রাব্য খিস্তি করছে, কিন্তু মুখের ভাব দেখে মনে হলো, কিছুই যেন কানে ঢুকছে না তার। অকথ্য গালিগালাজ ইতালীয় ভাষায় যতটা জুৎসই ভাবে দেয়া যায় সেরকম আর কোন ভাষায় দেয়া যায় কিনা সন্দেহ। শুনতে শুনতে গা রিরি করে উঠল লিলির।

স্প্যানিশ, গ্রীক আর ফ্রেঞ্চ মেয়েলোকেরা পাত্তাই পাচ্ছে না ইতালিয়ানদের কাছে।

একসময় লিলির দিকে তাকাল জজবা। ড্যাশবোর্ডের আবছা আলোয় দেখা গেল তার সারা মুখ ঘামে ভিজে গেছে, আরও ম্লান হয়েছে চেহারা। 'বেজন্মা, বেজন্মা! পচা নর্দমা থেকে উঠে এসেছে। সিনোরিনা, আমার কথায় কান দিলেন না সিনর রানা। এখনও আমি মনে করি, এদের সাথে কারাগারে ঢোকা উচিত হচ্ছে না আপনার। আপনার রূপ থাকতে পারে, কিন্তু সৈনিকরা জানবে আপনিও এদের মত সস্তাদরের একটা···'

'থাক, থাক,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল লিলি। 'মেয়েগুলোকে যা তা বলছ যে, এরাই না তোমার আয়ের উৎস?'

খানিক চুপ করে থেকে কাঁধ ঝাঁকাল জজবা। 'ওদের কপাল ফাটা, সেটা আমার নয়, ওদেরই দোষ। তাছাড়া দুনিয়াটা কিভাবে চলবে তার নিয়ম কানুন আমি তৈরি করিনি, সিনোরিনা!'

লোকটার ওপর বিজাতীয় একটা ঘৃণা অনুভব করল লিলি, অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, 'এরা যদি সবাই একসাথে বেঁকে বসে? যদি তোমার কথামত সৈনিকদের মনোরঞ্জনে রাজি না হয়? কিংবা, এরা যদি তোমার সাথে বেঈমানী করে সৈনিকদের জানিয়ে দেয় যে তুমি আসলে ইসরায়েলের স্বার্থবিরোধী কাজ করছ?'

দ্রুত লিলির দিকে তাকাল জজবা। আতঙ্কে নীল হয়ে গেল চেহারা। জোর করে একটু হাসল সে। 'তা সম্ভব নয়, সিনোরিনা। ওদের যাবার কোন জায়গা নেই। আমেরিকানরা যাকে বলে, পথের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।'

আমিও কি তাই? ভাবল লিলি—পথের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি?

হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল লিলির। নিজের অজান্তেই একটা হাত চলে গেল উরুর ওপর। ছুরিটা স্পর্শ করে মনে সাহস আনার চেষ্টা করল সে। কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, সাধারণ একটা মেয়ে হয়ে কিভাবে সে সৈনিকদের বুকে ছুরি চালাবে? অসম্ভব! ভাবতে গেলেই মাথা ঘুরে উঠছে, ঝাপসা হয়ে আসছে সামনের দৃশ্য।

হঠাৎ খেয়াল হলো, তার দিকে বারবার আড়চোখে তাকাচ্ছে জজবা। একটু পরই বুঝল, তার মুখের দিকে নয়, জজবার দৃষ্টি ওর ফর্সা উরুর দিকে। মিনি স্কার্ট পরে থাকায় উরুর বেশির ভাগই নগ্ন, চোখ বুলাবার সুযোগ পেয়ে সেটা হাতছাড়া করছে না ইতর লোকটা। স্কার্টের কিনারা টেনে উরু দুটো ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল লিলি।

আগের চেয়ে বেশি ঘামছে জজবা। হলদেটে জিভের ডগা বের করে নিচের ঠোঁট চাটল বারবার। তার গায়ের বোঁটকা গন্ধে বমি পেল লিলির। আগের চেয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছে লোকটা। ক্রমশ নির্লজ্জ হয়ে উঠছে। কিছু একটা করা দরকার, তা না হলে সাহস বাড়তেই থাকবে। এক সময় তার চোখে তাকাল লিলি। কঠিন দৃষ্টিতে ফুটে উঠল চ্যালেঞ্জের ভাব। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল জজবা, স্বভাবসুলভ জোর করা হাসিটা দেখা গেল মুখে।

'হে হে, রূপই আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু, সিনোরিনা,' বলল সে। 'পেছনের

ড়াইনীগুলোর তুলনায় আপনি কোটিগুণ সুন্দরী। অন্ধকারে টর্চলাইটের মত জ্বলজ্বল করবেন ওখানে…'

'তাহলে উপায়?'

'আরব মেয়েরা বোরখা পরে, জানেন তো?' বলল জজবা। 'মাঝে মধ্যে দু'একটা আরব মেয়ে আমার হাতেও পড়ে। তারা বোরখা পরেই কারাগারে যায়। ইচ্ছে করলে আপনিও পরতে পারেন।'

'বোরখা?' অবাক হয়ে বলল লিলি। 'কিন্তু এখানে আমি বোরখা পাব কোথায়?'

'আছে,' হে হে করে হাসল জজবা। 'আপনার কথা ভেবেই একটা যোগাড় করে নিয়ে এসেছি। সীটের পেছনেই পাবেন।'

সাদা সিল্কের বোরখাটা সীটের পেছন থেকে টেনে নিয়ে উরুর ওপর ফেলে ভাঁজ খুলল লিলি। ওর হাত দুটো যখন ব্যস্ত ঠিক সেই সময় সুযোগটা নিল জজবা। বোরখার ভেতর একটা হাত গলিয়ে দিয়ে লিলির উরুতে চাপ দিল সে।

'সময় থাকতে পা দুটো ঢাকুন, সিনোরিনা,' মুখে কাঁপা কাঁপা হাসি নিয়ে বলল সে। 'তা না হলে অ্যাক্সিডেন্ট করব।'

সীটের পাশ থেকে হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিয়ে খুলল লিলি। অটোমেটিকটা বের করে মাজল চেপে ধরল জজবার বুকের পাশে। 'আর একবার আমাকে ছুঁয়ে দেখো,' শান্ত দৃঢ়তার সাথে বলল ও, 'শুধু একবার…'

হাতটা বিদ্যুৎগতিতে ফিরিয়ে নিল জজবা। রাস্তার একদিক থেকে আরেক দিকে ছুটে গেল ট্রাক। পিছন থেকে আরেক পশলা অশ্রাব্য গালিগালাজ ভেসে এল।

'সিনোরিনা, মাফ করে দিন!' চেহারা দেখে মনে হলো এই বুঝি কেঁদে ফেলল লোকটা। 'ভুল হয়ে গেছে! জীবনে কখনও আর এমন ভুল হবে না!' বাতাস লাগা পাতার মত কাঁপতে শুরু করল সে, তার ঘামের গন্ধ আরও তীব্র লাগল লিলির নাকে।

কোণের দিকে যথাসম্ভব সেঁটে বসল লিলি, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সেসকাটা ব্যাগে না ভরে হাতেই রাখল, বোরখার এক ভাঁজ নিচে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে, ওর ভাবনায় আসছে-যাচ্ছে রহস্যময় এক দুঃসাহসী পুরুষ—মাসুদ রানা। ভাবল, না জানি এই মুহূর্তে কোথায় আছে ও, কি ঘটছে ওর!

মুহূর্তের জন্যে মেঘের কিনারা থেকে উঁকি দিল চাঁদ, ম্লান আলোয় সাগর দেখা গেল। এবং তার পেছনে, অসংখ্য পাথরের চাঁইয়ের পরই আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদমোর দুর্গ।

মেঘের ভেতর আবার মুখ লুকাল চাঁদ। দুর্গটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে নিজের কাঁধ দুটো চেপে ধরল লিলি। শিউরে উঠল আতঙ্কে।

জজবা ব্রেক করার আগেই জানালা দিয়ে প্রথম ট্রাকটাকে দেখতে পেল লিলি, কারাগারের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ঠেলাঠেলি করে নিচে নামছে

মেয়েরা। ফটকের মাথার ওপর জোড়া ফ্লাডলাইট জ্বলছে, গোটা এলাকাটা দিনের মত উজ্জ্বল। ফটক বন্ধ। কিন্তু ফটকের গায়ের ছোট্ট দরজাটা খুলে দেয়া হয়েছে। দু'তিন জন ক্যামোফ্লেজড ইউনিফর্ম পরা সৈনিককে দেখল লিলি, খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক দানব, শার্টের আস্তিনে সার্জেন্টের স্ট্রাইপ। উরু নয় যেন ড্রাম, হাতির পা। তিন ইঞ্চি লম্বা কালো ঠোঁটের কোণে আশ্চর্য সাদা একটা সিগারেট ঝুলছে। ভাবের কোন প্রকাশ নেই চেহারায়, শুধু চোখ জোড়া ঘুরে-ফিরে মেয়েগুলোকে দেখছে।

'ওই পাহাড়টাই ওয়াকেম, সিনিয়র এন.সি.ও.' লিলিকে বলল জজবা। 'খবরদার, সিনোরিনা! ওর হাতে যেন পড়বেন না! ওর হাতে একবার পড়লে, আমরা আর আপনাকে চিনতে পারব না। নিন, তাড়াতাড়ি পরে নিন বোরখা। তারপর নেমে গিয়ে ট্রাকের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকুন।'

নেমে গেল জজবা। ট্রাকের পিছন থেকে তার চিৎকার ভেসে এল লিলির কানে। উত্তরে শোনা গেল ছাগল আর বিড়ালের ডাক। জজবাকে মোটেও গ্রাহ্য করে না মেয়েগুলো।

ট্রাকের ক্যাব থেকে নামার আগে আশপাশটা ভাল করে দেখে নিল লিলি। এদিকে নজর নেই কারও। নিচে নেমেই দ্রুত ট্রাকের উল্টোদিকের ছায়ায় চলে এল ও।

দ্বিতীয় ট্রাকের মেয়েরা মহা শোরগোল তুলে নামতে শুরু করল। এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, কনুইয়ের নাগালের মধ্যে পেলে সবাই সবাইকে গুঁতো দিচ্ছে, তার সাথে যোগ হয়েছে গালিগালাজ আর খিলখিল হাসি। মনে মনে শিউরে উঠে ভাবল লিলি, নরক গুলজার বোধহয় একেই বলে। ড্যাশবোর্ডের আলো নেভাবার অজুহাতে ক্যাবের উল্টোদিকে চলে এল জজবা।

'সিনোরিনা,' ফিসফিস করে বলল সে, 'মেয়েদের দলে ভিড়ে যান। তারপর অন্তর দিয়ে ডাকুন যীশু আর তার বাপকে। এই পরামর্শটুকু দেয়া ছাড়া আপনার জন্যে আর কিছুই করার নেই আমার।'

সম্পূর্ণ একাকী বিপদের মুখোমুখি হতে হবে বলেই বোধহয় নিজের মধ্যে আশ্চর্য একটা আত্মবিশ্বাস অনুভব করল লিলি। খানিক আগের ভীতিবোধ এখন আর নেই তার মধ্যে। শান্ত ভাবে বোরখার হুড নামিয়ে মুখটা ঢেকে নিল ও। ট্রাকের লেজের দিকে এগোল।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে জটলা করছে মেয়েরা, তাদের ভিড়ে মিশে গেল লিলি। সাথে সাথে উপলব্ধি করল, প্রায় সব মেয়েই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। কারও কারও বয়স কম, কিন্তু বুড়ির চেহারা। আবার বয়সে বুড়ি হয়েছে এমন মেয়েও আছে। শুধু তাই নয়, এদের বেশির ভাগই অসুস্থ, কোন না কোন রোগে ভুগছে। আরবের সংখ্যা খুবই কম, তবে ইটালিয়ান মেয়ে প্রচুর। কণ্ঠস্বর ও কথার টান শুনে ইটালির কোন্ অংশ থেকে এসেছে তারা তাও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না লিলির।

বিষাক্ত বলে মনে হলো মেয়েগুলোকে, তাদের ভেতর দিয়ে জটলার মাঝখানে চলে এল ও। কেউ ওর দিকে কোন খেয়ালই দিল না। ফটকের মাথায় দাঁড়ানো

সৈনিকদের হাতছানি দিয়ে ডাকতেই ব্যস্ত সবাই। হস্তিনী এক মেয়ে, মাথার চুল এত বেশি লাল যে বোঝাই যায় রঙ লাগিয়েছে, নেশার ঘোরে টলতে টলতে রেললাইনের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। উঠে বসার চেষ্টা করছে, এই সময় এগোতে শুরু করল মেয়েরা। পায়ের ধাক্কা খেয়ে বার বার মুখ থুবড়ে পড়তে লাগল সে।

সুযোগটা দেখতে পেয়ে সাথে সাথে কাজে লাগাল লিলি। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল ও, হস্তিনীকে দু'হাত দিয়ে ধরে তুলল, তারপর তার কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ফটকের দিকে। চারদিকে মেয়েদের দঙ্গল, কাজেই হঠাৎ ওর ওপর কোন সৈনিকের নজর পড়ার ভয় কম।

গতি মন্থর হয়ে এল জটলার, দরজা দিয়ে দু'একজন করে গলছে মেয়েরা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা লক্ষ্য করছে ওয়াকেম। ভাবলেশহীন চেহারা, কিন্তু লিলির মনে হলো দেখার যা কিছু আছে সবই দেখতে পাচ্ছে সে। হঠাৎ মনে মনে শিউরে উঠে উপলব্ধি করল, তার ওপর স্থির হয়ে আছে লোকটার দৃষ্টি। তাড়াহুড়ো না করে মুখটা নামিয়ে নিল ও। আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে। যেমন হাঁটছিল, তেমনি হাঁটতে লাগল, কিন্তু ভুলেও একবার মুখ তুলে ওয়াকেমের দিকে তাকাল না। ছোট দরজার কাছে চলে এল ওরা। গায়ের রোম খাড়া হয়ে উঠছে ওর, অনুভব করল লিলি। বোরখার ভেতর ঘামছে। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি। দরজা টপকে এল ওরা। কিছুই ঘটল না। লম্বা একটা টানেল। অন্ধকার। সেটাও পেরিয়ে এল ওরা। তারপর মুখ তুলে লিলি দেখল, মস্ত একটা উঠানে দাঁড়িয়ে আছে সে।

চৌরাস্তায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল দলটা। ওদের পিছনে রয়েছে সৈনিকরা, পঁচিশ ত্রিশ গজ দূরে। তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিক থেকে ছাগলের ডাক শুরু হলো, সেই সাথে অশ্লীল ভাষায় নোংরা সব প্রস্তাব আসতে শুরু করল ওদিক থেকে।

চৌরাস্তা থেকে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিল লিলি। ফ্লাড লাইটের আলোয় বিশাল দুর্গ প্রাচীরের আভাস পাওয়া যায়। প্রধান ভবনের সামনে লোহার বার দিয়ে তৈরি প্রকাণ্ড গেট, ওই গেটের ভেতরই কোথাও আটক রাখা হয় কয়েদীদের। যে রেলওয়ে ট্রেনের কথা বলেছিল রানা, সেটা শেষপ্রান্তে, প্রধান ভবনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ছয়টা বক্সকার দেখতে পেল লিলি, তার মধ্যে দু'তিনটের ছাদ সমতল। লোকোমোটিভটা দাঁড়িয়ে আছে ইঞ্জিন শেডের ভেতর।

আরেক দিকের শেষ প্রান্তে দেখা গেল একটা ভিলা। অনেকটা ইতালিয়ান স্টাইলে তৈরি সেটা, চারদিকে নিচু পাঁচিল, সযত্নচর্চিত বাগান চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে ভিলাটাকে।

ওর ডান দিকে ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ি দেখা গেল। সেগুলোর সামনে ছায়ার ভেতর তিন চারটে ট্রাক। লিলি অনুমান করল, ওগুলোকে বোধহয় স্টোর হাউস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পাশে দাঁড়ানো মেয়েটার কোমর পেঁচিয়ে ধরা হাতটা ধীরে ধীরে টেনে নিল লিলি, সেই সাথে মেয়েটাকে একটু ঠেলে পাঁচিলের গায়ে নিয়ে এল। শক্ত পাঁচিলের

স্পর্শ অনুভব করে তাতে হেলান দিল মেয়েটা। ধীরে ধীরে ভিড়ের মাঝখান থেকে কিনারার দিকে সরে আসতে শুরু করল লিলি। ওদিকটা অন্ধকার। আচমকা, কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না ও, সমস্ত শোরগোল থেমে গেল।

কেউ যেন একটা বোতাম টিপে চুপ করিয়ে দিয়েছে সবাইকে। বাড়িগুলোকে ঘিরে যে পাঁচিলটা রয়েছে সেটার গায়ে একটা দরজা খুলে গেছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে একজন লোক। চৌরাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা।

উপস্থিত আর সব সৈনিকের মতই এর পরনেও ক্যামোফ্লেজড ইউনিফর্ম। কিন্তু মাথা খালি, আস্তিনে বা বুকে কোন ব্যাজও নেই যা দেখে তার পদমর্যাদা বোঝা যায়। তবু, লোকটা কে তা অনুমান করতে অসুবিধে হলো না লিলির।

চৌরাস্তায় এসে দুটো দলের মাঝখানে দাঁড়াল কর্নেল খানজুম। বেতের একটা চকচকে রুলার রয়েছে তার হাতে, সেটা দিয়ে অনবরত নিজের ডান উরুতে বাড়ি মারছে সে। দৃঢ়পায়ে এগোল সার্জেন্ট ওয়াকেম, কর্নেলের সামনে দাঁড়িয়ে ঠকাস করে স্যালুট করল। উত্তরে বেতের রুলারটা সামান্য একটু তুলল কর্নেল খানজুম।

সুদর্শন কর্নেলের বয়স পঞ্চাশ পেরোয়নি। পুরু, ঘন গোঁফ। হিব্রু ভাষায় দ্রুত কথা বলল ওরা। কিছুই বুঝল না লিলি। কিন্তু লক্ষ্য করল রাগ আর ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছে কর্নেলের চেহারায়।

মেয়েদের ওপর চোখ বুলাল কর্নেল। তারপর ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে হস্তিনী মেয়েটা, পাঁচিল ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এল লিলির দিকে, লিলি কিছু বুঝতে পারার আগেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। 'আমাকে ফেলে যাচ্ছ কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। তাকে ধরে দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল লিলি, কিন্তু ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে সর্বনাশ হয়ে গেল। টালমাটাল অবস্থায় ঢলে পড়তে গিয়ে বোরখার হুডটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল মেয়েটা, খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল লিলির মুখ।

আধ-ঘোরা অবস্থায় স্থির হয়ে গেল কর্নেল খানজুম। চোখে-মুখে তার উত্তপ্ত দৃষ্টি অনুভব করল লিলি। ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল কর্নেল, তারপর নিচু গলায় কি যেন বলল সার্জেন্টকে।

এগিয়ে আসতে শুরু করল সার্জেন্ট ওয়াকেম। মেয়েরা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে পথ করে দিল তাকে। হস্তিনী মেয়েটা ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখতে পেয়েই অশ্রাব্য একটা গালি দিল। মুখ খামচে ধরার জন্যে বাড়িয়ে দিল একটা হাত। তার কাঁধে মস্ত একটা থাবা বসাল সার্জেন্ট, যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে কংক্রিটের মেঝেতে বসে পড়ল মেয়েটা। খপ করে লিলির একটা হাত ধরে ফেলল সার্জেন্ট, ধাতস্থ হবার কোন সুযোগ না দিয়ে টেনে নিয়ে চলল ওকে। আতঙ্কে জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো লিলির, কিন্তু নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল, ভয়ে কাহিল হয়ে পড়লে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোন আশাই নেই।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে যাবার সময় মাথাটা নিচু করে রাখল লিলি। ওর হাত ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল সার্জেন্ট ওয়াকেম। বেতের রুলার দিয়ে চিবুক স্পর্শ করল কর্নেল খানজুম, মুখ তুলে তার ঘন কালো চোখের দিকে তাকাল

লিলি।

'তুমি কি···ইতালিয়ান?' ইতালিয়ান ভাষায় প্রশ্ন করল কর্নেল।

মাথা নেড়ে নিচু গলায় বলল লিলি, 'না, কর্নেল। আমি প্যারিস থেকে এসেছি।'

'আচ্ছা! ফ-রা-সী সুন্দরী!' এবার খাস ফরাসী উচ্চারণে বলল কর্নেল। 'কিন্তু তুমি এখানে কেন? নর্দমার নোংরা কীটগুলোর সাথে তুমি জুটলে কিভাবে?'

একটা ঢোক গিলল লিলি, চেহারাটা একটু করুণ করে তুলে বলল, 'আমার এক পুরানো বন্ধুর আমন্ত্রণে তেল আবিবে বেড়াতে এসেছিলাম। পৌঁছে দেখি, আমি আসব না মনে করে কোথায় জানি বেড়াতে চলে গেছে সে।' একটু থেমে কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'হাতে টাকা-পয়সা অল্পই ছিল। দু'দিনেই শেষ হয়ে গেল সব। তারপর···' মাথা নিচু করে নিল ও।

'বুঝেছি,' বলল কর্নেল। 'তারপর তোমার সাথে দেখা হয় জজবার। মানে, ওর খপ্পরে পড়ে যাও তুমি?'

চেহারায় রাগের ভাব ফুটিয়ে তুলল লিলি। 'শয়তানের বাচ্চাটা আমাকে টেরই পেতে দেয়নি যে এইরকম একটা ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনছে সে।'

'কিছু এসে যায় না। আমার হাতে যখন পড়েছ, তোমার কোন চিন্তা নেই। তোমার প্রাপ্য মর্যাদা এখন পুরোপুরি আশা করতে পারো।' লিলির একটা হাত ধরল সে, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাকি সব তোমার, সার্জেন্ট।'

ওদেরকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার জন্যে খানিক সময় দিয়ে ভারী গলায় দুর্বোধ্য কি যেন বলল সার্জেন্ট ওয়াকেম, সাথে সাথে উল্লাসে ফেটে পড়ল সৈনিক এবং মেয়েদের দল দুটো। বাঁধ ভাঙা পানির মত পরস্পরের দিকে তেড়ে এল তারা। পিছন দিকে তাকাল লিলি। অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য! দেখে মনে হলো, দুটো হিংস্র দল রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় মেতে উঠেছে। উজ্জ্বল ফ্লাড লাইটের আলোয় যে যাকে সামনে পেল তার ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সমান তালে চলেছে চিৎকার, উল্লাসধ্বনি, খিলখিল হাসি।

'তাকিয়ো না,' বলল কর্নেল খানজুম। 'চিড়িয়াখানায় এখন এটা খাবার সময়। জানোয়ারগুলোকে খুশি রাখার জন্যে এই ব্যবস্থা। এসব তোমার জন্যে নয়।'

'কিন্তু একটু রুচি, একটু শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে অসুবিধে কোথায়?'

বাগানের গেট খুলে লিলিকে ভেতরে ঠেলে দিল কর্নেল। 'অসম্ভব কথা! ওরা বুনো, শৃঙ্খলা ওরা মানবে কেন! আর রুচির কথা যদি বলো, সবার রুচি কি সমান?'

'মানলাম সমান নয়, কিন্তু আপনি চেষ্টা করে ওদের রুচির মান তো বাড়াতে পারেন?'

'না, তা পারি না। এর চেয়ে ভাল মেয়ে যোগাড় করতে হলে আমাদের বাজেটে টান পড়বে।'

বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় এসে থামল ওরা। পকেট হাতড়ে একটা

সিগারের প্যাকেট বের করল কর্নেল। একটা বের করে ধরাল। 'তোমার নাম?' জানতে চাইল সে।

'লিলি।'

'আমার প্রিয় ফুল।' কথাটা বলেই ভুরু কুঁচকে লিলির দিকে ভাল করে তাকাল কর্নেল। 'জানি না কেন, চোখে যতটা দেখা যায় তার চেয়ে বেশি মনে হয় তোমাকে। কি যেন একটা রহস্য আছে তোমার মধ্যে।'

জিভটা শুকিয়ে গেল লিলির। এই রকম একটা লোক আশা করেনি ও। সুদর্শন, বুদ্ধিমান, শান্ত স্বভাব। জজবার বর্ণনার সাথে কোন মিলই নেই।

মুখে হাসি ছড়িয়ে কর্নেলের চোখে চোখ রাখল লিলি, বলল, 'নারী মাত্রই রহস্যময়ী, জানেন না? আমার বন্ধুরা প্রায়ই বলে, আমার মধ্যে নাকি আশ্চর্য এক গভীরতা আছে, যার তল পাওয়া কোন পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি নিজে কিন্তু এসব টের পাই না। আমি একটা সাধারণ মেয়ে।'

'আশ্চর্য এক গভীরতা,' চিন্তিত দেখাল কর্নেলকে। পরমুহূর্তে হাসল সে। 'থাকলে আমিও তা দেখতে পাব। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে এমন জিনিস খুব কমই আছে।'

বারান্দায় উঠে সামনের দরজা খুলল কর্নেল। লিলির হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এল।

আরামদায়ক কিন্তু অল্প আসবাবে সাজানো একটা কামরা। দেখেই বোঝা যায়, একজন সৈনিকের ঘর। টেবিল, চেয়ার, বড় একটা ডিভান, বই ভর্তি শেলফ।

দরজা বন্ধ করে দিল কর্নেল। এগিয়ে এসে লিলির হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিল হাতব্যাগটা। ধক্ করে উঠল লিলির বুক। ইচ্ছে হলো ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নেয়। কিন্তু কাজটা বোকামি হয়ে যাবে। লিলির চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হাসল কর্নেল। ব্যাগটা ছুঁড়ে দিল একটা চেয়ারের ওপর। এগিয়ে গিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে, সিগারটা নিভিয়ে রেখে দিল অ্যাশট্রেতে। তারপর পেছন থেকে দু'হাতে পেঁচিয়ে ধরল লিলির কোমর। ফিসফিস করে বলল, 'তোমার মত একটা মেয়েকে এখানে পাব, ভাবাই যায় না! এখনও যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। এই ঘরে তুমি সত্যি আমার সাথে আছ তো, লিলি?' হেসে উঠল সে। 'নাকি, স্বপ্ন দেখছি আমি?'

'আছি।'

নিজের শরীরের সাথে আরও সেঁটে ধরল কর্নেল লিলিকে। 'সত্যি আছ?' মৃদু শব্দে আবার হাসল সে। 'দেখি তো!' বলেই লিলিকে ধাক্কা দিল সে। প্রায় ছিটকে গিয়ে নরম ডিভানের ওপর পড়ল লিলি। এগিয়ে এসে ডিভানের সাথে ওকে চেপে ধরল একহাতে, অপর হাত দিয়ে খুলে ফেলল ওর বোরখার চেন। মিনি স্কার্টের কিনারা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল একটা হাত। সাথে সাথে পাথর হয়ে গেল সে। পরমুহূর্তে টান দিয়ে বের করে আনল ছুরিটা। সিধে হয়ে দাঁড়াল। চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করল ছুরি, বোতামে চাপ দিতেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল চকচকে রূপালি পাত। চোখ নামিয়ে লিলির দিকে তাকাল সে। হেসে উঠল হো হো করে।

• 'সন্দেহ নেই, সত্যি আশ্চর্য এক গভীরতা আছে তোমার মধ্যে!' হাসি থামিয়ে বলল কর্নেল খানজুম। ছুঁড়ে দিল ছুরিটা, দরজার গায়ে ঠক্ করে গেঁথে গেল সেটা। মুখ নামিয়ে লিলির দিকে তাকাল সে।'

'এখানে কি ঘটে না ঘটে তা আগে থেকে জানব কিভাবে,' বলল লিলি, 'তাই আত্মরক্ষার জন্যে সাথে করে নিয়ে এসেছি ওটা।'

ছুরিটার দিকে আরেকবার তাকাল কর্নেল। এই সুযোগে স্কার্টটা আরও একটু ওপরে তুলে ফর্সা উরু দুটো প্রায় পুরোপুরি উন্মুক্ত করল লিলি। আবার যখন ওর দিকে ফিরল কর্নেল, তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল সেখানে। ধীরে ধীরে লালসা ফুটে উঠল তার চোখে। ঝুঁকে পড়ে লিলির উরুতে হাত রাখল সে। হাতটা তুলে নিয়ে গেল উরুর প্রায় শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। এই রকম ঝাড়া মিনিটখানেক হাত বুলাল সে, তারপর মৃদু হেসে উঠল। বলল, 'কি জানো, প্রিয় ফুল, অনেক দিন, অনেক বছর পর মনে হচ্ছে আজ আমি কোন মেয়ের কাছ থেকে সুখ পেতে যাচ্ছি।'

তলপেটের ভেতর একটা আলোড়ন অনুভব করল লিলি। বুকের খাঁচায় বাড়ি খেতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড।

'এবং কথা দিচ্ছি, অনেক দিন, অনেক বছর পর কোন পুরুষের কাছ থেকে সত্যিকার সুখ পেতে যাচ্ছ তুমিও! আমাদের দু'জনের জন্যেই এটা একটা উৎসব। কাজেই, সুখ দেয়া-নেয়া শুরু করার আগে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হয়, কি বলো? দাঁড়াও, এখুনি শ্যাম্পেন নিয়ে আসছি আমি।'

ভেজানো একটা দরজা খুলে বেরিয়ে গেল কর্নেল। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা আবার ভিজিয়ে দিল সে। নিঃশব্দে ডিভান থেকে নেমে পড়ল লিলি। দ্রুত দরজার পাশে এসে চোখ রাখল ফাটলে। দরজার ওপাশে কিচেন রূম। বড় একটা আইসবক্সের দরজা খুলে ভেতর থেকে শ্যাম্পেনের বোতল বের করল কর্নেল। সাথে সাথে দরজার কাছ থেকে সরে এল লিলি, হাত ব্যাগটা তুলে নিল চেয়ার থেকে, তারপর প্রথম দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নামার সময় আরেকটু হলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও। বাগানে নেমে এসে সরু পথটা ধরে ছুটতে শুরু করল। কিন্তু বাগানের গেটের কাছে এসে এমন হাঁপাতে শুরু করল যে দৌড় না থামিয়ে পারল না।

গোটা উঠান নির্জন পড়ে আছে। সৈনিকরা মেয়েদের নিয়ে চলে গেছে যে-যার ঘরে। কিন্তু ফ্লাড লাইটগুলো জ্বলছে এখনও, ফলে সোজাসুজি উঠান পেরোনো সম্ভব নয়।

উঠানের কিনারা ঘেঁষে ছায়ার মধ্যে দিয়ে এগোল লিলি। মুখটা আগেই ঢেকে নিয়েছে বোরখা দিয়ে। গাড়িগুলো পার্ক করা রয়েছে ছায়ার ভেতর, উঠানের এক প্রান্তে, সেখানে এসে পৌঁছুতেই দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা। ঘাড় ফিরিয়ে কর্নেলকে দেখতে পেল লিলি, ছিটকে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। 'ওয়াকেম!' গলার সমস্ত জোর দিয়ে হাঁক ছাড়ল।

পাশে সিঁড়ির ধাপ দেখে দ্রুত উঠতে শুরু করল লিলি। ঘন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে সামনেটা, ধাপগুলো কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে দেখতে পাচ্ছে না ও।

আরও পনেরোটা ধাপ টপকে সমতল একটা জায়গায় এসে থামল ও। ঘুরে তাকাল নিচে।

একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট ওয়াকেম। ছুটে উঠান পেরোতে শুরু করল সে। পায়ে বুট নেই, উদোম গা।

সমতল জায়গাটা পেরিয়ে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি অনুভব করল লিলি। অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও তরতর করে উঠতে শুরু করল ও। নিচে থেকে ভেসে এল হৈ-চৈ-এর আওয়াজ, কিন্তু পেছন ফিরে একবারও তাকাল না। গোটা পঁচিশ ধাপ টপকে আবার একটা সমতল চাতালে পৌঁছুল ও, হাঁপিয়ে গেছে, দম নেবার জন্যে থামল একটু। ঘুরে নিচে তাকাতেই দশ-বারোজন সৈনিককে দেখতে পেল নিচে।

নিচে থেকে নয়, লিলির মাথার ওপর থেকে ভেসে এল চিৎকারটা। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। দ্রুত মুখ তুলে তাকাল ও। সমতল খানিকটা জায়গা, তারপর আবার একপ্রস্থ সিঁড়ি, সিঁড়ির মাথায় জ্বলে উঠল একটা টর্চ। তরতর করে নেমে আসছে টর্চধারী।

অন্ধকারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিচে নামতে শুরু করল লিলি। সব শেষ সমতল জায়গাটায় নেমে এসে থামল ও। এবার কি করা উচিত ভেবে পেল না। উঠানে নামলেই ধরা পড়ে যেতে হবে।

চোখে পড়ল লোহার রেইলটা। সেটার গায়ে হেলান দিয়ে নিজের চারদিকে দিশেহারার মত তাকাল ও। ওপর থেকে দ্রুত নেমে আসছে পায়ের আওয়াজ। হঠাৎ একটা ট্রাকের ছাদ দেখতে পেল ও। মাত্র চার কি পাঁচ ফিট নিচে। একটা শেড থেকে ছাদটাই বেরিয়ে আছে।

বুঝতে পারল, বাঁচতে হলে লাফ দিয়ে পড়তে হবে। রেলিং গলে এপারে চলে এল ও। শুনতে পেল একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে পায়ের আওয়াজ। দেরি না করে লাফ দিয়ে পড়ল ক্যানভাসের ছাদে। সেখান থেকে গড়িয়ে চলে এল শেডের নিচে।

নিঃসাড় শুয়ে থাকল লিলি। এক মুহূর্ত পর রিস্টওয়াচ দেখল ও। প্রায় দশটা বাজে। হ্যান্ডব্যাগ থেকে সেসকা-টা বের করল। বাঁ হাতে নিল ওটা, ট্রিগারে পেঁচিয়ে রাখল তর্জনী। ক্যানভাসের ওপর মুখ রেখে অপেক্ষা করছে ও। আওয়াজ শুনে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, গোটা উঠান আঁতিপাতি করে খুঁজছে ওরা।

এগারোটার সময় হাল ছেড়ে দিল ওরা। এরপরও আধঘণ্টা নড়ল না লিলি। চারদিকে গভীর অন্ধকার। ক্যানভাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে থেকে নিঝুম রাতে কান পেতে আছে ও। কোথাও কোন শব্দ নেই, কোথাও কিছু নড়ছে না। ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে শেডের নিচ থেকে বেরিয়ে এল ও। উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর হাত তুলল, রেলিং ধরে ট্রাকের ছাদ থেকে উঠে পড়ল ল্যান্ডিঙে। মুহূর্তের জন্যে একটু ইতস্তত করল কি করল না, তারপরই ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল ওপর দিকে।

প্রচুর, প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে গেছে, জানে লিলি। সবাইকে নিয়ে দু'ঘণ্টার ওপর

ওর জন্যে সৈকতে অপেক্ষা করছে রানা। ওর দেরি দেখে নিশ্চয়ই শুধুমাত্র চরম অমঙ্গলটাই আশঙ্কা করছে সে।

দুর্গ প্রাচীরের দক্ষিণ পাঁচিলে পৌঁছুতে আর যখন মাত্র অল্প কয়েকটা ধাপ বাকি, এই সময় ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। খানিক ইতস্তত করে মুহূর্তের জন্যে গাঢ় ছায়ায় সরে এল ও। বিশ কি ত্রিশ গজ সামনে একটা ল্যাম্প দেখা গেল। সেটার পাশে, দুটো পাঁচিল যেখানে এক হয়েছে স্থির পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে একজন সেন্ট্রি, মাথার ওপর পাঁচিলের কার্নিস ছাতার কাজ করছে।

দ্বিতীয় সেন্ট্রিকে কোথাও দেখতে পেল না লিলি। পরিস্থিতিটা নিয়ে খানিক চিন্তা ভাবনা করল ও। আর দেরি করা চলে না বুঝতে পেরে ছায়া থেকে বেরিয়ে এল নিঃশব্দে। ধাপ চারটে টপকে উঠে পড়ল সমতল জায়গাটায়। আবার এগোতে শুরু করার আগে চেন টেনে খুলে ফেলল বোরখার সামনেটা।

ওর পায়ের আওয়াজ শুনে জ্যান্ত হয়ে উঠল স্থির পাথর। কার্নিসের নিচ থেকে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। কাঁধ থেকে হাতে চলে এল অ্যাসল্ট রাইফেল। পরমুহূর্তে, আলোর সীমানার ভেতর লিলি ঢুকে পড়তেই, হাঁ হয়ে গেল তার মুখ। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে সাদা সিল্কের বোরখা পত পত করছে, খোলা অংশের ভেতর দেখা গেল মিনি স্কার্ট আর নগ্ন উরু।

হিব্রু ভাষায় কি যেন বলল সেন্ট্রি। বুঝল না লিলি, কিন্তু ইতালীয় ভাষায় বলল, 'এই, ডার্লিং, তোমার কাছে সিগারেট আছে নাকি?'

একটু ইতস্তত করে পকেটে হাত ভরল সেন্ট্রি। সিগারেটের প্যাকেট বের করে জানতে চাইল, 'তুমি এখানে কেন?'

'আর বোলো না, ডার্লিং!' মুখের সামনে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল লিলি। 'এক সার্জেন্টের সাথে ছিলাম, কিন্তু মদ খেয়ে এমন মাতাল হয়ে পড়ল লোকটা যে আমার কথা বেমালুম ভুলে গেল। কি আর করি, তাজা বাতাস খেতে উঠে এলাম!'

পাঁচিলে হেলান দিল লিলি, একটা পা হাঁটুর কাছে ভাঁজ করে লোভনীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াল। আরও একটু সামনে এগোল সেন্ট্রি, চোখ দুটো লালসায় চকচক করছে। রাইফেলটা বাঁ হাতে নিল তারপর ডানহাত বাড়িয়ে লিলির উরুর ওপর রাখল। ঠিক এই সময় অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় সেন্ট্রি। মাত্র কয়েক গজ দূরে।

হিব্রু ভাষায় কি যেন বলল সে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল লিলি, প্রথম সেন্ট্রির দু'পায়ের মাঝখানে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল, ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক এই সময়টায় ওর কি এখানে না আসলেই নয়?'

সাথে সাথে পাঁচিলের গায়ে গাঁথা একটা হুকে অ্যাসল্ট রাইফেল ঝুলিয়ে রেখে সঙ্গীর দিকে দ্রুত এগোল লোকটা। নিচু গলায় কথা বলল ওরা, দ্বিতীয় সেন্ট্রি প্রথম সেন্ট্রির কাঁধের ওপর দিয়ে বারবার তাকাল লিলির দিকে। অবশেষে ওপর-নিচে মাথা দুলিয়ে সম্মত হবার ভাব প্রকাশ করে ঘুরে দাঁড়াল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

প্রথম সেন্ট্রি ফিরে এল। 'রাতের এই সময়টা আমরা কফি খাই। ওকে নিয়ে

আসতে পাঠালাম। বলে দিয়েছি, একটু যেন দেরি করে ফেরে।'

'বুদ্ধি আছে তোমার,' মৃদু হেসে বলল লিলি, ব্যাগ খুলে ভেতর থেকে সেসকা বের করে সেফটি ক্যাচ অফ করল, লোকটার কপালে তাক করল সেটা, বলল, 'যা বলব ঠিক তাই করবে, তা না হলে বিপদ হবে তোমার।'

অনেক, অনেকক্ষণ ধরে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। তারপর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে হেসে উঠল হো হো করে। সেই সাথে এগোতে শুরু করল লিলির দিকে।

'না!' আঁতকে উঠল লিলি, ভয়ে সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে ওর। 'প্লীজ!' সেসকাটা দু'হাত দিয়ে ধরল ও।

দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। মুছে গেল মুখের হাসি। ধীরে ধীরে রাগ আর আক্রোশের ছাপ ফুটে উঠল চেহারায়। দু'পাটি দাঁত পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে। হঠাৎ করে ছোঁ মারল সে, লিলির হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল অস্ত্রটা।

আর কোন উপায় নেই দেখে ট্রিগার টিপে দিল লিলি। ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে খক্ করে কেশে উঠল সেসকা। লোকটার ডান চোখের ইঞ্চিখানেক উপরে একটা ফুটো দেখা গেল। টলমল করতে করতে কয়েক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, তারপর প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে পড়ে গেল ওদিকে, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লিলি। এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনাটাকে বহুদিন আগে দেখা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে ওর, স্পষ্ট ভাবে স্মরণ হয় না, এরই মধ্যে কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। অনুভব করল গলার কাছে কি যেন একটা আটকে আছে, ঢোক গিলেও সেটাকে সরাতে পারছে না। ফুঁপিয়ে উঠল ও। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল হ্যান্ডব্যাগটা। সমতল পাঁচিলের মাথা ধরে এগোল ও, দ্রুত সরে এল আলো থেকে। কামানের একটা মঞ্চের নিচে এসে দাঁড়াল ও। এককালে এখানে কামান ছিল, এখন শুধু মঞ্চটাই আছে। কাপড় তুলে কোমরে জড়ানো রশির প্যাঁচ খুলতে শুরু করল ও। লাটিমের মত ঘুরতে হলো ওকে। একটু পরই আচ্ছন্ন বোধ করল, মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। যতটা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগল রশির প্যাঁচ খুলতে। ধপাস করে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল ও। মাথার ওপর আচ্ছাদন থাকায় গায়ে বৃষ্টি লাগছে না বটে, কিন্তু ঘেমে গোসল হয়ে গেছে। খানিক পর হ্যান্ডব্যাগ থেকে টর্চটা বের করল। রশির শেষ প্রান্তের সাথে সেটা বাঁধার সময় লক্ষ্য করল আঙুলগুলো কাঁপছে।

অন্ধকারে কান পাতল ও। দ্বিতীয় সেন্ট্রির সাড়া নেই এখনও। ধীরে ধীরে মঞ্চের ওপর উঠল, টর্চটা জ্বেলে একটু একটু করে নামাতে শুরু করল সেটা।

হাতে আর খুব বেশি রশি নেই, এই সময় তাতে আচমকা মৃদু একটা টান অনুভব করল লিলি। নিমেষে সারা শরীরে ঝিরঝির আনন্দের পরশ অনুভব করল সে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও। তারপর আবার মৃদু টান অনুভব করল রশিতে। এবার সেটা টেনে ওপরে তুলতে শুরু করল ও।

রশির সাথে মেইন ক্লাইম্বিং রোপের একটা প্রান্ত উঠে এল ওপরে। শেষ মাথায় একটা লুপ তৈরি করে দিয়েছে বনেটি, মঞ্চের গায়ের একটা হুকের মাথায় সেটা গলিয়ে দিল লিলি।

এরপর অনেকক্ষণ কিছু ঘটল না। অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠল লিলি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বেতস পাতার মত কাঁপতে শুরু করেছে শরীরটা।

হাসি-খুশি গলার আওয়াজ ঢুকল কানে। 'এই যে, আমি উঠে পড়েছি, সিনোরিনা!' চমকে উঠে তাকাল লিলি, দেখল পাঁচিলের কিনারা থেকে উঠে আসছে বনেটি।

দ্রুত ছুটে গিয়ে বনেটিকে জড়িয়ে ধরল লিলি। 'সব ঠিক আছে তো?'

'শিওর,' রাইফেল আর পিঠে বাঁধা রাকস্যাকটা নামাল বনেটি। 'আপনি যা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলেন না!'

দ্বিতীয় ক্লাইম্বিং রোপটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে চারদিকে একবার তাকাল বনেটি, তারপর সেটা পাঁচিলের কিনারা দিয়ে নামাতে শুরু করল।

'ওটা কেন?'

'মেইন ক্লাইম্বিং রোপ বেয়েই উঠে আসবে ওরা,' বলল বনেটি, 'আমার হাতের এটা টেনে তুলব আমি, তাতে অনেক তাড়াতাড়ি উঠতে পারবে ওরা।'

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বোরখাটা শরীরে ভাল করে জড়িয়ে নিল লিলি। ধীরে ধীরে রশি টানতে শুরু করল বনেটি। ওকে সাহায্য করতে চাইল লিলি, কিন্তু মাথা নেড়ে বনেটি জানাল, লাগবে না। সাত কি আট মিনিট পর পাঁচিলের কিনারায় আরেকটা মাথা দেখা গেল।

'রানা!' মাথাটার পাশে চলে এল লিলি।

উঠে দাঁড়াল রানা। হাত বাড়িয়ে ধরল লিলিকে। বুকের ওপর টেনে আনল। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল লিলি, এখন আর সে কাঁপছে না।

ছয়

এরপর সহজেই উঠে এল জালুচি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সলোজাকে নিয়ে। এই বয়সেও অসম্ভব ভারী সে। বনেটির একার পক্ষে তাকে টেনে তোলা সম্ভব হলো না। তাছাড়া অনেক দিন হলো পাহাড়ে চড়ার অভ্যেস নেই সলোজার, আধাআধি উঠে চিৎকার করে জানাল সে, 'আর পারছি না! রশি ছাড়ো, আমি নেমে যাই!'

চাপা গলায় ওপর থেকে ধমক লাগাল রানা। বনেটিকে সাহায্য করল ও, জালুচিও হাত লাগাল। তিনজন মিলে টানতে শুরু করল রশি। ওদিকে, নিচে থেকে তীব্র প্রতিবাদ করছে সলোজা। তার নাকি হাত আর পায়ের চামড়া পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে উঠে যাচ্ছে সব। কিন্তু তার প্রতিবাদে কান দিল না ওরা। অবশেষে টেনে তোলা হলো তাকে। দেখা গেল, সত্যিই কনুই আর হাঁটুর চামড়া অনেক জায়গায় ছড়ে গেছে। কিন্তু ওপরে উঠতে পারার আনন্দে সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে

রানাকে জড়িয়ে ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সে।

'যীশুর মা,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, 'তোর পায়ে পড়ি, আর কখনও আমাকে এই রকম পরীক্ষায় ফেলিস না!'

রশি খুলে নিজেকে মুক্ত করছে সলোজা, এই সময় চাপা গলায় দ্রুত বলল বনেটি, 'কে যেন আসছে!'

'দ্বিতীয় সেন্ট্রি!' ফিসফিস করে বলল লিলি।

'প্রথম সেন্ট্রি?' জানতে চাইল জালুচি।

'উপায় ছিল না, তাকে আমি গুলি করেছি···'

'তাই?' প্রশংসার সুরটা চেপে রাখতে পারল না জালুচি। 'রানা, এটাকে আমি সামলাব।' বলেই অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

মাত্র কয়েক গজ দূরে, ল্যাম্পের নিচে এসে দাঁড়াল সেন্ট্রি। নিচু গলায় হিব্রু ভাষায় ডাকছে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ওদের দিকে এগোল সে। তার পিছনে আলোর মধ্যে এসে দাঁড়াল জালুচি। বিপদটা দেখতে না পেলেও, কিছু একটা অনুভব করে থমকে দাঁড়াল সেন্ট্রি। এই সুযোগে তার ঠিক পিছনে চলে এল জালুচি। লোকটার গলায় একটা হাত রাখল সে। ছুরির চকচকে ফলা ঝিলিক দিয়ে উঠল ল্যাম্পের আলোয়। গুঙিয়ে উঠল সেন্ট্রি। পিছিয়ে গিয়ে তাকে পড়ে যাবার জায়গা করে দিল জালুচি। তারপর লাশটাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেল অন্ধকারে।

একটু পরই ওদের কাছে ফিরে এল সে। তার দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিসের মত আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। 'সব ঠিক আছে, রানা,' হাসি-খুশি গলায় বলল সে। 'ঝামেলা গন। এবার কি?'

'কর্নেল খানজুম।' বলল রানা। সমতল জায়গাটা ধরে এগোল ও, সবাই অনুসরণ করল ওকে।

দুর্গ প্রাচীরের আরেক দিকে চলে এল ওরা, এখান থেকে নিচের আলোকিত উঠানটা দেখা যায়।

হাত তুলে চৌরাস্তার উল্টোদিকের একটা বাড়ি দেখাল রানা, বলল, 'ওটা। কর্নেল খানজুমের বাড়ি।'

'ইতিমধ্যে ওখান থেকে একবার হয়ে এসেছি আমি,' বলল লিলি। তারপর দ্রুত এবং সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল কারাগারে ওর ঢোকার পর থেকে কি কি ঘটেছে।

লিলির কথা শেষ হতে রানা বলল, 'এমন ভাবে এগোব আমরা, দেখে যেন মনে হয় ডিউটি শেষ করে ফিরছি। সবার আগে থাকবে জালুচি, কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে হিব্রু ভাষায় জবাব দিতে পারবে সে। মাঝখানে থাকবে লিলি।' লিলির কনুই চেপে ধরল ও। 'আশপাশে কেউ থাকলে তারা যেন বুঝতে পারে তুমি আমাদের বন্দী।'

পাথরের তৈরি সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এল ওরা। ট্রাক পার্কিং এলাকায় পৌঁছে শেডের নিচে থামল সবাই। কোথাও কিছু নড়ছে না। চারদিকে শুধু বৃষ্টির আওয়াজ। নিচু গলায় নির্দেশ দিল রানা। শেডের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে উঠান পেরোতে শুরু করল ওরা। সবার আগে জালুচি।

কংক্রিটের ওপর পড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো। মানুষের একটা ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না কোথাও। প্রধান ফটকের মাথার ওপর নিশ্চয়ই সেন্ট্রি আছে, তারা যদি বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে কোথাও মাথা গুঁজে না থাকে, নিঃসন্দেহে দেখতে পেয়েছে ওদেরকে। বাস্তবের ছোঁয়া দেয়ার জন্যে মাঝে মধ্যে লিলির পিঠে হাত দিয়ে ধাক্কা দিল রানা, হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে গিয়েও প্রতিবার কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল লিলি। নিচু গলায় একবার বলল সে, 'কি ব্যাপার, এই সুযোগে প্রতিশোধ নিচ্ছ নাকি?'

বাগানের গেট খুলল জালুচি। ভেতরে ঢুকে চারদিকে তাকাল রানা। কেউ নেই কোথাও। অন্তত কাউকে দেখতে পেল না ওরা। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে বারান্দায় উঠে পড়ল জালুচি। জানালায় শাটার বন্ধ, খড়খড়ি তুলে ভেতরে তাকাল সে।

তারপর ঘুরে দাঁড়াল, চাপা হাসি দেখা গেল তার মুখে। বলল, 'কর্নেল এখন খুব ব্যস্ত।'

জালুচিকে ঠেলে সরিয়ে দিল রানা, খড়খড়ি দিয়ে ভেতরে তাকাল। কোমর পর্যন্ত উদোম হয়ে ডিভানের ওপর বসে আছে কর্নেল খানজুম, হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস। তার পাশে, ডিভানের ওপরই শুয়ে আছে একটা মেয়ে। পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার। উঁচু করে রেখেছে একটা হাঁটু।

দরজার নবে একটা হাত রেখে অপেক্ষা করছিল সলোজা। তার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল রানা।

নবটা ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়ল সলোজা। তাকে অনুসরণ করে বাকি সবাইও। সলোজার হাতে অ্যাসল্ট রাইফেল কর্নেলের বুকের দিকে তাক করা। গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিল কর্নেল, সলোজাকে দেখে হাতটা কেঁপে গেল, গ্লাসের কিনারা থেকে ছলকে পড়ল খানিকটা শ্যাম্পেন। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। হাতের গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। মুহূর্তের জন্যেও তার দৃষ্টি সলোজার চোখের ওপর থেকে সরেনি। গ্লাসটা রেখে পুরোপুরি ঘুরল সে। প্রথমবার সলোজাকে দেখে হাতটা কেঁপে যাওয়া ছাড়া তার মধ্যে অন্য কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। রানার দিকে তাকাল সে। ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল। চেহারায় ঠিক ভয় নয়, দুশ্চিন্তার ছায়া। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড ধরে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠল মুখ। তারপর তাকাল লিলির দিকে।

কর্নেলের চেহারা থেকে সমস্ত গাম্ভীর্য খসে পড়ল, তার জায়গায় ফুটে উঠল উজ্জ্বল হাসি।

'প্রিয় ফুল! ঠিক, আশ্চর্য একটা গভীরতা আছে তোমার মধ্যে!' ফরাসী ভাষায় বলল সে। 'কিন্তু কেন, লিলি? কি চাও তোমরা?' ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল সে। 'ও কে?'

লিলি উত্তর দেবার আগে কথা বলল রানা, 'আমার পরিচয় জেনে তোমার কোন লাভ নেই। ফ্রেঞ্চ নয়, ইতালিয়ানে কথা বলো।'

ডিভানে শোয়া মেয়েটার মুখ হাঁ হয়ে গেল, কিন্তু চিৎকারটা বেরিয়ে আসার আগেই ওর মুখে একটা হাত চাপা দিল জালুচি। 'আরে, সব পণ্ড করে দেবে নাকি? একদম চোপ!'

সাতাশ কি আটাশ বছর বয়স হবে মেয়েটার, কিন্তু এরই মধ্যে ভেঙে চুরে গেছে শরীর, দেখে মনে হয় আধ-বুড়ি।

মৃদু শব্দে হেসে উঠল লিলি। বলল, 'এর চেয়ে ভাল আর কিছু জুটল না তোমার কপালে, কর্নেল?'

কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল কর্নেল খানজুম। 'প্রিয় ফুল, দুঃখের কথা কি আর বলব তোমাকে! এই গজব পড়া জায়গায় তোমার মত সুন্দর ফুল যদি হামেশা পাওয়া যেত, তাহলে কি আর বোকা বানাতে পারতে তুমি আমাকে? তা পাওয়া যায় না বলেই তো তোমাকে দেখে আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি সব লোপ পেয়েছিল!'

'তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়ে থাকলে সেটা নিশ্চয়ই আমার দোষ নয়!'

'এবং বুদ্ধির দোষে যদি মারা পড়ো সেজন্যেও আমরা দায়ী থাকব না!' বলল রানা।

'মানে, তোমরা যা বলবে তাই শুনতে হবে আমাকে?'

'এই তো, বুদ্ধি খুলছে!'

লিলির দিকে ফিরল কর্নেল। 'এই একটু আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল, কোন কম বয়েসী সৈনিকের সাথে ভেগেছ তুমি, কোথাও লুকিয়ে চুটিয়ে প্রেম করছ তার সাথে। ইচ্ছে ছিল, সকালে প্রতিটি লোককে প্যারেড করাব যতক্ষণ না আসল ব্যাপারটা কি জানা যায়।'

ডিভানের ওপর ওঠে বসার চেষ্টা করল মেয়েটা। খপ্ করে তার মাথার চুল খামচে ধরল জালুচি, মেঝেতে নামাল, তারপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল একটা কাঠের আলমিরার দিকে। 'আওয়াজ করলে জবাই করে ফেলব!'

ঠেলেঠুলে আলমিরার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হলো মেয়েটাকে। বাইরে থেকে কবাট বন্ধ করে দিল জালুচি। ফিরে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়াল সে, বোতল থেকে একটা গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল খানিকটা। ছোট একটা চুমুক দিয়ে কর্নেলের দিকে ফিরল সে, চোখ মটকাল। 'জীবন বড় বৈচিত্র্যময়, তাই না? কোথায় কার ভাগ্যে কি জুটে যায়, কে বলতে পারে?' ইঙ্গিতে হাতের গ্লাসটা দেখাল সে। 'খুব ভাল জিনিস!'

'কিন্তু যতদূর বুঝতে পারছি, আমার কোন ভাল করার জন্যে এখানে ঢোকোনি তোমরা। ব্যাপারটা আসলে কি?' বলল কর্নেল। 'তোমাদের কাউকে আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। তাহলে তোমাদের কাছে ঋণী হলাম কিভাবে?'

ইঙ্গিতে রানাকে দেখিয়ে দিল জালুচি। 'আমাদের লীডার।'

'ববি ইউজিন নামে একজন কয়েদী আছে তোমাদের এখানে,' বলল রানা। 'আমেরিকান।'

ইসরায়েলি কর্নেলের চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। 'হয়তো আছে। তাতে কি?'

'তাকে আমরা চাই।'

'আচ্ছা! এতক্ষণে বুঝলাম! বেশ, মার্কিন কয়েদীকে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম—তারপর? তারপর কি ঘটবে?'

'তোমাকে সাথে নিয়ে ফটক দিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে যাব আমরা। খুব বেশি দূর যেতে হবে না তোমাকে, উপকূলের দিকে মাত্র কয়েক মাইল।'

'তারপর? সেখানে কি ঘটবে?' অনেকটা কৌতুকের সুরে জানতে চাইল কর্নেল।

'ওখান থেকে সাগর পাড়ি দেব আমরা, ফিরে যাব যেখান থেকে এসেছি। তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাব না, কাজেই আমরা রওনা হবার পর যা খুশি করতে পারো তুমি।'

'কিন্তু আমি জানি আমার মাথায় বুলেটের একটা ফুটো থাকবে,' বলল কর্নেল। 'সেক্ষেত্রে কি-ই বা আমি করতে পারব?'

'না, তোমার কোথাও কোন বুলেটের ফুটো থাকবে না,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। 'তার কারণ, তোমার সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। তাছাড়া তোমাকে খুন করে আমাদের কোন লাভও নেই। আমরা খুনি নই, অন্তত অকারণে খুন করি না।'

'বলার ভঙ্গি আর কথাগুলো ভারি সুন্দর, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে,' কথাটা বলে চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখা শার্টের দিকে হাত বাড়াল কর্নেল। 'কিন্তু আমি যদি রাজি না হই?'

নিজের শার্টের পকেট থেকে হাতির দাঁতের তৈরি একটা ম্যাডোনা বের করল বনেটি। ম্যাডোনার পায়ের তলায় চাপ দিতেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ধারাল একটা ছুরির ফলা।

আঁৎকে ওঠার কৃত্রিম ভঙ্গি করে এক পা পিছিয়ে গেল কর্নেল। 'সর্বনাশ!'

'রাজি না হলে,' বলল বনেটি, 'এই ছুরি দিয়ে প্রথমে একটা কান। তারপর পাছার খানিকটা মাংস। এইভাবে এগোবে ব্যাপারটা।'

'থাক-থাক, আর বলতে হবে না, বুঝেছি,' দ্রুত বলল খানজুম। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল সে, আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর হাত বাড়াল টেলিফোনের দিকে।

'তোমাদের ভাষা বুঝি, কাজেই কোনরকম চালাকি করতে যেয়ো না,' সতর্ক করে দিল জালুচি।

রিসিভার তুলে দ্রুত, সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলল খানজুম। 'গার্ডরুম? আমি কর্নেল। স্পেশাল ব্লকের আটশো তিরিশ নম্বর সেলে মার্কিন কয়েদী ববি ইউজিন আছে, সার্জেন্ট ওয়াকেমকে বলো সে যেন আমার কাছে নিয়ে আসে ওকে।' রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

'ববিকে স্পেশাল ব্লকে রাখা হয়েছে কেন?' জানতে চাইল রানা।

'বেয়াদবি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, তাই। লম্বা চুলো এই মার্কিন ছোকরা আইন শৃঙ্খলার ধার ধারে না।'

'ববিকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যাবে তো?' কঠিন সুরে বলল জালুচি।

কাঁধ ঝাঁকাল কর্নেল। চুপ করে থাকল। একে একে সবার দিকে একবার করে তাকাল সে। সব শেষে লিলির দিকে। আবার তার গম্ভীর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। নিজের পাশে ডিভানের ওপর চাপড় দিল সে, বলল, 'যা হবার তা তো হবেই, তার আগে এখানে, আমার পাশে একবার বসবে নাকি, প্রিয় ফুল? তোমাকে একটু শ্যাম্পেন দিই? স্পেশাল ব্লক থেকে ববিকে নিয়ে আসতে একটু সময় লাগবে।'

'শ্যাম্পেন? না।' এই প্রথম লক্ষ করল রানা, নার্ভাস দেখাচ্ছে লিলিকে, একটু কাঁপছে সে। 'আমি বরং একটু ব্র্যান্ডি পেলে খুশি হই।'

উঠে দাঁড়াল খানজুম। সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন দেখাল তাকে। কোণের কাবার্ডের দিকে এগোল সে, কাবার্ড থেকে ব্র্যান্ডির বোতল আর গ্লাস নিয়ে ফিরে এল টেবিলের কাছে। বোতল থেকে শ্যাম্পেন আর ব্র্যান্ডি ঢালল। এগিয়ে এসে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিল লিলির দিকে। নিচু গলায় ধন্যবাদ জানিয়ে সেটা নিল লিলি।

লিলির কাঁধে একটা হাত রাখল কর্নেল। 'ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছ! শুকনো কিছু একটা দিই?' অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে কাঠের আলমিরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। কবাট খুলে কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেতরে বসে থাকা মেয়েটার দিকে তাকাল একবার। আলমিরা থেকে বের করল একটা মিলিটারি গ্রেটকোট। কলারটা ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি। মাতাল, স্তম্ভিত মেয়েটা কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাকে গ্রাহ্য না করে কবাট বন্ধ করে দিল খানজুম।

কোটটা খুলে বাড়িয়ে দিল সে। মুখে স্মিত হাসি। কেমন যেন অপ্রতিভ দেখাল লিলিকে, কিন্তু উঠে দাঁড়াল সে। ভিজে বোরখা খুলে ফেলে কর্নেলের হাত থেকে গ্রেটকোটটা নিল। সেটা তাকে পরতে সাহায্য করল কর্নেল। আবার নিচু গলায় ধন্যবাদ জানাল লিলি।

'ব্যাটা নাম্বার ওয়ান খচ্চর!' প্রশংসার সুরে বলল সলোজা। 'বিশ্বাস করো যীশুর মা, ইসরায়েলি মিলিটারি অফিসারদের মেয়ে পটাবার ট্রেনিংও যে দেয়া হয় তা আমার জানা ছিল না!'

রানার কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই অস্বস্তিকর লাগল। প্রতি মুহূর্তে কর্নেলের আচরণ যেন উৎকট প্রহসন হয়ে উঠছে। আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল সলোজা, ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে বলল। বাইরের বারান্দায় পায়ের আওয়াজ পেয়েছে ও। পরমুহূর্তে নক হলো দরজায়।

ছড়িয়ে পড়ল সবাই। দ্রুত পজিশন নিল। কর্নেলের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা।

হিব্রু ভাষায় সাড়া দিল কর্নেল। সাথে সাথে খুলে গেল দরজা, দোর-গোড়ায় দেখা গেল পায়ে লোহার বেড়ী পরানো একজন কয়েদীকে। পরনে সুতী, চেক-কাটা কাপড়ের পাজামা। পিছন থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল কেউ তাকে। ছিটকে ঘরের ভিতর চলে এল কয়েদী, আছাড় খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল মেঝেতে, একটা হাঁটু গেড়ে পতনটা কোন রকমে সামলে নিল। তার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল প্রকাণ্ড

দানব—সার্জেন্ট ওয়াকেম।

পা ছুঁড়ে দরজা বন্ধ করল বনেটি, এক পা এগিয়ে ওয়াকেমের বুকের পাশে পাঁজরের ওপর চেপে ধরল অ্যাসল্ট রাইফেলের মাজল। সার্জেন্টের হোলস্টার থেকে সার্ভিস রিভলভারটা তুলে নিল রানা। কর্নেলের মতই, সার্জেন্টের মধ্যেও তেমন কোন বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল না। তার মানে, দুজনেই ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক পাত্র। কোন কিছুতেই উত্তেজিত হতে জানে না। জালুচি নির্দেশ দিতেই শান্তভাবে হাত দুটো ঘাড়ের পিছনে তুলল ওয়াকেম।

এক নজর দেখেই বোঝা যায়, কয়েদীর অবস্থা শোচনীয়। মুখের বাঁ দিকটা থেঁতলানো, কম করেও তিনটে সেলাই লাগবে। হাতেও কয়েক জায়গায় চামড়া উঠে গেছে। প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে তাকে।

মেঝেতে একটা হাঁটু গেড়ে তার সামনে নিচু হলো রানা। 'ববি ইউজিন?'

'সন্দেহ নেই,' কর্কশ, ভাঙা গলায় বলল কয়েদী। পুরোপুরি সচেতন বলে মনে হলো না, কেমন যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ অনুভব করল রানা, সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে ববি। রহস্যময় লাগল ব্যাপারটা।

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল রানা। 'তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। এখান থেকে তোমাকে আমরা বের করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কি!' চমকে উঠল ববি। 'কি বললেন? এই জেল থেকে আমাকে বের করে নিয়ে যেতে এসেছেন?' চোখের দৃষ্টিতে এবার প্রকট হয়ে উঠল আতঙ্ক। 'আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না!' দৃষ্টিতে আতঙ্ক, কিন্তু চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু। তার সমস্ত অনুভূতি যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

'বোঝার দরকার নেই,' বলল রানা। কর্নেলের দিকে ফিরল ও। 'বেড়ী খুলে দিতে বলো।'

অর্ডার করল কর্নেল। পকেট থেকে চাবি বের করে এগোল সার্জেন্ট ওয়াকেম। তাকে এগোতে দেখে চোখ-মুখ বিকৃত করে পিছু হটে গেল ববি, আহত পশুর মত দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে। রানার অনুমানই ঠিক, ঘোরের মধ্যে রয়েছে ববি।

এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে দাঁড় করাল রানা। রানাকে নিয়ে টলতে শুরু করল সে। চেহারায় হতভম্ব একটা ভাব ফুটে উঠল। এই সুযোগে তার পায়ের বেড়ী খুলে দিল ওয়াকেম।

কর্নেলের দিকে তাকাল রানা। 'এখুনি রওনা হব আমরা। উঠান পেরোতে ববিকে সাহায্য করবে সার্জেন্ট, বলে দাও ওকে। সবাই একটা ট্রাক নিয়ে বেরুব কারাগার থেকে। তুমি ড্রাইভ করবে, সলোজা। ক্যাবে তোমার সাথে বসব আমি, আমাদের মাঝখানে থাকবে কর্নেল। বাকি সবাই পেছনে।' আবার কর্নেলের দিকে ফিরল রানা। 'সোজা মেইন গেট দিয়ে আমাদের বাইরে নিয়ে যাচ্ছ তুমি। সব পরিষ্কার?'

'সব।'

সার্জেন্টের সাথে দ্রুত কথা বলল কর্নেল। এবারেও সার্জেন্টের চেহারায় কোন রকম হতাশা, বিস্ময় বা রাগের ভাব দেখা গেল না। শান্তভাবে ববির কনুই চেপে ধরল সে, তাকে নিয়ে এগোল দরজার দিকে। দরজা খুলে পাশে অপেক্ষা করছে বনেটি।

এক পাশে সরে এসে কর্নেলকে ইঙ্গিত করল রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল কর্নেল। তাকে অনুসরণ করল লিলি। বাকি সবাই তার পিছু নিল।

বাগানের ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। এখনও অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরছে। বাগানের গেট খুলল ওয়াকেম, ববিকে সাথে নিয়ে পেরোতে শুরু করল সেটা।

গেটের সামনে চলে এল কর্নেল। কিন্তু এক পাশে সরে দাঁড়াল সে, জায়গা করে দিল লিলিকে, বলল, 'তুমি আগে, প্রিয় ফুল।'

লিলি যেন নিজের অজান্তেই একটু হাসল, উত্তরে নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ, প্রচণ্ড শক্তিতে লিলিকে ধাক্কা দিয়ে রানার ওপর ছুঁড়ে দেবার সময়ও এতটুকু ম্লান হলো না হাসিটা। লাফ দিয়ে একটা ঝোপ টপকাল সে, তীর বেগে ছুটল, সেই সাথে চিৎকার করে নির্দেশ দিল ওয়াকেমকে।

টলমল করতে করতে গেট দিয়ে পিছিয়ে এল ববি। চৌরাস্তার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটছে ওয়াকেম। ইচ্ছে করলেই তাকে গুলি করে ফেলে দিতে পারে রানা, কিন্তু কোন লাভ নেই। এক হাত বাড়িয়ে ববিকে ধরে ফেলল ও, অপর হাত দিয়ে ট্রাকগুলো দেখাল, বলল, 'ওদিকে, কুইক!'

গেট দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। একই সময়ে প্রধান ফটকের পাশের গার্ডরুম থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল চার-পাঁচজন সৈনিক। বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু ইতিকর্তব্য স্থির করতে পারল না। চৌরাস্তা ধরে একদল লোককে ছুটতে দেখল তারা, কিন্তু ওদের পরনে ইসরায়েলি সামরিক পোশাক লক্ষ্য করে শত্রুর খোঁজে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে।

অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল ওয়াকেম, হিব্রু ভাষায় নির্দেশ দিতে শুরু করল সে। সাথে সাথে ঘি পড়ল আগুনে।

সবচেয়ে কাছের সৈনিকটা মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। ফুল অটোমেটিকে দেয়া অ্যাসল্ট রাইফেল, রানা আর ববির কাছ থেকে এক গজ ডান দিকে নুড়ি পাথরের ওপর পড়ল বুলেটের প্রথম ঝাঁক। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কুচোপাথর। রানার গায়ের ওপর ঠেস দিয়ে আছে ববি, এ অবস্থায় বিশেষ কিছু করার নেই ওর, তবে পেছন থেকে কেউ একজন পর পর তিন কি চারটে গুলি করল, চৌরাস্তা থেকে শূন্যে উঠে পড়ল সৈনিকের পা দুটো, উড়ে গিয়ে পড়ল একটা ট্রাকের গায়ে, সেখান থেকে কংক্রিটের মেঝেতে।

তার সঙ্গীরা গুলি করতে করতে পিছু হটতে শুরু করল, ওদিকে রানার পেছন থেকে জবাব দিচ্ছে বনেটি আর জালুচি। ট্রাকগুলোর শেল্টারে গা ঢাকা দিল সৈনিকেরা। কিন্তু তাদের শত্রুরা খোলা জায়গায় আটকা পড়ে গেল। ফটকের ওপর থেকে একজন সৈনিক গুলি করল দু'বার, রানার পায়ের কাছে এসে পড়ল বুলেট দুটো। ববিকে এক হাত দিয়ে ধরে রেখে এক ঝটকায় ডান কোমরের

হোলস্টার থেকে স্টেচকিন মেশিন-পিস্তলটা বের করল রানা। ফুল অটোমেটিকে সেট করল সেটা। মাত্র একবার ট্রিগার টিপল ও। বেরিয়ে গেল পনেরো রাউন্ড বুলেট। খিলানের মাথা থেকে গেটওয়ে টানেলের প্রবেশ মুখে পড়ল লাশটা।

ববির অপর হাতটা চেপে ধরল সলোজা, তাকে মাঝখানে নিয়ে ট্রেন লক্ষ্য করে ছুটল ওরা। ঠিক পেছনেই রয়েছে লিলি। প্রথম বক্সকারে ববিকে তুলে দিল ওরা, পিছু হটতে হটতে ওদের পাশে এসে দাঁড়াল বনেটি আর জালুচি। দু'জনেই কোমরের কাছ থেকে গুলি করছে অবিরত।

রেললাইনের পাশে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো রানা, হুইলের ফাঁক দিয়ে চৌরাস্তার দিকে তাকাল ও। দমে গেল মন। ভোজবাজির মত উঠানের চারদিক থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে সৈনিকরা। প্রায় সবারই খালি গা, কিন্তু হাত কারও খালি নয়।

বক্সকার লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করল ওরা, হুইলে লেগে দিগ্বিদিক ছুটে যাচ্ছে বুলেটগুলো। ক্রল করে রানার পাশে চলে এল জালুচি। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল সে। 'অবস্থা মোটেও সুবিধের নয়, রানা। আমাদের প্ল্যানেই ত্রুটি ছিল।'

জালুচির ঠিক মাথার ওপরে, কাঠের বর্ডারের গায়ে একটা বুলেট ঢুকল, কাঠের পাতলা একটা ছাল ছিটকে এসে ধারাল ক্ষুরের মত আঁচড় বসাল তার নাকের পাশে। উহ্ করে উঠে মুখে হাত তুলল সে। হাতটা চোখের সামনে এনে দেখল, রক্তে ভিজে গেছে সেটা।

'বেজন্মা কুত্তারা! দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি!'

বেল্ট থেকে একটা হ্যান্ড গ্রেনেড বের করল জালুচি। পিন খুলে বক্সকারের মাথার ওপর দিয়ে ফটকের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। একটা ট্রাকের ওপর পড়ল সেটা, ড্রপ খেয়ে দুটো ট্রাকের মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় নেমে গেল। কেউ একজন চিৎকার করে সতর্ক করে দিল। সাথে সাথে ট্রাকগুলোর আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল কয়েকজন সৈনিক। আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়ল জালুচিও। পাগলের মত হাসছে। কোমরের কাছ থেকে গুলি করে তিনজন সৈনিককে শুইয়ে দিল সে।

এক সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। কাত হয়ে পড়ল একটা ট্রাক, সেই সাথে বিস্ফোরিত হলো পেট্রল ট্যাংক। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ইস্পাত, কাঠ আর জ্বলন্ত আবর্জনা।

উঠান জুড়ে শুধু আগুন আর আগুন। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ব্যর্থ ছুটোছুটি করছে দিশেহারা সৈনিকরা। মুহূর্তের জন্যে থামছে না জালুচি আর বনেটির রাইফেল।

প্রায় নিরাবরণ একটা মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল উঠানে, একটা লাশের সাথে হোঁচট খেয়ে আছাড় খেল। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটার দিকে ছুটল ওয়াকেম, এক হাত দিয়ে সাব-মেশিনগান চালাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই সার্জেন্টকে শুইয়ে দিতে পারে রানা, কিন্তু ইচ্ছেটা জাগলই না মনে। আর

যাই হোক, লোকটা সাহসী বটে।

রানার বাঁ কাঁধে ঘষা খেল একটা বুলেট, পরমুহূর্তে কয়েক ঝাঁক বুলেট এসে ওদের মাথার ওপর বক্সকারে বিঁধল। পেছন ফিরে দাঁড়াতেই কর্নেল খানজুমকে দেখতে পেল রানা, বাড়ির দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে অ্যাসল্ট রাইফেল দিয়ে গুলি করছে। তার পাশেই কয়েকজন সৈনিককে দেখা গেল, তেপায়ার ওপর একটা মেশিনগান বসাবার চেষ্টা করছে তারা।

রানার শার্টের আস্তিন ধরে টান দিল সলোজা। 'এখানে থাকলে মারা পড়তে হবে। ভেতরে চলো।'

বক্সকার থেকে ববিকে নামাল রানা, তাকে দু'পায়ের ওপর দাঁড় করাল। ট্রেনের গা ঘেঁষে ছুটল ওরা। ইঞ্জিন শেডের ভেতর চলে এল। পিছু পিছু ঢুকল বনেটি। কিন্তু আগের জায়গা থেকে নড়ল না জালুচি। পাগলের মত এখনও হাসছে সে, এলোপাতাড়ি গুলি করছে। তবে লাইট মেশিনগান চালু হতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে ইঞ্জিন শেডের ভেতর চলে এল সে-ও।

লোকোমোটিভের পাশে দেয়ালের গায়ের কাছে ববিকে বসিয়ে দিল রানা। জায়গাটা গরম। উত্তপ্ত লোহা আর বাষ্পের গন্ধ ঢুকল নাকে। লিলির দিকে তাকাল রানা। হাঁপাচ্ছে সে, ভয়ে নাকি পরিশ্রমে, ঠিক বোঝা গেল না।

'শরীর খারাপ লাগছে?' জানতে চাইল রানা।

দ্রুত মাথা নাড়ল লিলি। 'এখন কি হবে, রানা?' রাজ্যের উদ্বেগ ফুটে উঠল তার চেহারায়।

'জানি না।' নিজের চারদিকে তাকাল রানা। বাইরে এখনও জ্বলছে কাত হয়ে পড়া ট্রাক, আগুনের আভায় আংশিক আলোকিত হয়ে আছে শেডের ভেতরটা। 'মনে হচ্ছে পথের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছি।'

শেডের প্রবেশ মুখে শুয়ে আছে জালুচি, নজর রাখছে বাইরে।

'কিছু বুঝছ?' জানতে চাইল রানা।

'শালা খানজুম নিজের লোকজন গুছিয়ে নিচ্ছে,' বলল জালুচি। 'ফ্রন্টাল অ্যাটাকের জন্যে তৈরি থাকো।'

বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের সাথে চিৎকার করে উঠল বনেটি। 'কি এটা! এটা কি! একটা মেশিনগান!'

'যীশু মিয়া, জিন্দাবাদ!' উল্লাসে লাফিয়ে উঠল সলোজা।

ইঞ্জিন টেন্ডারের পর প্রথম বক্সকার, তার ছাদে রয়েছে মেশিনগানটা। অবাক কাণ্ড, এটা একটা রাশিয়ান আর.পি.ডি; হানড্রেড রাউন্ড ড্রাম ম্যাগাজিন ব্যবহার করা হয়। পাশেই রয়েছে অ্যামুনিশন বক্স, তাতে আটটা ড্রাম রয়েছে। মনে মনে খুশি হয়ে উঠল রানা। পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, এই অবস্থায় মেশিনগানটাকে বিরাট একটা সহায় বলে মনে হলো ওর।

বক্সকার থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা। শেডের প্রবেশ মুখে জালুচির পাশে চলে এল ও। ট্রাকগুলোর কাছে একদল সৈনিক আগুন নেভাবার জন্যে ছুটোছুটি করছে। হাতে হাতে ঘুরছে পানি ভর্তি বালতি। ওদিকে ভিলার পাঁচিলের

পাশে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ জন লোক নিয়ে তৈরি হচ্ছে কর্নেল খানজুম। সার্জেন্ট ওয়াকেমের সাথে কি যেন পরামর্শ করছে সে।

ঠোঁটে একটা সিগারেট গুঁজল জালুচি। 'কেমন বুঝছ, রানা?'

উত্তর দেবার অবকাশ পেল না রানা। প্রচণ্ড একটা উল্লাস ধ্বনি ভেসে এল পিছন থেকে, তারপরই শোনা গেল সলোজার গলা। 'হেই, রানা, দেখে যাও কি পেয়েছি আমি!'

কখন যেন লোকোমোটিভের ক্যাবে চড়েছিল সলোজা, এখন তাকে দোর-গোড়ায় দেখা গেল। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে রোগা-পাতলা একজন লোককে। লোকটার পরনে নোংরা শার্ট আর ট্রাউজার, মাথায় সুতী কাপড়ের টুপি। মুখটা ঘামে ভেজা। ঠক ঠক করে কাঁপছে সে।

ছোট খাট লোকটা রানাকে দেখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। ধমক লাগাল রানা, 'অ্যাই, চোপ! কাঁদলে একেবারে শেষ করে ফেলব!'

'হুজুর মা-বাপ!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল লোকটা 'আমি কোন অন্যায় করিনি! এই ট্রেনের ড্রাইভার আমি, ঘুম পেয়েছিল বলে···'

'ইংরেজী তো বেশ ভালই জানো,' বলল রানা। 'নাম কি তোমার?'

'ইংল্যান্ডে কাজ শিখেছি, হুজুর, তাই ইংরেজীটা মন্দ বলি না।' কাঁপুনির জন্যে থেমে থেমে কথা বলছে সে। 'আমার নাম ইবান, হুজুর—আপনার চিরকেলে গোলাম, যা হুকুম করবেন তাই করব, শুধু প্রাণে মারবেন না···'

'ট্রেনের ওপর কি করছিলে?'

'ফায়ার বক্সের পাশে জায়গাটা গরম, তাই ওখানেই শুয়ে ঘুমাচ্ছিলাম, হুজুর। গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল···'

'ফায়ার বক্সে আগুন জ্বলছে এখনও?'

মাথা কাত করতে গিয়ে একদিকে একেবারে নুয়ে পড়ল ইবান, তার পিছনে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে হাসি চাপল সলোজা। 'জ্বে হুজুর! সকাল সাতটায় রওনা হবার কথা···'

'কোথায়?'

'তেল আবিব, হুজুর,' বলল ইবান। সকালেই স্টীম দরকার হবে, তাই আগুন আর নেভাইনি।'

শেডের প্রবেশ মুখ থেকে ওদের কথা শুনছিল জালুচি, বলল, 'আসল কথা বলো,' ট্রেনের চাকার গায়ে লাথি মারল সে, 'এটা ঘুরবে কিনা?'

'এখুনি, হুজুর?' কাঁপুনি থেমে গেল ইবানের। একটু চিন্তা করল সে। শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম আর চোখের পানি মুছল। 'পুরোদমে ঘুরবে না, বুঝতেই পারছেন।'

দ্রুত জানতে চাইল রানা, 'এই অবস্থায় কত স্পীড পাওয়া যাবে, তাই বলো।'

'ঘণ্টায় পনেরো কি বিশ মাইল।'

'রানা,' বলল সলোজা, 'তুমি কি ভাবছ ট্রেনে করে কেটে পড়তে পারব

আমরা?'

'আর তো কোন উপায় দেখছি না। ভাবছি, ফটক ভেঙে বেরিয়ে যাবার মত যথেষ্ট স্পীড তোলা সম্ভব কিনা!'

ইবানের কাঁধে টোকা দিল সলোজা। 'এই, বানচোত, কয়লা কি রকম আছে?'

সামান্য একটু মাথা নেড়ে তার পিছনে দাঁড়ানো সলোজার দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ইবান, বলল, 'হুজুর, ওকে আমার সাংঘাতিক ভয় করছে!'

হো হো করে হেসে উঠল সলোজা। 'ব্যাটা কানা নাকি? ভয় তোর ওই হুজুরকে পাওয়া উচিত। ওর তুলনায় আমি তো গোলাপ ফুল।' পরমুহূর্তে ইবানের মাথায় আঙুলের উল্টোপিঠের গিঁট দিয়ে গাঁট্টা মারল সে। 'জবাব দে। কত কয়লা আছে?'

'আছে, হুজুর,' তাড়াতাড়ি বলল ইবান। 'কিন্তু খুব বেশি নয়।'

রানার দিকে তাকাল সলোজা। 'নিশ্চিত হবার একটাই উপায় আছে।' বনেটির দিকে ফিরল। 'কয়লা ঢেলে আগুনটাকে বাড়াও দেখি। আগুনের আওয়াজ শুনে বলতে পারব কতটা স্পীড পাওয়া যাবে।'

সাথে সাথে কাজে হাত লাগাল বনেটি। চেহারায় হতভম্ব ভাব ফুটিয়ে তুলে ইবান বলল, 'হুজুর কি ট্রেন হাইজ্যাক করবেন?'

'তুমি করবে,' বলল রানা। 'আমরা প্যাসেঞ্জার হিসেবে থাকব।'

'মাফ চাই, হুজুর!' হাত জোড় করে মিনতির সুরে বলল ইবান। ভয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেছে চেহারা। 'কর্নেল আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন!'

'কিন্তু কথা না শুনলে আমি তোকে জবাই করব,' শান্ত হাসির সাথে বলল সলোজা। আবার ইবান কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে কঠোর হয়ে উঠল তার চেহারা। 'যা বলছি শোন্। যা, ক্যাবে উঠে কাজ শুরু কর। কোন রকম গোলমাল করছিস দেখলে বিনা নোটিশে উড়িয়ে দেব মাথার খুলি।'

কয়েক সেকেন্ড স্থির পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকল ইবান, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে, সলোজাকে পাশ কাটিয়ে এগোল। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে আপনমনে। ফুট প্লেটে উঠে পড়ল সে।

লোকোমোটিভ থেকে নিচে নেমে পড়ল রানা, দু'হাত দিয়ে ধরে খাড়া করল ববিকে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক টলতে শুরু করল ববি। তার একটা কাঁধ ধরে রাখল রানা।

'আচ্ছা, বলতে পারেন, আমার ঘুমটা ভাঙবে কখন?' বিড় বিড় করে বলল ববি। 'উঁহুঁ, আপনি বোধহয় বলতে পারবেন না! আপনার কি এই রকম কখনও হয়েছে: এই যে জেগে আছি অথচ মনে হয় জেগে নেই! ঘুমিয়ে আছি অথচ মনে হয় ঘুমিয়ে নেই। তাজ্জব ব্যাপার!'

'খুবই,' বলে মুক্ত হাত দিয়ে বক্সকারের স্লাইডিং ডোরটা ঠেলে খুলে ফেলল রানা। এই বক্সকারের ছাদেই রয়েছে মেশিনগান। 'ভেতরে ঢুকে লক্ষ্মী ছেলের মত মাথা নিচু করে বসে থাকো।' ববিকে ঘোরাল ও, উঁচু করে তুলে ঢুকিয়ে দিল

বক্সকারের ভেতর। লিলিকে বলল, 'ওকে দেখো তুমি। পারবে তো?'

'তা পারব। কিন্তু ওর অবস্থা খুব খারাপ, তাই না?'

'আমাদের কার অবস্থাই বা ভাল!'

কাঁধ ঝাঁকাল লিলি। বক্সকারে ঢুকে ববির পাশে বসল সে।

শেডের প্রবেশ মুখে আবার ফিরে গেছে জালুচি। হঠাৎ রানাকে ডাকল সে। 'তাড়াতাড়ি এসো, রানা! মজার কাণ্ড!'

জালুচির পাশে চলে এল রানা। দেখল, চৌরাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর সাদা একটা রুমাল দোলাচ্ছে কর্নেল খানজুম।

'ব্যাপারটা কি বলো তো, রানা?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সলোজা। 'শালা খচ্চর নিশ্চয়ই কোন মতলব পাকিয়েছে!'

'ঠিক আছে, ওর সাথে কথা বলছি আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু এই ফাঁকে আমাদের রওনা হবার সমস্ত আয়োজন শেষ করো তুমি।' অ্যাসল্ট রাইফেলটা কাঁধে ফেলল রানা। এগোল।

পিছন থেকে ওর কাঁধে হাত রাখল সলোজা। 'ইহুদীর বাচ্চাকে বিশ্বাস করা কি উচিত হচ্ছে, রানা? অনুমতি দাও, তোমার প্রতিনিধি হিসেবে আমি যাই।'

'না,' বলল রানা। 'ঝুঁকি যদি নিতেই হয়, লীডার সাহেবকেই নিতে হবে।'

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল রানা। মাত্র কয়েক গজ এগিয়ে সিগারেট ধরাবার অজুহাতে দাঁড়িয়ে পড়ে বাকি পথটা কর্নেলকে পেরিয়ে আসতে দিল। নির্মল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ। 'ভারি বুদ্ধি তোমার, মি. রানা। অত্যন্ত স্বাভাবিক আচরণ, অথচ বিপদসীমার বাইরে পা দিতে হলো না!'

'কাজের কথা থাকলে বলো,' বলল রানা। 'কি আলোচনা করতে চাও তুমি?'

'তুমি যে খুব কাজের লোক, এটুকু অন্তত বুঝে নিয়েছি,' হাসিমুখে বলল খানজুম। 'কিন্তু তোমার কপাল খারাপ, এ-যাত্রা হেরে গেলে!'

ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করল রানা।

'কি হলো!' অবাক দেখাল কর্নেলকে। 'রাগ করে চলে গেলে চলবে কেন!'

দাঁড়াল রানা। কর্নেলের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখল, ট্রাকের আগুন নেভাবার কাজ এখনও চলছে পুরোদমে। লালচে আগুনের পিছনে কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে নড়তে চড়তে দেখল ও। বুঝল, নানা দিক থেকে ওর দিকে অ্যাসল্ট রাইফেল তাক করে আছে সৈনিকরা, সার্জেন্ট ওয়াকেমের কাছ থেকে অর্ডার পেলেই গুলি করবে।

বৃষ্টি থেমে গেছে। দু'একটা তারাও দেখা গেল আকাশে।

'সংক্ষেপে পরিষ্কার করে বলো কি চাও।'

'কি আশ্চর্য! বুঝতে পারছ না?' অবাক দেখাল কর্নেলকে। 'তোমাদের কোন আশা নেই, সেটা কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে? কি লাভ আরও প্রাণহানি ঘটিয়ে? তারচেয়ে পরাজয় মেনে নাও…'

'এবং বাকিটা জীবন এখানে কয়েদী হিসেবে কাটিয়ে দিই? মন্দ নয়! আশ্রয় দিতে চাওয়ার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা তোমাদের গলগ্রহ হতে চাই না।'

'জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছ!' রাগে লাল হয়ে উঠল কর্নেলের চেহারা। 'বুঝতে পারছ না, আমি যদি সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করি, আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমরা মারা পড়বে সবাই? অন্তত মেয়েটাকে বাঁচতে দাও!'

একটু চিন্তার ভান করে রানা বলল, 'ঠিক আছে, দাঁড়াও, লিলিকে জিজ্ঞেস করে দেখি ও কি বলে।'

ইঞ্জিন শেডে ফিরে এল রানা। পৈত্রিক প্রাণের জন্যে উন্মত্তের মত বেলচা দিয়ে আগুনে কয়লা ফেলছে বনেটি। রাতের নির্মল বাতাস বাষ্পের গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে।

'কি চায় শালা?' জানতে চাইল সলোজা।

'সারেন্ডার করতে বলছে। রওনা হবার জন্যে আমরা কি তৈরি?'

ইবানের দিকে ফিরল সলোজা। 'কি রে, বুড়বাক?'

ঢোক গিলে; চোখ পিট পিট করে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করল ইবান। 'আপনারা যদি হুকুম করেন, হুজুর। কিন্তু আমি আবার বলছি, ফুল পাওয়ার পাব না আমরা। তখন আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।'

'ঠিক আছে। অর্ডার দিলেই ছেড়ে দেবে ট্রেন। প্রথম চেষ্টায় ফটক ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া চাই। ব্যর্থ হলে আমাদের সাথে তুমিও মারা পড়বে।' আর সবার দিকে তাকাল রানা। 'মেশিনগানে থাকো একজন। আমরা রওনা হব, সেই সাথে চালু হবে ওটা। ওদের কেউ যেন মাথা তুলতে না পারে।'

'ওসব আমার ওপর ছেড়ে দাও, রানা,' বলল জালুচি। মই বেয়ে বক্সকারের মাথায় উঠে গেল সে।

রানার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে ফুটপ্লেটে উঠে পড়ল সলোজা।

'সব রেডি, কেমন?' বলল রানা। শার্টের আস্তিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল ও। 'আমার অর্ডারের অপেক্ষায় থাকো সবাই।'

আবার উঠানে বেরিয়ে এল রানা। ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মত আগের জায়গাতেই অপেক্ষা করছে কর্নেল খানজুম। রানা তার সামনে এসে দাঁড়াতে একগাল হাসল সে।

'কি বলল আমার প্রিয় ফুল?'

'বলল, ব্রান্ডিটুকু ভাল লেগেছে ওর, কিন্তু সঙ্গটা নয়।'

'আফসোস!' কাঁধ ঝাঁকাল খানজুম। সারা মুখে বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'সেক্ষেত্রে ওকে নয়, ওর মাথা চাই আমি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। রানাও তাড়াতাড়ি ফিরে এল ইঞ্জিন শেডের ভেতর।

'রেডি, স্টেডি, গো!' অর্ডার দিল ও। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বক্সকারে। দেখল ববির পাশে থমথমে মুখে বসে আছে লিলি। তার পাশে ধপ্ করে বসে পড়ল ও।

হিস্‌স শব্দে বাষ্প ছুটল। ঘুরতে শুরু করল চাকা। কর্কশ যান্ত্রিক আওয়াজ পাঁচিলে লেগে তুমুল প্রতিধ্বনি তুলল। ধোঁয়াটে বাষ্পে ঢাকা পড়ে গেল সামনের চাকাগুলো। হুস্ করে বেরিয়ে পড়ল আরও একরাশ বাষ্প। চাকার গতি বাড়ছে।

পরমুহূর্তে শেড থেকে বেরিয়ে এল ট্রেন।

মাত্র অর্ধেক পথ ফিরে গেছে কর্নেল খানজুম। থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল, স্যাঁৎ করে মাথার ওপর উঠে পড়ল একটা হাত, নিজের লোকদের ইঙ্গিতে কি যেন বোঝাতে চাইছে সে। সম্ভবত গুলি করতে বলছে। কিন্তু প্রতিপক্ষের তরফ থেকে গোলাগুলি শুরু হবার আগেই গর্জে উঠল বক্সকারের মাথা থেকে মেশিনগান। চৌরাস্তার এক দিক থেকে আরেক দিক পর্যন্ত ব্রাশ ফায়ার করল জালুচি। অ্যাসল্ট রাইফেলধারী দুটো গ্রুপকে ধরাশায়ী করল সে। হতভম্ব বাকি গ্রুপগুলো লাশ আর আহতদের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল।

ক্রমশ বাড়ছে ট্রেনের গতি। চৌরাস্তার ওপর দিয়ে ঘণ্টায় সম্ভবত দশ মাইল স্পীডে ছুটছে। চৌরাস্তার মাঝখানে চলে এল ট্রেন, এই সময় গুলি শুরু হলো। বক্সকারের দরজা থেকে রাইফেলে জবাব দিল রানা। ওর পিছন থেকে, ফুটপ্লেটে দাঁড়িয়ে সলোজা আর বনেটিও গুলি করল।

দেখতে দেখতে প্রথম কারটা টানেলের ভেতর ঢুকে পড়ল। লিলির উদ্দেশে চিৎকার করে বলল রানা, 'শক্ত হয়ে বসো, ঝাঁকি লাগবে!'

পরমুহূর্তে ফটকের সাথে সংঘর্ষ হলো ট্রেনের। কাত হয়ে গেল বক্সকার, উল্টে যাওয়াটা বোধহয় আর ঠেকানো গেল না। তারপরই আরেক দিকে কাত হলো সেটা। কিন্তু এবারের হেলে পড়াটা তেমন বিপজ্জনক নয়। সিকি সেকেন্ডের জন্যে মনে হলো, ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপরই, যেন অনেক কষ্টে, আবার সামনে বাড়তে শুরু করল ট্রেন। প্রকাণ্ড ফটকের জোড়া পাল্লা দু'দিকে পড়তে শুরু করল স্লো-মোশন ছবির মত।

শোরগোল, চিৎকার, গোলাগুলির আওয়াজ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, সেই সাথে বাড়ছে ইঞ্জিনের শব্দ। কারাগার থেকে দ্রুত আরও দূরে চলে যাচ্ছে ট্রেন।

সাত

পরিষ্কার আকাশ। মাঝখানে চাঁদকে নিয়ে মেলা বসেছে তারার। ট্রেনের ক্যাব থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল সলোজা, বলল, 'শালাদের খুব এক হাত দেখিয়েছি, কি বলো, রানা?'

'আসছি,' বলল রানা। ফিরল লিলির দিকে। 'তোমার খবর কি? অসুস্থ লাগছে?'

'না। কিন্তু ববির ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। একেবারে আধমরা হয়ে গেছে। আর কিছুদিন ওদের হাতে থাকলে মারাই যেত…'

লিলির কোলে মাথা রেখে সীটের ওপর শুয়ে আছে ববি, চোখ দুটো বন্ধ।

'নজর রাখো, প্রয়োজন মনে করলে ডেকো আমাকে।'

অ্যাসল্ট রাইফেলটা লিলির পাশে রাখল রানা। বার ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় বক্সকারের সাইড দিয়ে টেন্ডার পর্যন্ত এগোতে হলো ওকে। ওখান থেকে ফুটপ্লেটে

পৌঁছানো পানির মত সহজ।

কয়লার আগুন গর্জন করছে। বেলচা হাতে এখনও নিজের কাজ করে চলেছে বনেটি। তার সারা শরীর ভিজে গেছে ঘামে। কিন্তু ট্রেনের গতি তবু পনেরো মাইলের বেশি ওঠেনি।

ইবানকে বলল রানা, 'মুয়ালার কত কাছে যেতে পারি আমরা?'

'আধ মাইল, হুজুর। ওখানে একটা টানেল আছে, এখান থেকে মাইল পনেরো দূরে।'

'বানচোত বলে কি!' মারমুখো হয়ে বলল সলোজা। 'পনেরো মাইল না তোর মাথা! বড়জোর তার অর্ধেক!'

'সোজাসুজি গেলে তাই, হুজুর,' বলল ইবান। 'কিন্তু সামনের কয়েক জায়গায় লুপের মত আকৃতি নিয়ে আছে রেললাইন। লাইন যখন ফেলা হয়েছিল তখন এটাই ছিল শর্টকাট।'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল বনেটি! তারপর বলল, 'এই খানিক আগে বাঁচার কোন আশাই ছিল না আমাদের। যীশুর বাবার কি কুদরত, দিব্যি এখনও বেঁচে আছি সবাই। রেললাইনটা বেঁকে গেছে বলে সারাটা দুনিয়া যদি ঘুরতে হয় তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই।' মনের আনন্দে গনগনে আগুন থেকে একটা জ্বলন্ত কয়লার টুকরো বেলচা দিয়ে তুলে বাইরে ফেলে দিল সে। সেটাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে গিয়ে কি দেখতে পেল সলোজা সেই জানে, স্থির পাথর হয়ে গেল সে।

বলল, 'বনেটি?'

সলোজার পরিবর্তন লক্ষ্য করে হাসি হাসি ভাবটা বনেটির মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। 'কি ব্যাপার, মামা?'

'এখুনি তাকিয়ো না,' বলল সলোজা। 'কিন্তু আমার যেন মনে হলো, কেউ একজন এই মাত্র এক মুঠো মাটি ফেলল তোমার কফিনে।'

সলোজার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল রানা। ওদিকে রেললাইনের সাথে সমান্তরাল ভাবে এগিয়েছে রাস্তার একটা অংশ। রেললাইন থেকে গজ পঞ্চাশ দূরে হবে রাস্তাটা। সমান গতিতে ছুটে আসছে তিনটে ল্যান্ডরোভার। প্রত্যেকটিতে তেপায়ার ওপর ফিট করা রয়েছে একটা করে মেশিনগান। সামনের ল্যান্ডরোভারে সার্জেন্ট ওয়াকেম আর তিনজন সৈনিকের সাথে কর্নেল খানজুমকে চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল।

পিছনের দুটো ল্যান্ডরোভারের মেশিনগান গর্জে উঠল। সাথে সাথে বক্সকারের ওপর থেকে জবাব পেল তারা। গোলাগুলি শুরু হতেই কর্নেলের ল্যান্ডরোভারের স্পীড বেড়ে গেল, ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল গতিতে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

ল্যান্ডরোভার দুটো থেকে অবিরাম গুলি করা হলেও রাস্তাটা উঁচু-নিচু আর আঁকাবাঁকা বলে সুবিধে করতে পারল না ওরা। সুবিধে অবশ্য জানুচিও করতে পারল না। তবে একটানা নয়, রয়ে সয়ে গুলি করল সে। মিনিট কয়েক পর পাহাড়ী

এলাকার ভেতর ঢুকে পড়ল ট্রেন। চারদিকে পাথুরে টিলা, জলপাই ঝোপে ঢাকা। রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে না।

'রেললাইনের পাশে আবার পড়বে রাস্তা?' ইবানকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পড়বে, হুজুর। পাঁচ-ছয় মাইল পর।'

'কতক্ষণ থাকবে আমাদের পাশে?'

'দেড় দু'মাইলের বেশি নয়। আবার আমরা পাশে রাস্তা পাব ওখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে, মুয়ালা টানেলের কাছাকাছি। এরপর রাস্তাটা রেললাইনের পাশেই থাকবে, টানেল বাদ দিয়ে একেবারে সেই রিভার ক্রসিং পর্যন্ত। টানেলের পর থেকে ওটা আরও মাইল দুই দূরে।'

সলোজাকে বলল রানা, 'জালুচিকে সাবধান করে দিয়ে আসি,' টেন্ডারের ওপর দিয়ে বক্সকারে চলে এল ও।

সামনে কি ঘটতে পারে শুনেও উদ্বিগ্ন হলো না জালুচি। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে, গলায় ফুর্তির ভাব নিয়ে এসে বলল, 'এই রকম চাঁদ আর তারা ঝলমলে রাতে সামনে যদি অ্যাডভেঞ্চার থাকে, তার চেয়ে খুশির কথা আর কি হতে পারে!'

কথাটা জালুচির মুখে উচ্চারিত হলেও, সে যেন রানার মনের কথাই পুনরাবৃত্তি করল। কথাটার মধ্যে পাগলামির ভাব থাকলেও, এই পরিবেশে শুধু অ্যাডভেঞ্চার আর রোমান্সের নেশাই জাগে। পরিষ্কার, উজ্জ্বল আকাশ। মাথার ওপর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তারার মেলা বসেনি। আর কি বড় চাঁদ! তার ধবধবে সাদা উজ্জ্বল আলোয় গোটা পাহাড়ী এলাকা স্নান করছে। উঁচু পাহাড়গুলো যেন কালো ছেঁড়া কাগজের কিনারা, ওগুলোর মাঝখানে ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে উপত্যকাগুলো। আগের চেয়ে বেড়েছে আরও ট্রেনের গতি। টেন্ডারের ওপর দিয়ে ফিরে এল রানা।

রানাকে দেখেই চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল সলোজা।

'প্রথম বিপদটা পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে আশা করছি। কিন্তু মুয়ালা টানেলে পৌঁছে যে বিপদটা ঘটতে পারে বলে মনে করছি তার তুলনায় এটা কিছুই না।'

সস্তা ঈজিপশিয়ান চুরুট ধরিয়ে এক মুখ কটু গন্ধ ছাড়ল সলোজা। 'স্রেফ যদি ট্রেন থামিয়ে নেমে যাই আমরা, আমাদের দেখে ফেলবে ওরা। পায়ে হেঁটে এগোলে, বেশিক্ষণ টিকতে পারব না। ওখান থেকে সৈকত আধ মাইলের ওপর। পিছু নিয়ে ধরে ফেলবে।'

'কিন্তু ট্রেন যদি আমরা টানেলের ভেতর থামাই?' বলল রানা।

'টানেলের ভেতর···?'

'মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। আমাদের নামতে যতটুকু সময় লাগে।'

'তারপর?'

'টানেলের ওদিক দিয়ে ট্রেন বেরুতে দেখলে, বক্সকারের ওপর মেশিনগানটাকে চালু দেখলে ওরা ভাববে আমরা সবাই ট্রেনেই আছি। কাজেই ধরে নেয়া যায়, ট্রেনের পিছু ছাড়বে না ওরা। এই সুযোগে ববিকে সৈকতে বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচুর সময় পাব আমরা।'

'চমৎকার!'

'সিনর রানা,' বেলচা থামিয়ে বলল বনেটি। 'আপনার প্ল্যানের তুলনা হয় না। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এ-যাত্রা বেঁচে যাচ্ছি আমরা।'

'কিন্তু মেশিনগানে কে থাকবে?' জানতে চাইল সলোজা। 'শিকারের মুখে কাকে রেখে যাব আমরা?'

'আমি থাকব,' সাথে সাথে প্রস্তাব দিল বনেটি। 'তার কারণও আছে।'

'কি রকম?' জানতে চাইল রানা।

'আমি তো এমনিতেই মরেছি,' বলল বনেটি। 'এই বিপদ থেকে বেঁচে যাওয়া মানে তো পুরানো বিপদে মাথা গলিয়ে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায় থাকা। মাফিয়া চীফ আমাকে খুঁজছে, নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি, সিনর রানা?'

হো হো করে হেসে উঠল সলোজা।

'এত হাসির কি আছে?' গম্ভীর সুরে বলল বনেটি। 'মাফিয়া আমাকে খুন করবে শুনে…'

'চোপ!' হাসি থামিয়ে ভাগ্নের দিকে কটমট করে তাকাল সলোজা। 'শোন্। রানার পায়ের ধুলো নে। আমার চোদ্দপুরুষের পক্ষে যা সম্ভব নয়, ও তাই করে দেবে বলেছে।'

হতভম্ব দেখাল বনেটিকে। 'সিনর রানা, মামার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না…'

'মাফিয়ার কয়েক জন কেউকেটা লোক বিশেষ কারণে রানার কাছে চির ঋণী রয়েছে,' বলল সলোজা। 'ও যদি কোন অনুরোধ করে সেটা না রেখে পারবে না তারা। এবার বুঝতে পেরেছিস, ব্যাটা শয়তানের ধাড়ী?'

'সিনর রানা!' হাতের বেলচা ফেলে দিয়ে দ্রুত রানার সামনে এসে দাঁড়াল বনেটি। 'আপনি বললে ওরা আমাকে মাফ করে দেবে? সত্যি?'

'তোমার কোন ক্ষতি যেন না করে সে-ব্যাপারে ওদেরকে আমি বলব,' বলল রানা। 'কিন্তু তোমাকেও কথা দিতে হবে, সেই মেয়েটার ব্যাপারে, ভবিষ্যতে তুমি আর তার সাথে অবৈধ সম্পর্কের চেষ্টা করবে না। রাজি?'

'কিন্তু সিনর রানা, মেয়েটা যে আমাকে ভালবাসে! তার চেয়ে আপনি বরং নিজের হাতে আমাকে খুন…'

'তুমিও ভালবাস তাকে?' জানতে চাইল রানা।

'কতটুকু ভালবাসি সে আপনাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না, সিনর রানা…'

'ঠিক আছে, মেয়েটা যদি তোমাকে ভালবাসে, তোমাদের বিয়ে হবে,' বলল রানা।

রানা এত সহজে, এমন স্বাভাবিক সুরে বলল কথাটা, যে বিশ্বাস করতে গিয়ে একরাশ সন্দেহে হাবুডুবু খেতে শুরু করল বনেটি। 'আপনি বলছেন আমাদের বিয়ে হবে?' বিমূঢ় দেখাল তাকে, গলার সুরে অবিশ্বাস।

'কেন হবে না! পাত্র হিসেবে তুমি তো আর ফেলনা নও!'

রানার কথায় ঠাট্টার সুর লক্ষ্য করে আরও ঘাবড়ে গেল বনেটি, বলল, 'আপনি আমাকে ব্যঙ্গ করছেন, সিনর রানা?' প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি! 'বিশ্বাস করুন, প্রতিজ্ঞা করেছি ওই মেয়েকে না পেলে ওর বাপ-চাচাকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করব আমি। আপনি যদি বিয়েতে ওদেরকে রাজি করাতে পারেন, চিরকাল আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব আমরা দু'জন।'

'উঁহুঁ,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'এর মধ্যে ঋণের কিছু নেই। তুমি আমাকে সাহায্য করছ, তার বদলে তোমাকে আমি সাহায্য করব, তার বেশি কিছু না। কেউ আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বা ঋণী থাকুক সেটা আমার কাম্য নয়। আর একটু আগে যা বললে, সেটা ঠিক নয়। কারও দুর্বলতা নিয়ে আমি কাউকে ঠাট্টা করি না।'

'ব্যাপারটা এখানেই মিটে গেল,' বলল সলোজা। রানার দিকে ফিরল সে। 'মেশিনগানে কে থাকবে, রানা? জানি, মনে মনে নিজের কথা ভেবে রেখেছ তুমি। তোমার মধ্যে গোলমালটা কোথায় বলো তো? আত্মহত্যা করতে চাইছ কেন?'

'আপনিই এখন আমার একমাত্র ইন্সুরেন্স,' বলল বনেটি। 'ঝুঁকি আছে এমন কোন কাজ আপনাকে আমি করতে দিতে পারি না। মেশিনগানে আমি থাকব।'

হেসে ফেলল রানা। 'তুমি মারা গেলে কার বিয়ের আয়োজন করব আমি?'

'ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টার নয়, রানা,' গম্ভীর সুরে বলল সলোজা। 'তুমি ঠিক কি ভাবছ সেটা আমাদের জানা দরকার।'

'কাজটা তেমন কঠিন বা গুরুতর কিছু নয়, তোমরা শুধু শুধু ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলছ,' বলল রানা। 'টানেলের পর আরও মাইল দুই পর্যন্ত ট্রেনে থাকব আমি। সম্ভবত রিভার ক্রসিং পর্যন্ত। তারপর ট্রেন থেকে নেমে পড়ব। নামার সময় ওদের চোখে ধরা না পড়লেই কাজ হবে, এরপরও ট্রেনটাকে অনুসরণ করবে ওরা। এক ঘণ্টার মধ্যে মুয়ালায় পৌঁছে যাব আমি।'

'কিন্তু যদি না পৌঁছুতে পারো?'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। বোট নিয়ে রওনা হয়ে যাবে তোমরা। ববিকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার সাথে কিটিকে বিনিময় করবে। এরপর ওকে নিরাপদে লন্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে তোমার। তোমার কাছে এটাই আমার ব্যক্তিগত অনুরোধ।'

'কিন্তু ওদেরকে ধোঁকা দেয়া তোমার একার পক্ষে সম্ভব নয়,' জেদের সুরে বলল সলোজা, 'তুমি থাকলে আমিও তোমার সাথে থাকব।'

'ছেলেমানুষি কোরো না, সলোজা,' বলল রানা, 'নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ ববির কি অবস্থা। নিজে থেকে পঞ্চাশ গজও যেতে পারবে না সে। সৈকত মাত্র আধ মাইল দূর হলে কি হবে, এলাকাটা দুর্গম, এইটুকু পথ পেরুতে হলে তোমাদের সবার সাহায্য দরকার হবে তার।'

'সিনর রানা ঠিক বলছেন, মামা,' বলল বনেটি। 'ববিকে সাহায্য করার জন্যে সিনর রানারও ট্রেন থেকে নেমে যাওয়া দরকার আর সবার সাথে। মেশিনগানে আমি থাকব।'

রেগেমেগে ঘুরে দাঁড়াল সলোজা। দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ট্রেনের

গায়ে।

বনেটির দিকে ফিরল রানা। 'এ-ব্যাপারে আর কোন কথা নয়। যাও, জালুচি আর লিলিকে গিয়ে বলো টানেলের ভেতর ট্রেন ঢুকলে তোমরা সবাই নেমে যাবে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়াবে ট্রেন, কাজেই নামতে দেরি করা চলবে না কারও।'

চেহারা দেখে মনে হলো আবার প্রতিবাদ করবে বনেটি, কিন্তু রানার দৃষ্টিতে কাঠিন্য ফুটে উঠতে দেখে নিজেকে সামলে নিল সে। অ্যাসল্ট রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে বার ধরে এগোল সে, একবারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে পৌঁছে গেল বক্সকারের দরজায়।

ঘুরে ইবানের দিকে একটা তর্জনী খাড়া করল সলোজা। 'ওর ব্যাপারে কি করবে?' তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চাইল সে, 'তুমি জানবে কিভাবে নজর রাখার জন্যে কেউ না থাকলেও ঠিকমত ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যাবে সে?'

মৃদু হাসল রানা। 'ট্রেনটাকে নিয়ে যাবে রেললাইন। ড্রাইভারের কাজ শুধু ইঞ্জিন চালু বা বন্ধ করা।'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল ইবানের চেহারা। ড্রাইভারের দরকার নেই, সে বোধহয় রানার এই কথার মানে করল, গুলি করে মেরে রেখে যাওয়া হবে তাকে। করুণ মিনতির সুরে প্রাণ ভিক্ষা চাইল সে। 'আপনার দুটো পায়ে পড়ি, হুজুর! আমাকে প্রাণে মারবেন না! যা বলবেন তাই করব,...'

'ওসবের কোন দরকার নেই,' বলল রানা। 'এসো, আমরা বরং একটা ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসি। আমরা নেমে যাবার পরও বাকি পথটা ট্রেন চালিয়ে নিয়ে যাবে তুমি,' পকেট থেকে একশো মার্কিন ডলারের দশটা নোট বের করল ও, 'বিনিময়ে এগুলো পাবে।'

'ডলার? মার্কিন ডলার?' লোভে চক চক করছে ইবানের চোখ দুটো। 'কিন্তু এসবের কি দরকার ছিল, হুজুর! টাকা না পেলেও আপনার হুকুম...'

হাসি চেপে ইবানের হাতে নোটগুলো গুঁজে দিল রানা। 'তবু রাখো। তুমি সাহায্য করছ, তার বদলে এটা একটা উপহার।'

তাড়াতাড়ি পকেটে গুঁজে রাখল ইবান টাকাগুলো। তারপর কি যেন চিন্তা করে বলল, 'কিন্তু আপনাকে আরেকটা কাজ করতে হবে, হুজুর।'

'কি?'

'জখম করুন আমাকে,' আবেদনের সুরে বলল ইবান। 'এমন মার মারুন, কর্নেল খানজুম যেন দেখে মনে করেন আমার কোন উপায় ছিল না।'

কর্কশ স্বরে হো হো করে হেসে উঠল সলোজা। 'ঠাট্টা নয়, ওর কথায় যুক্তি আছে।'

সলোজার দিকে ফিরল ইবান, আগ্রহের সাথে হাসল। তার দিকে পিছন ফিরল সলোজা, তারপর আচমকা ঘুরেই দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল তার মুখে। হাত বাড়িয়ে তার শার্টের কলার চেপে ধরল, আবার মারল ঘুসি। তৃতীয় ঘুসিটা খেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল ইবান। পিছিয়ে গেল সলোজা।

মুখ তুলে তাকাল ইবান। বিধ্বস্ত নাক আর ঠোঁট থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। আলতো ভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে ক্ষতগুলো স্পর্শ করল সে। তারপর উঠে দাঁড়াবার সময় সত্যি সত্যি হাসল।

'চমৎকার হয়েছে, হুজুর। ঠিক যা চেয়েছিলাম আমি।' পরমুহূর্তে চেহারাটা ম্লান হয়ে গেল তার। একটু পরই বোঝা গেল, সেটা ব্যথা অনুভবের ফলশ্রুতি নয়। বলল, 'কিন্তু, হুজুর, আমার মনে একটু খেদ থেকে গেল!'

'কি রকম?' ভুরু কুঁচকে উঠল রানার।

'বড় সাধ ছিল আপনার হাতে খাব মারটা···'

ইবানের বলার সুরে এবং ভঙ্গিতে এমন আন্তরিকতা ছিল যে স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। কিন্তু সলোজা আবার হেসে উঠল কর্কশ স্বরে। তার দিকে করুণ চোখে তাকাল ইবান।

'রানা তো আর তোমার গায়ে হাত তুলবে না, বলো তো ওর তরফ থেকে আরও দুটো ঘুসি মারতে পারি আমি—রাজি?'

দ্রুত এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ইবান। এই সময় তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল জালুচির। পরমুহূর্তে শোনা গেল এক ঝাঁক গুলির আওয়াজ।

টেন্ডারের ওপর দিয়ে বক্সকারের মাথায় চড়ল রানা। ডানদিকে পঞ্চাশ কি ষাট গজ দূরে রেললাইনের সাথে সমান্তরাল ভাবে আবার দেখা গেল রাস্তাটাকে। জলপাই গাছের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ট্রেনের সাথে ছুটতে শুরু করল দুটো ল্যান্ডরোভার। ওখানে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিল ওরা। অবিরাম এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করছে মেশিনগান দুটো।

প্রচুর বুলেট বক্সকারের গায়ে এসে লাগল, কিন্তু তেমন কোন ক্ষতি করতে পারল না। জালুচির মেশিনগানও চুপ করে নেই। অ্যামুনিশন শেষ করে আরেকটা হান্ড্রেড রাউন্ড ড্রাম ভরে নিল ও। কিন্তু ইতিমধ্যে মাটির উঁচু ভাঁজের আড়ালে হারিয়ে গেল গাড়ি দুটো।

'এই রয়েছে, এই নেই,' চেহারায় রাজ্যের উত্তেজনা নিয়ে বলল জালুচি। 'কি যে মজা লাগছে এই লুকোচুরি খেলা! বনেটি বলল তুমি নাকি আমাদেরকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়ে একা হিরো হবার চান্স নিতে চাইছ?'

হেসে ফেলল রানা।

খোলা রাস্তার ওপর আবার দেখা গেল জোড়া ল্যান্ডরোভার। ট্রেন দেখা মাত্র গুলি করতে শুরু করল ওরা। বক্সকারের গায়ে টং টং করে বিঁধতে লাগল বুলেট। পর পর দু'বার ব্রাশ করল জালুচি। চোখের পলকে রাস্তা থেকে ডান দিকে নেমে গেল পিছনের ল্যান্ডরোভার, জলপাই ঝোপের ভেতর দিয়ে উন্মত্ত গতিতে ছুটে গেল সেটা, তারপর একটা পাথরের মস্ত চাঁইয়ের সাথে ধাক্কা খেল। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল গাড়ি।

অপর গাড়িটা নিচু এক সার পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল। হো হো করে হেসে উঠে মেশিনগানের গা চাপড়ে দিল জালুচি। 'দুই থেকে এক গেলে এক থাকে!'

'দুই থাকে,' বলল রানা। 'সামনে কর্নেলের ল্যান্ডরোভার রয়েছে, সেটার কথা ভুলে গেছ তুমি।'

সত্যিই বুঝি ভুলে গিয়েছিল জালুচি, তার চেহারায় বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠতে দেখে রানার অন্তত তাই মনে হলো।

'তাই তো!' বলল সে। 'অনেকক্ষণ হলো দেখা নেই ওদের, ব্যাপারটা কি বলো তো, রানা? নিশ্চয়ই কোন ফন্দি এঁটেছে ব্যাটারা। কি হতে পারে সেটা!'

'জঘন্য একটা কিছু হবে, সন্দেহ নেই। সামনে কোথাও হয়তো রেললাইনের ওপর ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছে। তা যদি করে, মুয়ালা টানেলের ওপারেই কোথাও করবে বলে মনে হয়। খানজুম তো তার জানে না কোথায় নামব বলে প্ল্যান করেছি আমরা।'

চেহারাটা থমথমে হয়ে উঠল জালুচির। 'তার মানে শালার সাথে বোঝাপড়া করার সুযোগ পাব না আমি?'

'কি লাভ!' বলে বক্সকারের মাথা থেকে গা বেয়ে নিচে নেমে এল রানা।

লিলির কোলে মাথা রেখে এখনও চোখ বুজে শুয়ে আছে ববি। তার মাথার কাছে বসে আছে বনেটি।

'কেমন আছে ও?' জানতে চাইল রানা।

'সেই একই রকম,' উদ্বিগ্ন গলায় জবাব দিল বনেটি। 'সিনর রানা, একে সৈকত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন হবে।'

একটা হাঁটু গেড়ে লিলির পাশে নিচু হলো রানা। 'কাজটা যে সহজ হবে না সে তো আমি আগেই বলেছি।' লিলির দিকে তাকাল ও। 'টানেলে ট্রেনের স্পীড কমে এলে কি করতে হবে জানো তো?'

'হ্যাঁ, বনেটি বলেছে।' রানার কাঁধে একটা হাত রাখল লিলি। 'তুমি একা থেকে যাবে, আমার কিন্তু ভাল লাগছে না!'

'শুনে খুশি হলাম, কিন্তু এর চেয়ে ভাল কোন উপায় দেখাতে পারলে আরও খুশি হতাম।' চোখ নামিয়ে নিল লিলি, তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'আবার দেখা হবে। অন্তত একদিনের জন্যে হলেও তোমাকে নিয়ে কেপ ডি গাটায় ফিরে যাব আমি।'

চোখ তুলল লিলি। চোখ জোড়ায় আনন্দ চিক চিক করে উঠতে দেখল রানা।

নিচু গলায় বলল লিলি, 'সেটা আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন হবে। ধন্যবাদ, রানা।'

বার ধরে ফিরে এল রানা, ফুটপ্লেটে উঠে সলোজার পাশে দাঁড়াল। বক্সকারের মাথা থেকে ব্রাশ করল জালুচি। ঘাড় ফেরাতেই দুটো পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁকে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ল্যান্ডরোভারটাকে দেখতে পেল। পাল্টা গুলি না করে দ্রুত আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা। সামনের দু'মাইলের মধ্যে ঠিক এই একই ধরনের ঘটনা আরও বার কয়েক ঘটল। অস্বস্তিকর ব্যাপার। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দেখা দিয়ে আবার কোন আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা, কোন আওয়াজ নেই। যত বারই দেখা গেল সেটাকে, প্রতিবার ব্রাশ করল জালুচি। কিন্তু পাল্টা গুলি

একবারও হলো না।

'মতলবটা কি ওদের?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল সলোজা। 'গুলি করছে না কেন?'

'একটা উদ্দেশ্য পরিষ্কার, চোখে চোখে রাখছে আমাদের,' বলল রানা। 'গাড়িতে রেডিও এরিয়াল রয়েছে, দেখেছ? তার মানে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিচ্ছে ওরা কর্নেল খানজুমকে।'

'বুড়বাকটা তাহলে কোথায় এখন?'

'ঠিক কোথায় জানি না, তবে নিশ্চয়ই সামনে কোথাও।' ইবানের দিকে ফিরল রানা। 'তোমার অনুমানটা কি শুনতে চাই আমি।'

'মানে, আপনি জানতে চাইছেন রেললাইনের কোথায় ব্যারিকেড তৈরি করা সহজ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ব্যারিকেড তৈরির কোন দরকারই নেই,' বলল ইবান। 'নদীর ওপারে একটা জায়গা আছে, আল হালফাস। আল হালফাসে লাইনের সাথে একটা পয়েন্ট আর লূপ আছে, যাতে উল্টো দিক থেকে কোন ট্রেন এলে মেইন লাইন থেকে সরে যেতে পারি আমরা।'

'তার মানে পয়েন্ট নামিয়ে দিলেই আমরা মেইন লাইন থেকে সরে যাব, এবং তারপর আর করার কিছু থাকবে না!'

রানার পিঠে চাপড় বসাল সলোজা। 'মজার ব্যাপার হলো এই যে ট্রেন ওখানে পৌঁছুবার আগেই আমরা কেটে পড়ব, কিন্তু কথাটা বানচোত খানজুমের জানা নেই।'

'মুয়ালা টানেল আর বেশি দূরে নয়,' বলল ইবান। 'ঢালের ওপারেই।'

ট্রেন ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। দু'পাশে উঁচু পাড় মাঝখানে রেললাইন। খানিক পর আবার উঠতে শুরু করল লাইন। ঢালের একেবারে মাথায় উঠে এল, এখান থেকে সিকি মাইলটাক দূরে দেখা গেল মুয়ালা টানেলের প্রবেশ মুখ। বাঁ দিকে ঢালটা সোজা নেমে গেছে জলপাই ঝোপের মধ্যে, ঝোপের ওদিকে চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল সাগর। জালুচির মেশিনগান আবার গর্জে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। ফাঁকা রাস্তায় দেখা গেল ল্যান্ডরোভারটাকে।

কয়েক মুহূর্ত পরই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। ট্রেনের সামনে টানেলের কালো মুখ। এরই মধ্যে ব্রেক কষতে শুরু করেছে ইবান। টানেলের ভেতর ঢুকে পড়ল ট্রেন। প্রাণপণে ব্রেক কষল ইবান। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাষ্পে ঢাকা পড়ে গেল সব। ফুটপ্লেট থেকে লাফ দিল সলোজা, বনেটি আর লিলিকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে চলে গেল বক্সকারের দরজার সামনে। ওদের সাথে যোগ দিল জালুচি। জোর গলায় কি যেন বলল সে। কিন্তু বাষ্পের হিস হিস আওয়াজে তার কথা পরিষ্কার শুনতে পেল না রানা।

চিৎকার করে জানাল সলোজা, 'ঠিক আছে, রানা! আমরা নেমে পড়েছি!'

ইবানের কাঁধে টোকা দিল রানা। ট্রেন আবার চলতে শুরু করল।

ফায়ার বক্সের দরজা খুলে ভেতরে কয়লা ঢোকাতে শুরু করল রানা। মাথার ওপরের কর্ড ধরে টান দিল ইবান, হুইসেল বেজে উঠল। চারদিক থেকে ভেসে এল প্রতিধ্বনি।

'খুশি, হুজুর? ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ইবানের গলা।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

টানেলের সামনের মুখটা এখন দেখতে পেল রানা। আরও কিছু কয়লা ঢেলে ফায়ার বক্সের দরজা বন্ধ করে দিল ও। রাতের তাজা বাতাসে বেরিয়ে এল ট্রেন। আবার হুইসেল বাজাল ইবান। এবার অনেক দূর, সেই উপত্যকা থেকে ভেসে এল প্রতিধ্বনি।

ঠিক এই সময় ওদের ডান দিকের ফাঁকা রাস্তায় দেখা গেল ল্যান্ডরোভারটাকে। টেন্ডারের ওপর দিয়ে মেশিনগানে পৌঁছুবার জন্যে ঘুরল রানা। কিন্তু তার আর দরকার হলো না, ইতিমধ্যেই সেটা চালু হয়ে গেছে।

আট

বক্সকারের মাথায় চড়ে রানা দেখল, তার সেই আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে জালুচি। রাস্তা থেকে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে ল্যান্ডরোভার। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল জালুচি।

'এখানে কি করছ তুমি?' জানতে চাইল রানা।

একগাল হাসল জালুচি। 'হিরো হবার সবটুকু কৃতিত্ব তুমি নেবে, সেটা আমার ঠিক পছন্দ হলো না,' বলল সে। 'তাছাড়া, একের চেয়ে দু'জোড়া হাত অনেক বেশি দিক সামলাতে পারে। কিংবা মনে করো, শত্রু হলেও, তোমার যাতে ভাল হয় সেদিকে আমি নজর রাখতে শুরু করেছি।'

'ববির কি হবে?'

'তাকে সৈকতে নিয়ে যেতে সলোজা আর বনেটিই যথেষ্ট।' ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট গুঁজল সে। হাসল, চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল সামনের ক'টা দাঁত। 'আমি তোমার দলে, সেজন্যে তুমি খুশি নও?'

যে-কারণেই থেকে যাক জালুচি, রানা জানে, সেটা অবশ্যই ওর মঙ্গলের জন্যে নয়। মনের কোণে একটা ইচ্ছে উঁকি দিল, এখুনি গুলি করে সমস্যাটাকে মিটিয়ে ফেললে কেমন হয়? কিন্তু পরমুহূর্তে ভাবল, সামনে ইসরায়েলিদের তরফ থেকে কি ধরনের বিপদ আসবে বলা কঠিন, তখন হয়তো ওর সাহায্য দরকার হবে। মনে মনে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা, জালুচির দিকে ভুলেও পিছন ফেরা চলবে না। আপাতত থাকুক ও একসাথে।

ঢাল বেয়ে আবার উঠতে শুরু করল ট্রেন। লাইনের দু'পাশে দেখা গেল উঁচু পাড়। ক্রমশ আরও উঁচু হচ্ছে।

'পাহাড়ের মাথা থেকে রিভার ক্রসিং আর মাত্র দু'মাইল,' চিৎকার করে জানাল ইবান।

নিচে নেমে এল রানা। একটু পরই ধপাস করে কি যেন পড়ল ক্যাবের মাথায়। ফুটপ্লেটে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। দেখল, ঢালের উঁচু কিনারা থেকে লাফ দিয়ে বক্সকারের মাথায়, জালুচির ওপর নামছে কর্নেল খানজুম। টেন্ডারের ওপর দিয়ে জালুচিকে সাহায্য করতে যাবার জন্যে ঘুরতে যাবে রানা, এই সময় ক্যাবের ছাদ থেকে ঝুলে পড়ল সার্জেন্ট ওয়াকেম, একটা দোল খেয়ে খোলা অপর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ক্যাবের ভেতর, রানার বুকে পা দিয়ে পড়ল সে।

সোজা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে চাকার তলায় পড়তে পারত রানা, কিন্তু ওয়াকেমকে দেখামাত্র ঘুরতে শুরু করেছিল ও, ফলে ওয়াকেমের লাথিটা ওর বুকের পাশে ঘষা খেল মাত্র, ধাক্কাটা তেমন জোরাল হয়নি বলে ছিটকে পড়ল না।

কিন্তু ছিটকে না পড়লেও তাল সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। অসহায় ভাবে পিছু হটল ও। শরীরের ওপরের অংশটা বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে। কবাটের গায়ে কব্জা ধরে বাইরের দিকে ঝুলে পড়ল ও। ঠিক এই সময় ওয়াকেম যদি আরেকটা লাথি চালাত, হাত দুটো চৌকাঠ থেকে নির্ঘাত ছুটে যেত ওর।

ওয়াকেমের আলিঙ্গনের ভেতর মোচড় খাচ্ছে ইবানের শরীর। চাপ দিয়ে ইবানের বুকের পাঁজর ক'টা ভেঙে ফেলল ওয়াকেম। তারপর তাকে ছুঁড়ে দিল অপর দরজার দিকে। ছিটকে পড়ল ইবান। দরজার হ্যান্ডরেল ধরল, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না। তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। চৌকাঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেল আর্তনাদটা।

কন্ট্রোল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওয়াকেম। ব্রেক লিভার ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছে। ব্যস্ততার সাথে স্টেচকিন মেশিন-পিস্তলটা বের করে আনল রানা, ডান হাত দিয়ে দরজার হ্যান্ডরেল ধরে ফেলে এখনও বাইরের দিকে ঝুলছে ও। নিশ্চয়ই কোন ইন্দ্রিয়ের নির্দেশে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওয়াকেম, প্রকাণ্ড মুখের ওপর চোখ জোড়া জ্বলছে। গুলি করল রানা। ডান কাঁধে লাগল। হাই ভেলোসিটি বুলেটের ধাক্কা পুরো একপাক ঘুরিয়ে দিল শরীরটাকে। দ্বিতীয় বুলেটটা বুকে নিয়ে দরজা দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল সে।

লোকোমোটিভ থেকে টেন্ডারে বেরিয়ে এল রানা। বার ধরে ওপরে উঠছে, এই সময় ছাদের কিনারা থেকে দড়াম করে উল্টে পড়ল মেশিনগানটা। ছাদের এক দিক থেকে আরেক দিকে গড়াগড়ি খাচ্ছে খানজুম আর জালুচি। পাগলা কুকুরের মত পরস্পরের গলা খামচে ধরার চেষ্টা করছে ওরা, যে কোন মুহূর্তে কিনারা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে যেতে পারে।

হাতে স্টেচকিন মেশিন-পিস্তল রয়েছে, তবু গুলি করতে পারল না রানা। কখনও জালুচির বুকে চড়ে রয়েছে খানজুম, পরমুহূর্তে জালুচিকে দেখা যাচ্ছে খানজুমের ওপর। জালুচির গায়ে গুলি লাগলেও কিছু এসে যায় না রানার, বরং একটা সমস্যার সমধান হয়ে যায়, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে জালুচিকে গুলি করাটা

কাপুরুষোচিত একটা কাজ হবে বলে গুলি করতে উৎসাহ বোধ করল না রানা। তাছাড়া, ঠিক এই মুহূর্তে আরেকদিকে রয়েছে ওর মনোযোগ। ঢালের নিচে থেকে উঠে এসেছে ট্রেন, পাহাড়কে আলিঙ্গন করে এগোচ্ছে। সামনে, অনেক নিচে, প্রায় মাইল দুই দূরে নদীর ওপর ব্রিজটা দেখা গেল।

সেই সাথে আরও একটা বিপদ চাক্ষুষ করল রানা। ট্রেনের লেজের দিক থেকে, একের পর এক বক্সকার টপকে ছুটে আসছে ক্যামোফ্লেজড ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন সৈনিক।

ওরা যাতে মাথা নিচু করে রাখতে বাধ্য হয় তার জন্যে কয়েকটা গুলি করল রানা। কিন্তু তেমন কাজ হলো না। কারণ, পাহাড় থেকে নামার সময় বেড়ে গেছে স্পীড, সেই সাথে ঘন ঘন এদিক ওদিক দুলছে ট্রেন।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। বক্সকার আর টেন্ডারের মাঝখানে নেমে এল ও। হুক আর চেনের ওপর কাজ শুরু করল ও, যেগুলো টেন্ডারের সাথে প্রথম বক্সকারটাকে জোড়া দিয়ে রেখেছে। রিটেইনিং পিনটা সহজেই বেরিয়ে এল। তবু, আপাতত বক্সকারগুলোর সাথে টেন্ডার আর লোকোমোটিভ বিচ্ছিন্ন হলো না। এটাই আশা করেছিল রানা, কারণ ট্রেন তীরবেগে নিচের দিকে নামছে।

টেন্ডার থেকে ক্যাবে ফিরে এল রানা। ব্রেক লিভারে হাত রেখে ঘাড় ফেরাল। জালুচি আর খানজুম দু'জনেই ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। ছুটন্ত ট্রেনের ছাদে দাঁড়িয়ে খালি হাতে লড়ার জন্যে কারাতে অত্যন্ত উপযোগী কৌশল, কিন্তু দু'জনের কেউই তার ধারে কাছে ঘেঁষল না। ভদ্রলোকের মত পরস্পরকে লক্ষ্য করে ঘুসির পর ঘুসি চালাচ্ছে তারা।

ফাঁকা একটা আওয়াজ করল রানা। জালুচি ঘাড় ফেরাতেই চিৎকার করে বলল ও, 'বাঁচতে চাইলে লাফ দাও।' বলেই নিচের দিকে ঠেলে দিল ব্রেক লিভারটা।

বিনা দ্বিধায় রানার নির্দেশ মেনে নিল জালুচি। শূন্যে লাফ দিল সে, টেন্ডারের ওপর কয়লার স্তূপে পড়ল, এরই মধ্যে টেন্ডার আর বক্সকারের মাঝখানে একটা ফাঁক দেখা দিয়েছে, ক্রমশ বাড়ছে সেটা। লোকোমোটিভ আর টেন্ডারকে বাদ দিয়ে ট্রেনের বাকি অংশ দ্রুত গতিতে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ের নিচের দিকে। প্রথম বক্সকারের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে খানজুম, পেছন থেকে তিনজন সৈনিক এগিয়ে আসছে তার দিকে। পরমুহূর্তে আশ্চর্য একটা কাণ্ড করল সে। দু'পা ঠুকে একটা স্যালুট করল। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে সে।

'মাই গড!' বলল রানা। 'ব্যাপারটা দেখে এমন কি সলোজাও গালিগালাচ করতে ভুলে যেত!'

ক্যাবের মেঝে থেকে একটা অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে নিয়ে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করল জালুচি। গুলি করার ঠিক আগের মুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে ব্যারেলটা সরিয়ে দিল রানা। আকাশের দিকে ছুটে গেল বুলেট।

'স্যালুটের মর্যাদাটুকু অন্তত দাও!'

'ইউনিভার্সিটিতে পড়লেও, ভদ্রতা নামের দুর্বলতা আমাকে পায়নি,' গম্ভীর সুরে

বলল জালুচি। 'সেজন্যেই বেঁচে আছি আজও।'

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। ইতিমধ্যে সিকি মাইল দূরে চলে গেছে বক্সকারগুলো, আরেকটা ঢাল থেকে দ্রুত নেমে যাচ্ছে এখনও। কন্ট্রোলের সামনে দাঁড়িয়ে এটা-সেটা নেড়ে চাকা ঘোরাবার চেষ্টা চালিয়ে গেল রানা। খুব বেশি সময় লাগল না, উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করল সেগুলো। ফিরে চলল লোকোমোটিভ।

ফেরার সময় জালুচিকে সাবধান করে দিল রানা। অপর ল্যান্ডরোভারটা দর্শন দিতে পারে আবার। টেন্ডারের ওপর পাহারায় থাকল জালুচি।

পাহাড় পেরিয়ে এল ওরা। ঢাল বেয়ে টানেলের দিকে এগোচ্ছে। স্টেচকিনটা হোলস্টারে নয়, হাতে রেখেছে রানা। মুহূর্তের জন্যেও জালুচিকে বিশ্বাস করে না। জানে, জালুচির কাছে সে-ও একটা সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান যদি করতে চায়, এর চেয়ে ভাল সময় আর সুযোগ পাবে না আর।

সতর্কতার সাথে দাঁড়াবার জায়গাটা বেছে নিয়েছে রানা। একটা চোখ রেখেছে কন্ট্রোলের ওপর, আরেকটা জালুচির ওপর। ক্রমশ এগিয়ে আসছে টানেলের কালো মুখ। একটা পা দিয়ে ফায়ার বক্সের দরজাটা খুলে দিল রানা, আগুনের আভায় যাতে ক্যাবের ভেতর আর টেন্ডারের কিছুটা অংশ আলোকিত হয়ে ওঠে। জালুচির মুখে ক্ষীণ কৌতুকের ভাব লক্ষ্য করল ও, বুঝল ওর মনের কথা পড়তে পারছে সে।

টানেলের অপর দিক থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ব্রেক টেনে স্পীড কমাল রানা।

বলল, 'লাফ দেবার জন্যে তৈরি হও।'

'চালু অবস্থায় ছেড়ে যাবে এটাকে, রানা?' জানতে চাইল জালুচি।

'ট্রেন চালু থাকলে ওরা জানতে পারবে না ঠিক কোন্ জায়গায় নেমেছি আমরা। ভাগ্য ভাল হলে একেবারে সোজা কারাগারের উঠানে গিয়ে থামবে এটা।'

জালুচিকে আগেভাগে টের পেতে না দিয়ে আচমকা লাফ দিল রানা। ঘণ্টায় বড়জোর দশ মাইল স্পীডে ছুটছে ট্রেন, নিচে পড়ে তাল সামলে নিতে কোন অসুবিধেই হলো না। পিছনে দ্রুত পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝল, জালুচিও তার পিছু পিছু ছুটছে।

উঁচু পাড় বেয়ে মাথায় উঠে এল রানা। জালুচির জন্যে অপেক্ষা করছে।

একটা বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল ট্রেন। রানার সামনে এসে হাঁপাতে লাগল জালুচি।

'চলে গেল! আর কখনও দেখব না ওটাকে।' সকৌতুকে হাসল সে। 'মনটা কেমন যেন বিষণ্ন লাগছে। এবার, রানা?'

হাতে এখনও স্টেচকিন রয়েছে সেটা আড়াল করার চেষ্টা না করে জালুচিকে দেখতে দিল রানা। এবং অপেক্ষা করতে থাকল। মুখে কিছু বলল না রানা, কিন্তু মেসেজটা পেয়ে গেল জালুচি। তাকেই প্রথম পা বাড়াতে হলো। খুব যেন মজা লাগছে এই রকম একটা হাসি লেগে রয়েছে তার মুখে। কিন্তু তাতে কিছু আসে

যায় না। পাহাড় ঘেঁষে নামার সময় সারাটা পথ রানার দিকে পিঠ দিয়ে সামনে থাকল সে। ঠিক যা চেয়েছিল রানা।

জলপাই ঝোপ পেরিয়ে এল ওরা। মুয়ালা আর খুব বেশি দূরে নয়। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। সামনে বেদুইন ক্যাম্প। তাঁবু থেকে কোন সাড়া শব্দ আসছে না। পাশ ঘেঁষে যাবার সময় শুধু একবার ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম।

দোকানের ভেতর কোন আলো নেই, কিন্তু বারান্দায় খুদে একটা ল্যাম্প রয়েছে। ছায়া থেকে ফিসফিস করে উঠল একটা কণ্ঠস্বর, 'সিনর রানা! এদিকে!'

দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সায়েফ, গুটানো এবং খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখা একটা মাদুরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে।

'কি ব্যাপার?' চাপা গলায় জানতে চাইল রানা।

'আপনার বন্ধুরা সাংঘাতিক বিপদে পড়েছেন, সিনর রানা। আপনারা চলে যাবার পর আজ সন্ধ্যায় কাস্টমসের পেট্রল বোট লেফটেন্যান্টকে নিয়ে ফিরে এসেছে আবার। জেটিতে নোঙর ফেলেছে লঞ্চ।'

'ভিরোমায় উঠেছিল লেফটেন্যান্ট?'

'উঠেছিল; সিনর।'

খারাপ খবর। কে জানে ওটেলিয়ো তাকে কি বলেছে।

'তিনজন নাবিক অনেক-রাত পর্যন্ত ছিল এখানে,' বলল সায়েফ। 'তাস খেলে সময়টা কাটিয়েছে। লঞ্চ থেকে ওদেরকে ডাকতে এসেছিল একজন লোক। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো, একটা রেডিও মেসেজ পেয়েছে ওরা, নির্দেশ দেয়া হয়েছে উপকূলের প্রতিটি বোট চেক করতে হবে। তাদমোর থেকে কে বা কারা যেন পালিয়েছে, তাদের খোঁজ চাওয়া হয়েছে।'

'আধ ঘণ্টার মধ্যে আর কেউ গেছে এদিক দিয়ে?'

'আপনার বন্ধুরা, সিনর। লেফটেন্যান্ট উবে ওদেরকে সাথে সাথে গ্রেফতার করেছেন। আপনার বোট জেটিতে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'সারাটা পথ বিজয় নিশান উড়িয়ে এসে শেষে কিনা শুনি আমাদের হার হয়েছে!' বলল জালুচি। 'এখন উপায়, রানা?'

'ধন্যবাদ,' সায়েফকে বলল রানা। অন্ধকারে পা বাড়াল ও। জেটির দিকে এগোল। এবার পিছন থেকে ওকে অনুসরণ করল জালুচি, কিন্তু সেজন্যে উদ্বিগ্ন হলো না রানা। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে পরস্পরের সাহায্য দরকার ওদের।

কাস্টমস লঞ্চটা জেটির শেষ মাথার কাছে নোঙর ফেলেছে, তার সাথে বাঁধা রয়েছে ভিরোমা। ডেক লাইট অন করা, প্রচুর আলো দেখা গেল। হুইলহাউসের পাশে সলোজা, বনেটি, লিলি আর ওটেলিয়োকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। সবার হাত পিছনে। রেইলের দিকে পিছন ফিরে ডেকের ওপর বসে আছে ববি।

দু'পা ফাঁক করে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লেফটেন্যান্ট উবে। একটা অর্ধ বৃত্ত রচনা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছয়-সাত জন নাবিক, প্রত্যেকের হাতে রাইফেল,

বন্দীদের দিকে তাক করে ধরা।

সৈকতে টেনে তোলা একটা ফিশিং বোটের আড়ালে থামল ওরা।

'সন্দেহ নেই, এই কৃতিত্বের জন্যে পদক দেয়া হবে লেফটেন্যান্টকে,' বলল জালুচি। 'কি করব আমরা এখন, রানা?'

'যাই করি, তাড়াতাড়ি করতে হবে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তেল আবিবের সাথে রেডিও যোগাযোগ করেছে ওরা।'

স্টার্নে একটা মঞ্চের ওপর রয়েছে মার্কিন মেশিনগানটা, কিন্তু সেটার ধারে কাছে কেউ নেই। সেদিকে জালুচির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল রানা, 'বুঝেশুনে উত্তর দাও। আমি যদি একটা ডাইভারশন তৈরি করি, সাঁতরে জেটি ঘুরে ওটার কাছে পৌঁছুতে পারবে?'

কয়েক সেকেন্ড পর বলল জালুচি, 'মনে হয় পারব।'

'তাহলে আর দেরি নয়। পাঁচ মিনিট সময় দেব তোমাকে।'

ছায়ার মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে পানিতে নেমে গেল জালুচি। তীক্ষ্ণ নজর রাখল রানা তার ওপর। জেটির শেষ প্রান্তের কাছে পানির ওপর জালুচির মাথাটা দেখা গেল শুধু। বেল্ট থেকে স্টেচকিন মেশিন-পিস্তলের কাঠের হোলস্টার খুলে জায়গামত ক্লিপ দিয়ে আটকে সেটাকে শোল্ডার স্টকে পরিণত করল রানা। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল লঞ্চের মাস্টহেড লাইটের ওপর। তারপর গুলি করল।

চোখের পলকে একজন ছাড়া বাকি সবাই লঞ্চের ডেকে শুয়ে পড়ল। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে এক পা নড়ল না লেফটেন্যান্ট, ঝট্ করে হোলস্টার থেকে একটা পিস্তল বের করল সে। আবার গুলি করল রানা। চুরমার হয়ে গেল হুইলহাউসের একটা জানালা, ডেকের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ভাঙা কাঁচ। জবাবে গুলি করল তিনজন নাবিক, কিন্তু সরাসরি রানাকে লক্ষ্য করে নয়—আন্দাজে; মাথা তুলে ওদের কারও দেখার সাহসও হলো না ঠিক কোন্ দিক থেকে গুলি আসছে। বোটের আড়াল থেকে আবার যখন মুখ বের করল রানা তখন নাবিকদের পেছনে লঞ্চের রেইল টপকে ডেকে ওঠার সময় হয়ে গেছে জালুচির। এক সেকেন্ড পরই তাকে দেখতে পেল রানা। মেশিনগানের চার্জে রয়েছে সে মঞ্চের ওপর ঘুরতে শুরু করল মেশিনগানটা। খোলা সাগরের দিকে ছোট্ট একটা ব্রাশ করল জালুচি।

লেফটেন্যান্ট উবে সহ সব ক'জন লোক ঘাড় ফেরাল। স্থির পাথর হয়ে গেল সবাই। এই ফাঁদের কথা দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবেনি তারা। ইতিমধ্যে জেটি ধরে ছুটতে শুরু করছে রানা। লক্ষ্য করল, হিব্রু ভাষায় ওদেরকে কি যেন বলছে জালুচি। নাবিকরা অনিশ্চিত ভঙ্গিতে লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল। ছোট্ট আরেকটা ব্রাশ করল জালুচি, হুইলহাউসের বাকি জানালাগুলোর সমস্ত কাঁচ ভেঙে গেল। এবার আর নাবিকদের মধ্যে কোনরকম দ্বিধা বা অনিশ্চিত ভাব লক্ষ্য করা গেল না। যে যার হাতের অস্ত্র রেইলের ওপর দিয়ে সাগরে ফেলে দিল সবাই। পানিতে সবচেয়ে দূরে পড়ল লেফটেন্যান্টের পিস্তলটা।

'সবাইকে জেটিতে নামাও।' রেইল টপকে লঞ্চের ডেকে পা দিল রানা।

নাবিকদের অর্ডার করল জালুচি। বিনা দ্বিধায় সবাই তার অর্ডার পালন করতে শুরু করল। শুধু নিজের জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লেফটেন্যান্ট উবে। তার পেছনে এসে দাঁড়াল সলোজা। বলল, 'তোমার আবার কি হলো? পা উঠছে না? প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়েছ?'

সলোজাকে গ্রাহ্যই করল না উবে। চোখ গরম করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে কয়েক সেকেন্ড, তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ভেবেছ পালাতে পারবে? এতই সহজ? ইসরায়েলি নেভী...'

'কিসের নেভী!' পেছন থেকে জোর গলায় বলল সলোজা। 'বলো, সলোজার লাথি!' বলেই উবের কোমরের ওপর ঝেড়ে একটা লাথি চালাল সে। রেইলের ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল লেফটেন্যান্ট।

'ঝামেলা গন,' বলল রানা। 'চলো, এবার কেটে পড়া যাক।'

রেইলের ওপর দিয়ে ধরাধরি করে ববিকে ভিরোমার ডেকে নামাল সলোজা আর বেনেটি। ভিরোমার ডেকে ওদের সাথে যোগ দিল লিলি, সবাই ববিকে নিয়ে নেমে গেল নিচে। ওটেলিয়োকে দড়িদড়া খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে হুইলহাউসে চলে এল রানা। স্টার্ট দিল ইঞ্জিনে। অ্যাসল্ট রাইফেল হাতে ডেকে উঠে এল সলোজা আর বনেটি। রেইলের সামনে দাঁড়িয়ে নাবিকদের ওপর নজর রাখল ওরা।

'সব ঠিক আছে,' জালুচিকে বলল রানা। 'লেট'স গো।'

মার্কিন মেশিনগানটা তেপায়া থেকে তুলে সাগরে ফেলে দিল জালুচি। মুখভর্তি হাসি নিয়ে ভিরোমায় চড়ল সে। 'আর কোন সাহায্যে লাগতে পারি আমি, রানা?'

'তুমি বললে বলে মনে পড়ে গেল—হ্যাঁ, তোমার জন্যে আর একটা কাজ আছে বটে!' বেল্ট থেকে একটা স্টিক গ্রেনেড বের করে জানালা দিয়ে জালুচির হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'জেলখানার ট্রাকগুলোকে এই গ্রেনেড দিয়ে নিখুঁত ভাবে জখম করেছিলে। এখানে কি করো দেখা যাক।'

'দেখো!'

বোট ছেড়ে দিল রানা। স্পীড বাড়াল। বাঁক নিতে শুরু করল বোট। গ্রেনেডের পিন খুলে রেইলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল জালুচি। মনে হলো, অস্বাভাবিক বেশি সময় নিচ্ছে সে। তারপর, সম্ভাব্য শেষ সময়ে ছুঁড়ে দিল সেটা।

ভাঙা একটা জানালা দিয়ে হুইলহাউসের ভেতর ঢুকে গেল গ্রেনেড। লঞ্চের রেইল টপকে ডেকে নামছিল লেফটেন্যান্ট উবে আর তার একজন নাবিক। সাংঘাতিক জোরাল হলো বিস্ফোরণের আওয়াজটা। সাথে সাথে গোটা লঞ্চে আগুন ধরে গেল। একটু পর শোনা গেল আরেকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ। পেট্রল ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভিরোমাকে নিয়ে দুই বোনের মাঝখান দিয়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে রানা।

নয়

বোটের সব আলো জেলে দিল রানা। মাস্তুল থেকে স্টার্ন পর্যন্ত আবার ফিশিং নেট টাঙাতে বলল সলোজা আর বনেটিকে।

'মাও সে-তুঙের গেরিলা ওয়রফেয়ার পড়েছ?' হুইলহাউসে সলোজাকে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন করল রানা। 'তিরাশি পৃষ্ঠায় কোথাও আছে কথাটা। একটা মাছ যদি গা ঢাকা দিতে চায়, এক ঝাঁক মাছ খুঁজে নেয় সে।'

'আমরাও কি ঠিক তাই করতে যাচ্ছি?'

'অবশ্যই। এখান থেকে পনেরো বিশ মাইলের মধ্যে হাজার হাজার মাছ ধরার বোট আর নৌকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তাদের দলে ভিড়ে গেলে আমাদের আর বেছে বের করে কে!'

কেন যে এত আনন্দ লাগছে তা নিজেও ভাল বুঝতে পারল না রানা। মিনিট কয়েক পরই মাছ ধরার ফ্লিটের মধ্যে পড়ে গেল ওরা। কিন্তু এক ঘণ্টা পেরোবার আগেই ফ্লিটের আলোগুলোকে পিছনে রেখে এল ওরা। ফুল স্পীডে বোট ছুটিয়ে নিয়ে চলল রানা। অন্ধকারের ভেতর শুধু শোনা যায় ইঞ্জিন আর সাগরের অবিরাম গর্জন।

বেশির ভাগ সময় হুইলহাউসে একাই রইল রানা। তবে এক সময় স্যান্ডউইচ আর কফি নিয়ে ভেতরে ঢুকল লিলি। চার্ট টেবিলের ওপর ট্রেটা নামিয়ে রাখল সে, হুইলটা অটোমেটিক স্টিয়ারিঙে লক করল রানা।

'ট্রেন থেকে আমরা নেমে আসার পর কি ঘটল ওখানে?' জানতে চাইল লিলি।

বলল রানা। সব শুনে বিষণ্ন সুরে বলল লিলি, 'কর্নেল খানজুমকে তুমি গুলি করোনি বা জালুচিকে করতে দাওনি সেজন্যে আমার ভাল লাগছে। জজবা যে রকম বর্ণনা দিয়েছিল লোকটা আসলে ঠিক তার উল্টো। অন্তত আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করেনি।'

'আই সি!' দু'হাত দিয়ে লিলিকে আলিঙ্গন করল রানা। 'ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলে তুমি? মানে, যাকে বলে ভালবাসা?'

'জানি না, যাও!' কৃত্রিম রাগে মুখ ঝামটা দিল লিলি। 'হোক শত্রু, ভাল হলে তাকে ভাল লাগতে নেই বুঝি?'

'ববিকে নিয়ে বিপদে পড়তে হয়নি তোমাদের?'

'হয়নি মানে! রেললাইন থেকে সৈকত পর্যন্ত প্রায় বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে ওকে। সলোজা আর বনেটির মত শক্ত লোক, দু'জনেই হাঁপিয়ে উঠেছিল। ওকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠানো উচিত, রানা।'

'এখন কি করছে সে?' জানতে চাইল রানা।

'ঘুমাচ্ছে। এমন ক্লান্ত যে জেগে থাকার মত শক্তি নেই।'

'কাউকে কিছু বলেছে ও?'

'না। আমরা আসার পর যতক্ষণ জেগে ছিল, দেখে মনে হয়েছে, গোটা ব্যাপারটা কোত্থেকে কোথায় গড়াচ্ছে সে-ব্যাপারে ওর যেন কোন ধারণাই নেই।' একটু থেমে আবার বলল লিলি, 'আফটার কেবিনে আছে ও।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তোমাকে একটা কাজ দিচ্ছি আমি। এখুনি ফিরে যাও আফটার কেবিনে, ওর পাশে থাকো। দ্বিতীয় বাঙ্কটা তোমার। জালুচি যেন ওর কাছে মুহূর্তের জন্যেও একা থাকতে না পারে।'

'কিন্তু কেন, রানা?' অবাক হয়ে তাকাল লিলি। 'সব ভালয় ভালয় মিটে যাবার পর জালুচি আবার বিপদ ঘটাতে পারে বলে মনে করছ কেন?'

'বিপদ ঘটাতে পারে নয়, বিপদ ঘটাবেই,' বলল রানা। 'কাজেই ওর ওপর চোখ রাখো।'

চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে গেল লিলি। অটোমেটিক পাইলটের লক খুলে আবার হুইল ধরল রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেল ও। কিছু একটা মতলব আছে জালুচির। কি সেটা? এমন কোন সূত্র এখনও চোখে পড়েনি যা থেকে কিছু আন্দাজ করা যায়। হয়তো ববি ইউজিন কোন সূত্র দিতে পারে।

দরজা খোলার শব্দে সংবিৎ ফিরল রানার। ভেতরে ঢুকল সলোজা। 'হুইল আমাকে দিয়ে যাও একটু ঘুম দাও।'

'ববির কাছে লিলিকে পাঠিয়েছি,' বলল রানা। 'ওর বাঙ্কেই থাকব আমি।'

কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সলোজা। তারপর বলল, 'বিপদের গন্ধ পেয়েছ তুমি।'

'জালুচিকে আমি বিশ্বাস করি না। কিছু একটা ঘটে যাবার আগে সাবধান হওয়া ভাল। তোমাকেও চোখ কান খোলা রাখতে বলছি।'

পকেট থেকে একটা পয়েন্ট থ্রী এইট স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন বের করে হাতের কাছে চার্ট টেবিলের ওপর রাখল সলোজা। 'আমি একা নই, সাথে বন্ধু আছে। কাজেই আমার ব্যাপারে তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

হুইলহাউস থেকে নিচের সেলুনে নেমে এল রানা। একটা বেঞ্চ সীটে পা লম্বা করে দিয়ে বসে সিগারেট ফুঁকছে জালুচি। মুখ তুলে রানাকে দেখে হাসল সে। 'আমাকে খুঁজছ বুঝি, রানা?' বিদ্রূপের সুরে বলল সে।

মুহূর্তের জন্যে একটা ঝোঁক চাপল রানার মনে, শালার সাথে দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলা যাক। ওকে কায়দা মত পাওয়া কোন সমস্যাই নয়। পেটে গুঁতো দিয়ে কথা আদায় করাও সহজ। কিন্তু কি কথা আদায় করবে সেটাই জানা নেই ওর।

'না,' বলে আফটার কেবিনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা।

ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। লিলি একটা বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে, অপর বাঙ্কে ববি। লিলির গায়ের ওপর একটা কম্বল। জেগেই আছে সে। কিন্তু অঘোরে ঘুমাচ্ছে ববি। ক্ষত বিক্ষত মুখে রাজ্যের ক্লান্তি।

অ্যামুনিশন বেল্টটা খুলে ফেলল রানা। দুটো গ্রেনেডের সাথে সেটা লকারের

মাথায় রাখল। তারপর বুট খুলে উঠে পড়ল লিলির পাশের বাঙ্কের ওপর। কম্বলটা টেনে গলা পর্যন্ত নিজেকে ঢেকে নিল ও। লিলির অবশ্য তাতে কিছু এসে গেল না। কারণ একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

এই ঘুম, পরমুহূর্তে জাগরণ—সমস্ত স্মৃতি কাঁচের মত স্বচ্ছ আর ক্ষুরের মত ধারাল মনে হলো রানার। ওর দিকে পেছন ফিরে এখনও শুয়ে আছে লিলি, দুনিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন। পাশ ফিরতেই অপর বাঙ্কে ববিকে দেখতে পেল রানা, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তার বাঁ হাত ঝুলে আছে নিচের দিকে, আঙুলগুলো পেঁচিয়ে রেখেছে একটা গ্রেনেড। চেহারাটা এখনও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, ক্ষতগুলো আগের চেয়ে যেন কদাকার হয়ে উঠেছে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে সেই ঘোরের ভাব নেই বললেই চলে। বুদ্ধি এবং সচেতনতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

'ব্যবহার করতে না জানলে ওটা নিজেরই বিপদ ঘটাতে পারে,' মৃদু গলায় বলল রানা।

চোখ নামিয়ে নিজের হাতে ধরা গ্রেনেডটার দিকে তাকাল ববি। ধীরে ধীরে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল তার, যেন গ্রেনেডটা দেখে অবাক হয়েছে, ভাবছে কিভাবে তার হাতে এল এটা। ধীরে ধীরে লকারের মাথায় রেখে দিল গ্রেনেডটা। 'কে আপনি?'

দরজায় নক হলো। সলোজার হাঁক শোনা গেল। 'বলি, তোমাদের হলোটা কি? কফির সময় যে পেরিয়ে যায়। মারা গেছ নাকি সবাই?'

বাঙ্ক থেকে নামল রানা। ওপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল লিলি। দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা, ভেতরে ঢুকল সলোজা। তার এক হাতে কয়েকটা কাপ, আরেক হাতে কফি পট। 'কফি কালই খেতে হবে, খেয়ে বলতেও হবে ভাল হয়েছে। শেষ যে-টুকু ক্রীম ছিল, আমার পেটে গেছে।'

তার হাত থেকে কফির কাপ নিয়ে বাঙ্কের ওপর বসল রানা। 'জালুচি কোথায়?'

'বিশ মিনিট আগে হুইল ধরেছে। উইন্ডস ফোর টু ফাইভ। বৃষ্টি হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ঢেউও খুব ছোট নয়। তবে উদ্বিগ্ন হবার মত কিছু নয়।'

বাঙ্কের ওপর উঠে বসে কফির কাপে চুমুক দিল ববি। চোখ দুটো সতর্ক। সবার কথা কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছে।

জিজ্ঞেস করল রানা, 'শরীর ভাল লাগছে তো?'

সরাসরি প্রসঙ্গে ফিরে এল ববি, 'তার আগে বলুন, কে আপনি? আমাকে নিয়ে এসব কি ঘটছে?'

'আমি মাসুদ রানা।' সলোজা আর লিলিকে দেখাল ও। 'ও সলোজা, আর ও লিলি। তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন তোমার বাবা।'

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল ববি। 'কে? আমার বাবা?'

'সালভাদর মারানজানা।'

'ও, তার কথা বলছেন!' বাল্ক হেডে হেলান দিল ববি। দুর্বল একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'ব্যাপারটা তাহলে এই! তার মানে এতক্ষণ আমি অলীক স্বপ্ন দেখছিলাম?' সরাসরি রানার চোখে চোখ রেখে শান্তভাবে আবার বলল সে, 'ঠিক আছে, বলুন, ঠিক কিভাবে মারতে বলেছে সে আমাকে? খুলির পিছনে একটা বুলেট? নাকি বুকের মাঝখানে ছুরি?'

বিস্মিত হলো রানা। পরমুহূর্তে পরিষ্কার আলোর আভাস পেল ও।

'কি বলছে ও, রানা?' দ্রুত জানতে চাইল লিলি।

স্টেচকিনটা বেল্টে ঢুকিয়ে রেখেছিল রানা, সেটা আবার বের করে হাতে নিল। ববিকে শিউরে উঠতে দেখল ও। মেশিন-পিস্তলটা উল্টো করে ধরে তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

অনেকটা নিজের অজান্তেই হাত বাড়িয়ে স্টেচকিনটা নিল ববি।

'সেফটি ক্যাচ অফ করা নেই,' বলল রানা। 'ঠিক আছে? এখন তোমার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে চাই আমি। আমি যতটুকু জানি সব তোমাকে বলব, কিন্তু শর্ত হলো তুমি যতটুকু জানো সব আমাকে বলবে। আমার ধারণা, তাতে আমরা পরস্পরকে অবাক করে দিতে পারব।'

দু'হাতে ধরে স্টেচকিনটা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করল ববি, চেহারায় চিন্তার ছাপ। তারপর মুখ তুলে বলল, 'বেশ।'

'প্যালেস্টাইন গেরিলা দলে যোগ দিয়েছিলে তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ওদের হয়ে আমিও দু'একবার যুদ্ধ করেছি,' বলল রানা। 'যাকে বলে ভাড়াটে সৈনিক, আমি ঠিক তা না হলেও আমাকে তুমি ভাড়াটে উদ্ধারকারী বলতে পারো, যার বিশেষত্ব হলো দুর্গম জায়গা থেকে আটকা পড়া লোককে উদ্ধার করে নিয়ে আসা। তার মানে, সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়েও ভাল টাকা কামিয়েছি আমি। বিভিন্ন জায়গায় আটকা পড়া লোকের সংখ্যা তো আর কম নয়!'

'বুঝেছি। আমার সৎ বাবা আপনাকে ভাড়া করেন।'

'ঠিক তা নয়। তিনি আমাকে ভাড়া করতে চান বটে, কিন্তু আমি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করিনি। তাঁকে আমার কেন জানি না পছন্দ হয়নি।'

'তার মানে, সে আপনার ওপর জোর খাটায়? বাধ্য করে?'

রানাকে রাজি করাবার জন্যে সালভাদর মারানজানা কিভাবে ফাঁদ পেতেছিল তার সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা পেল ববি। সব শুনে তিক্ত হাসল ববি। বলল, 'বেজন্মা কুকুর! যদ্দিন বেঁচে থাকবে এই রকম হারামীপনা করেই কাটাবে ও।'

'বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আল কাপুনির অত্যন্ত প্রিয় লোক হত মারানজানা।'

'আমি অন্তত একজনকে চিনি যিনি ওই কুত্তাটাকে মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করতেন। তিনি আমার মা। মায়ের সাথে কুকুরের মত ব্যবহার করত মারানজানা। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত চরম আতঙ্কে কাটিয়েছেন তিনি। মারানজানার গলার আওয়াজ শুনে ঠক ঠক করে কাঁপতেন।'

'ঠিক উল্টো কথা বলেছে আমাকে মারানজানা। তোমার মাকে নাকি

ভালবাসত সে। সেজন্যেই নাকি ইসরায়েলি কারাগার থেকে তোমাকে উদ্ধার করার গরজ তার। এটাকে সে তার প্রিয় স্ত্রীর প্রতি পবিত্র দায়িত্ব বলে বর্ণনা করেছে।'

আবার তিক্ত হাসি ফুটল ববির মুখে। 'মারানজানার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি। মেডিটেরেনিয়েনের চারদিকে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এই সময়ই কয়েকজন প্যালেস্টাইনী ছাত্রের সাথে পরিচয় হয় আমার। পড়াশোনা শেষ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ওরা, আমি ভিড়ে যাই ওদের সাথে।'

'কিন্তু তোমার সৎ বাবা তোমাকে ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা করেছিল, তাই না?' জানতে চাইল সলোজা।

'নিশ্চয়ই!' চেহারায় রাগের ভাব ফুটে উঠল ববির। 'কিন্তু আমার উপকার করার জন্যে নয়। মারানজানা আমার কবরে একটা ফুলও পাঠাবে না। মনেপ্রাণে ঘৃণা করে সে আমাকে, কারণ কয়েক বারই আমি তার মুখের ওপর বলে দিয়েছি তার সম্পর্কে আমার ধারণা কি। লোকজনের সামনে বলতেও দ্বিধা করিনি। আমার ভাল-মন্দের ব্যাপারে তার মাথা ব্যথা শুরু হয় মা মারা যাবার পর থেকে।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল রানা।

'সহজ ব্যাপার। বড় ধরনের ইন্সুরেন্স পলিসির মত। জীবিত ববি নয়, মৃত ববির দাম আছে—অন্তত মারানজানার কাছে। মার্কিন সরকার তাকে বহিষ্কার করে, জানেন নিশ্চয়ই? কিন্তু আমার মা জন্মসূত্রে আমেরিকান, কাজেই তিনি রয়ে যান। আমেরিকা ত্যাগ করার আগে বিপদ ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে, তার সমস্ত সয়-সম্পত্তি এবং ব্যাংকের টাকা সব আমার মায়ের নামে লিখে দেয় মারানজানা। এতে কোন ঝুঁকি ছিল না তার, কারণ মা তাকে যমের চেয়েও বেশি ভয় করত। ধমক দিলে আধমরা হয়ে যেত।'

'থামো, থামো,' তাড়াতাড়ি বলল সলোজা। 'ব্যাপারটা বোধহয় এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে আসছে। তোমার মায়ের নামে সব লিখে দেয়ার পর তিনি দেখলেন মারানজানা বছরের পর বছর ধরে তার ওপর যে অত্যাচার চালিয়েছে, তার প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ—এই তো?'

'ঠিক তাই। ক্যান্সার হয়েছিল, তিনি জানতেন তাঁর সময় ঘনিয়ে এসেছে। সব সম্পত্তি এবং ব্যাংকের নগদ টাকা সব আমাকে দিয়ে যান তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, পঁচিশ বছর বয়স না হলে সে-সব ভোগ দখল করতে পারব না আমি। ট্রাস্ট ল তাই বলে।'

'কিন্তু তার আগেই তুমি যদি মারা যাও?'

'আইনসঙ্গতভাবেই সব পেয়ে যাবে মারানজানা।' তিক্ত হাসল ববি। 'শুনেছি মা আমাকে সব দিয়ে গেছেন শুনে মারানজানার নাকি তিন দিন জ্ঞান ছিল না।'

'কতদিন আগের ঘটনা এসব?'

'আট নয় মাস।'

লিলির দিকে ফিরল রানা। 'অথচ এসব কিছুই জানতে না তুমি?'

'যীশুর কিরে, কিছুই জানতাম না। আমি তো মাত্র ছয় মাস হলো আছি ওর সাথে।'

বলে চলল ববি, 'অনেক অনুরোধ করেছে মারানজানা, আমি যেন তার সাথে দেখা করি। এক হাজার একটা প্রতিজ্ঞা করে বোঝাতে চেষ্টা করেছে আমার কোন ক্ষতি সে করবে না। কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করিনি। সেজন্যেই আজও বেঁচে আছি। তারপর, এক রাতে, অন্ধকার থেকে কেউ একজন গুলি করল আমাকে লক্ষ্য করে। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেলাম আমি। তখন আমি ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছি। বুঝলাম, আমাকে খুন করার জন্যে ভাড়াটে খুনী লাগিয়েছে মারানজানা। কাজেই ভবঘুরে সেজে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম, এই সময় প্যালেস্টাইনী ছাত্রদের সাথে আমার পরিচয় হয়। একজন আমেরিকান হয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পিছনে যতটা না নৈতিক দায়িত্ব বোধ কাজ করেছে, আমার বেলায় তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারটা। যুদ্ধ করতে গিয়ে ইসরায়েলিদের হাতে আমি ধরাও পড়ি একরকম স্বেচ্ছায়। কারণ, জানতাম, ভাড়াটে খুনী পাঠিয়ে আমাকে খুন করার চেষ্টা ছাড়বে না মারানজানা। ইসরায়েলি কারাগারই আমার জন্যে ছিল সবচেয়ে নিরাপদ।' একটু থেমে দম নিল ববি, তারপর আবার বলল, 'জানি, শুনতে অবিশ্বাস্য লাগছে, কিন্তু আসল ঘটনা এই-ই।'

ববি থামল। তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'তোমার বয়স?'

'আগামী বছর মার্চে পঁচিশে পড়ব।'

'ততদিন যদি বেঁচে থাকো, কি করবে?'

সাথে সাথে উত্তর দিল ববি, 'মারানজানার সয়-সম্পত্তি বা টাকার ওপর আমার কোন লাভ নেই। প্রোটেকশন, প্রসটিটিউশন, ড্রাগস—এই ধরনের জঘন্য সব ব্যবসা করে, অর্থাৎ অন্যায়ভাবে নিরীহ লোকের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে মারানজানা। কাজেই ওর টাকা আমি ছুঁয়েও দেখতে চাই না। অনেক রিলিফ অর্গানাইজেশন আছে, তারা পাঁচশো মিলিয়ন ডলার পেলে আরও ভাল কাজ করতে পারবে।'

লিলির দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিস হিস করে বাতাস বেরিয়ে এল।

ফিসফিস করে জানতে চাইল সলোজা, 'কত? কত বললে?'

'দু'চার ডলার কমবেশি হতে পারে।'

এরপর আবার অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা যোগাল না। রানার দিকে তাকাল লিলি। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কি যেন চিন্তা করছে সে।

'রানা?' নিচু গলায় ডাকল লিলি।

উঠে দাঁড়াল রানা।

'আপনি আমাকে মারানজানার হাতে তুলে দেবেন, তাই না, মি. রানা?' শান্তভাবে জানতে চাইল ববি, কিন্তু তার মুখের এক পাশে ফুটে উঠল বিদ্রূপের

হাসি।

ঘুরল রানা, পিছন ফিরল দরজার দিকে। 'আর কি করার আছে আমার? মারানজানার হাতে কিটি রয়েছে।'

রানার শার্টের আস্তিন টেনে ধরল লিলি, রাগের সাথে তার দিকে ফিরল রানা। 'কোন্ দলকে সমর্থন করব সেটা প্রশ্ন নয়, এটা কিটিকে বাঁচাবার প্রশ্ন। আমার মত তুমিও সেটা জানো।'

'আপনি বোকার স্বর্গে বাস করছেন, মি. রানা,' বলল ববি। 'কিটিকে আপনি কোনভাবেই ফিরে পাবেন না। ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছে মারানজানার মনে মুহূর্তের জন্যেও উদয় হয়নি। সে শুধু আমাকে চায়—আমার লাশ। এ-ব্যাপারে আপনার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে মনে করতে হবে আপনি এখনও তাকে চিনতে পারেননি।'

'আর বোধহয় দেরি করা উচিত হচ্ছে না আমাদের,' বলল সলোজা। 'জালুচিকে মুঠোয় ভরার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক,' সাথে সাথে সায় দিল রানা। 'আলোচনা যা হবার তারপর হবে।'

'জালুচি কে?' জানতে চাইল ববি।

'মারানজানার লোক,' বলে ববির হাত থেকে নিয়ে বেল্টে গুঁজে রাখল স্টেচকিনটা। 'রেড ইন্ডিয়ানদের মত দিয়ে আবার ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে দুঃখিত, ববি। কিন্তু এটা আমার দরকার হবে।' লিলির দিকে ফিরল রানা। 'ওর সাথে থাকো তুমি।'

দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা। ওকে অনুসরণ করল সলোজা।

সেলুনে কাউকে দেখল না ওরা। সলোজা হাঁক ছাড়ল, 'বনেটি, কোথায় তুমি?'

ফরওয়ার্ড কেবিন থেকে জালুচির চিৎকার ভেসে এল, 'কুইক, সলোজা! ওটেলিয়োর অবস্থা সিরিয়াস!'

সামান্য একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে দরজার কবাট। ঠেলে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে ভেতরে ঢুকল রানা। ডেকের ওপর পড়ে রয়েছে বনেটি, রশি দিয়ে বাঁধা হাত, মুখের ভেতর কাপড় গোঁজা। একই অবস্থা ওটেলিয়োর। কবাটের আড়াল থেকে রানার পিছনে বেরিয়ে এল জালুচি। রানার গলার পাশে উজি সাব-মেশিনগানের মাজল চেপে ধরল সে। 'বেয়াদবি করো কি মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

রানার বেল্ট থেকে স্টেচকিনটা বের করে নিয়ে পকেটে ভরল জালুচি। তারপর রানার মাথার চুল মুঠো করে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘোরাল ওকে, গলার পাশ থেকে উজির মাজলটা মুহূর্তের জন্যে সরল না।

রানার একটু পিছনে, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সলোজা। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা বেরিয়ে এসেছে তার হাতে।

'তোমার প্রিয় হিরোকে যদি মরতে দেখতে না চাও, ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখো হাতের ওটা,' সলোজাকে বলল জালুচি। 'এই একবারই বললাম এরপর গুলি করব।'

সলোজার পিছন থেকে ভেসে এল লিলির গলা, 'যা বলছে করো, সলোজা।' সলোজার বগলের নিচ দিয়ে একটা হাত গলিয়ে তার কাছ থেকে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা কেড়ে নিল সে।

'চমৎকার, সুইটি,' বলল জালুচি। 'আমাদের বন্ধুর অবস্থা কি দেখে এলে?'

'তেমন ভাল নয়,' বলল লিলি। 'তবে বেঁচে যাবে।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল জালুচি। তারপর বলল, 'বেঁচে যাবে, তাই না? নাহ্, তোমার রসিকতার তুলনা মেলা ভার!' রানার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে এল সে। 'আফটার কেবিনের ওই ভেন্টিলেটারটাকে তুমি ভয়েস পাইপও বলতে পারো—ওদিকের খুটখাট আওয়াজ পর্যন্ত এদিক থেকে পরিষ্কার শোনা যায়।'

'জালুচি,' লিলির গলার আওয়াজ রানার কানে প্রায় মিষ্টি শোনাল, 'ববিকে নিয়ে আসব এখানে?'

'অবশ্যই!'

'শয়তান মেয়েলোক!' দাঁতে দাঁত ঘষল সলোজা। 'কুত্তী! ডাইনী! যদি বেঁচে থাকি, যীশুর মায়ের কিরে, তোর পোঁদে আমি লোহা গরম করে ছ্যাঁকা না দিই তো আমার নাম ভার্জিল সলোজা নয়!'

মিষ্টি করে হাসল লিলি। তারপর জালুচির দিকে ফিরে আবদারের সুরে বলল, 'বুড়ো ভামটা আমাকে যে গালাগালি করছে, তুমি ওকে কিছু বলবে না, জালুচি?'

হেসে উঠল জালুচি। 'আমার কাছ থেকে আলাদা ভাবে শাস্তি পাবার যোগ্যতা ওর নেই। আর গালাগালি করছে বলে কিছু মনে কোরো না। ব্যাটা মড়াপোঁতা কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই সবার সাথে লাশ হয়ে যাচ্ছে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'কিহে, হিরো, তুমি যে একেবারে বোবা বনে গেলে? দু'একটা চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি না ছাড়লে জমে নাকি?'

লিলির দিকে তাকাল রানা। লিলিও তাকাল রানার দিকে। ধীরে ধীরে কোমরে হাত তুলল সে। তার চেহারায় ভাবাবেগের চিহ্নমাত্র নেই। 'নারী রহস্যময়ী!' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে গেল আফটার কেবিন থেকে।

'মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই,' বলল জালুচি। 'কিন্তু উপদেশটা কাজে লাগাবে, সে বরাত করে আসোনি তুমি। কিন্তু এ কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে যে অনেক কিছু শেখা বাকি আছে তোমার। সেজন্যেই অকালে বিদায় নিতে হচ্ছে তোমাকে।'

'ববিকে নিয়ে কি করবে তুমি?' জানতে চাইল রানা। 'ষাট পাউন্ড চেন দিয়ে বেঁধে ফেলে দেবে পানিতে?'

'তুমি আমাকে নিরাশ করলে!' কৃত্রিম অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জালুচি। বাল্কহেডের গায়ে হেলান দিল সে। 'সাগরে ফেলে দিলে দুনিয়ার লোক জানবে কিভাবে, যে মারা গেছে সে ববি ইউজিন কিনা? যোগ্য, বিশ্বস্ত একজন সাক্ষী থাকা দরকার। একজন সিসিলিয়ান করোনারের সার্টিফিকেট সবচেয়ে ভাল। সবাই তার কাছ থেকেই জানবে; ইসরায়েলি কারাগার থেকে পালাবার সময় মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছিল ববি, বোটে করে ফেরার সময় মারা যায়। প্ল্যানটা কেমন,

রানা?'

'বাকি সবার কি হবে?'

'ম্যাসাকার, রানা, ম্যাসাকার! ইসরায়েলি কারাগারে কি ঘটেছে তার কথা বলছি। শুধু রক্ত আর রক্ত। তারপরও আমাদের মধ্যে থেকে কেউ বেঁচে গেছে, এটা একটা অলৌকিক ব্যাপার।'

'তার মানে তুমি আর লিলি?'

'ঠিক ধরেছ!' একে একে সলোজা, বনেটি আর ওটেলিয়োর দিকে তাকাল জালুচি। 'আর কোন কথা নয়। ডেকে চলো সবাই।'

আফটার কেবিন থেকে লিলির গায়ে হেলান দিয়ে বেরিয়ে এল ববি।

'দুঃখিত, ববি,' ম্লান সুরে বলল রানা। 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত ওদেরই জিত হয়েছে।'

'মন খারাপ করবেন না। সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। নিরাপদ কারাগারে, ল্যান্ডিঙ ডি-র তিয়াত্তর নম্বর সেলে ঘুম থেকে জেগে উঠব আমি।'

সিধে হয়ে দাঁড়াল জালুচি। 'সলোজা, তুমি ববিকে সাহায্য করবে। লিলি, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে এসো। তারপর তুমি বেরোবে, রানা। কোনরকম হিরোইজম নয়। সুন্দর, গুছানো চাই আমি পরিবেশটা।'

সরু কম্প্যানিয়নওয়ে, তার ওপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়ায় ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলতে শুরু করেছে ভিরোমা, ববিকে ধরে এগিয়ে যেতে খুব অসুবিধে হলো সলোজার। পথে একবার হোঁচট খেল ববি, পেছন থেকে হুঙ্কার ছাড়ল জালুচি, 'খবরদার! ফের যদি চালাকি করার চেষ্টা করো, আমি গুলি করব!' নিরাপদেই ডেকে পৌঁছে গেল ওরা। রানার দিকে উজি তাক করল জালুচি। 'এবার তুমি, হিরো।'

কম্প্যানিয়নওয়েতে দেখা গেল লিলিকে। তাকে পাশ কাটাবার সময় গায়ে আঙুলের স্পর্শ অনুভব করল রানা। লিলি কি ইচ্ছে করে ছুঁল ওকে? ঠিক বুঝতে পারল না রানা। কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ডেকে উঠে এল ও। অ্যাকশনের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি।

ঠাণ্ডা হিম বাতাস শুরু হয়েছে। অশান্ত হয়ে উঠেছে সাগর, ঢেউয়ের মাথায় ফেনার মুকুট। থেমে গেছে ভিরোমা, অসম্ভব দুলছে। হুইলহাউসের গায়ে হেলান দিয়ে ববিকে কাভার দিচ্ছে লিলি। ডেকের ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে ববি। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সলোজা। লিলির পেছনে, একপাশে দাঁড়াল জালুচি। তার কাছ থেকে সাত আট হাত দূরে রানা।

'জানতে ইচ্ছে করে,' সকৌতুক হাসি দেখা গেল জালুচির ঠোঁটে, 'কেমন লাগছে তোমার, রানা?'

শান্ত গলায় জালুচির পেছন থেকে বলল লিলি, 'এখুনি জানতে পারবে। মাথার ওপর হাত তোলো, জালুচি।'

পলকের জন্যে স্থির হয়ে গেল জালুচি, পরমুহূর্তে ঘুরতে শুরু করল সে। কিন্তু তাকে কোন সুযোগ না দিয়ে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের ট্রিগার টিপে দিল লিলি। একই

সাথে জালুচিকে লক্ষ্য করে লাফ দিল রানা।

চোখের পলকে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। ট্রিগার টিপে দিয়েই বোকা বনে গেল লিলি। গুলি বেরোয়নি। সাথে সাথে খেয়াল হলো তার, সেফটি ক্যাচ অফ করা হয়নি। ছোঁ দিল জালুচি, লিলির হাত থেকে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ছিটকে পড়ল ডেকের শেষ প্রান্তে। সাথে সাথে ঘুরে দাঁড়াল জালুচি। কাছে এসে পড়েছে রানা, ওর বুকের দিকে একটা পা তুলে ওকে ঠেকাবার চেষ্টা করল সে। একই সময়ে পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে জালুচির গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল লিলি।

ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল রানা, মেইন হ্যাচ কাভারের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ল। এলোপাতাড়ি গুলি চালাল জালুচি। প্রথম গুলিটা লাগল ডেকে বসা ববির বুকের পাশে। দ্বিতীয় গুলিটা লাগল সলোজার কাঁধে। কনুই চালিয়ে লিলিকে সরাতে চেষ্টা করল জালুচি। ছিটকে পড়ে গেল লিলি। পরমুহূর্তে ঘুরে রানার দিকে ফিরল জালুচি। হাতের গান উঠে আসছে শরীরের পাশ থেকে।

কিছুই করার নেই এই মুহূর্তে, কাজেই লাফ দিয়ে পোর্ট রেইল টপকাল রানা, ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে।

পানিতে পড়ে ডুব সাঁতার দিয়ে বোটের নিচে চলে এল রানা। পিঠে আঁচড় কাটল কীল, জ্বালা করে উঠল চামড়া। দম ফুরিয়ে এল ওর। ব্যথা করছে ফুসফুস। কিন্তু হাল ছাড়ল না। খোলের নিচে দিয়ে বোটের স্টারবোর্ড সাইডে চলে এল ও। মাথা তুলল পানির ওপর।

সাথে সাথে শুনতে পেল জালুচির গলা, 'শালা গেল কোথায়? পানিতে পড়েই মরে গেল নাকি?'

ঠাস করে চড়ের আওয়াজ পেল রানা। তারপর আবার জালুচির গলা, 'কুত্তী! প্রেমে পড়ে গেছ! ওকে মারতে যাচ্ছি দেখেই পাগল হয়ে গেলে! এমন শিক্ষা দেব যে···' আবার কষে চড় মারার আওয়াজ।

লিলির কান্নার আওয়াজ পেল রানা। বুক ভরে শ্বাস নিল ও। রেইল ধরে উঠতে শুরু করল সন্তর্পণে। ডেকে উঠে চারদিকটা দেখে নিল ভাল করে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল হুইলহাউসের দরজার দিকে।

'শাবাশ, রানা!' জালুচির গলা। 'সত্যি হিরো তুমি! হাল ছাড়তে জানো না, কেমন?'

দ্রুত মুখ তুলল রানা। স্টারবোর্ড রেইলের কাছে স্টার্নে দাঁড়িয়ে রয়েছে জালুচি। মুখে হাসি নিয়ে কোমরের কাছ থেকে গুলি করল সে। রানার বাঁ পা-টা ঝাঁকি খেল। কিন্তু থামল না রানা। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল হুইলহাউসের ভেতর। ডেকের ওপর দিয়ে ছুটে এল জালুচি। হাতে যেটা পেতে চায় সেটার কাছে রানা পৌঁছুবার আগেই দোরগোড়ায় চলে এল সে।

খোলা জানালার পাশে উঠে দাঁড়াল রানা। মিষ্টি করে হাসল জালুচি, রিভলভার ধরা হাতটা নামিয়ে শরীরের পাশে ঝুলিয়ে রাখল। 'তোমার অবস্থা সুবিধের নয়, হিরো। মায়া লাগছে।'

এতবড় ঝুঁকি জীবনে বোধহয় আর কখনও নেয়নি রানা। কিন্তু সেই সাথে

জানে, শুধুমাত্র এই ঝুঁকিটা নিয়েই নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারে ও। মৃত্যু যে-কোন মুহূর্তের ব্যাপার। জালুচির আঙুলের ডগায় ঝুলছে। গর্ব আর আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই শয়তানটার, সেটাই রানার পুঁজি। দু'হাত দিয়ে বাল্ক হেডের গা আঁচড়াতে শুরু করল ও, যেন নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তে ফ্ল্যাপ ফেলে দিয়ে খপ করে ধরল উজিটা, ট্রিগার টিপে ধরে ঘুরতে শুরু করল।

ভোঁতা ক্লিক আওয়াজ বেরুল শুধু, গুলি নয়।

হো হো করে হেসে উঠল জালুচি। 'জীবন বড় বৈচিত্র্যময়, তাই না, রানা? বিবেক কামড় বসাবার আগেই তোমার বান্ধবী ওটার কথা বলে দিয়েছিল আমাকে। তবে, শেষ মুহূর্তে বেঈমানী করায় ওকে আমি উচিত শিক্ষা দেব। জীবনের ওপারে গিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে পারো তুমি। কথা দিচ্ছি, খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে।'

উজিটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা। বাল্ক হেডের গা থেকে পিছলে পড়ে গেল ডেকে। চেহারায় ফুটে উঠেছে রাজ্যের হতাশা।

গোটা ব্যাপারটা সাংঘাতিক উপভোগ করছে জালুচি। 'আহা, না জানি কার বুকের ধন! কি অসহায় ভাবে মারা যাচ্ছ তুমি! এতক্ষণে নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছ কার পাল্লায় পড়েছ!'

ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেট গুঁজল জালুচি। চার্ট টেবিলের বোতামটা স্পর্শ করল রানার আঙুল। পড়ে গেল ফ্ল্যাপ। স্টেচকিন মুঠোয় নিয়ে জালুচির ডান কনুইয়ের ওপর গুলি করল ও। গুলি করার আগের মুহূর্তে রানার সমগ্র অস্তিত্বে একটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, গুলি হবে কিনা! লিলি বেঈমানী করেছে কিনা!

জালুচির অবশ আঙুল থেকে খসে পড়ল রিভলভার। অস্থির ডেকে পড়ে পিছলে রেইলের নিচে দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ল সেটা। বাঁ হাত দিয়ে ডান কনুই চেপে ধরল জালুচি। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে এল তাজা লাল রক্ত। কিন্তু মুখে এখনও লেগে আছে সেই কৌতুকের হাসিটা।

'এক নম্বর অনুশীলন,' বলল রানা, 'কাউকে যদি গুলি করতে হয় দেরি কোরো না।'

'আমি একটা গাধা!' ব্যথায় মুখ বাঁকা করে বলল জালুচি।

'যাক, একটা সত্যি কথা অন্তত শুনলাম তোমার মুখে। বিদায়, জালুচি।'

তাম্র বাঁ কাঁধে গুলি করল রানা। ঘুরে গেল সে। ঠিক যেভাবে ঘুরে গিয়েছিল সার্জেন্ট ওয়াকেম। পরের গুলি দুটো জালুচির শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দিল। ছিটকে গিয়ে স্টারবোর্ড রেইলের ওপর পড়ল সে। ক্রল করে হুইলহাউস থেকে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। এক হাত দিয়ে তার পায়ের গোড়ালি ধরল। খানিক দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল লাশটা সাগরে।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল রানার। পড়েই যাচ্ছিল, কোন মতে টলতে টলতে হুইলহাউসের জানালা পর্যন্ত এসে হেলান দিল সেটার গায়ে। তেমন কোন পরিশ্রম হয়নি, কিন্তু ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। এতক্ষণে খেয়াল হলো বাঁ পায়ের হাঁটুর

উল্টোদিকে এবং একটু নিচে ক্ষতটা থেকে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে। হঠাৎ চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা হয়ে এল ওর। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে চিৎকার করে ডাকল ও, 'সলোজা! লিলি!' তারপর আর কিছু মনে নেই রানার।

একটু পরই জ্ঞান ফিরে এল রানার। দেখল, ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে লিলি। ওকে চোখ মেলতে দেখেই উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ। ওর বুকে একটা হাত রেখে জানতে চাইল, 'কেমন লাগছে এখন?'

বুকের ওপর থেকে লিলির হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে বসল রানা। 'সলোজা কোথায়?' লক্ষ্য করল, এরই মধ্যে ওর পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া হয়েছে।

'ববির কাছে।'

লিলির হাত ধরে উঠে দাঁড়াল রানা। মাথাটা ঘুরে উঠল না দেখে স্বস্তি বোধ করল ও। 'চলো।'

মেইন হ্যাচের পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ববি, তার পাশে রয়েছে সলোজা। হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে সে। ববির গায়ের শার্ট খুলে নিয়েছে সলোজা। তার বাঁ দিকের পাঁজরে একটা ক্ষত দেখা গেল।

ওদের পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলল সলোজা। 'কেমন লাগছে এখন? দ্রুত জানতে চাইল সে।'

পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'ববির কি অবস্থা?'

'ভেতরে রয়ে গেছে বুলেট।' উঠে দাঁড়াল সলোজা। 'বাঁ ফুসফুসটা জখম হয়েছে। হার্টেও ঘষা খেয়েছে বুলেট। অবস্থা খারাপ, রানা।'

'কি রকম খারাপ?'

'মারা যেতে পারে।' রানার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সলোজা। লিলিকে বলল, 'বনেটি আর ওটেলিয়োর বাঁধন খুলে দিয়ে এসো।' তারপর আবার রানার দিকে তাকাল। 'তুমি যখন গুলি করলে, কেমন দেখতে হয়েছিল বানচোতের চেহারাটা?'

'অবাক।'

সলোজার চেহারায় সন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠল। 'এই একটা লোক, প্রার্থনা করার সময় যাকে আমার মনে পড়বে না।'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে উঠে এল বনেটি। 'শালা কুত্তার বাচ্চা! কাপুরুষ! আচমকা পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে না পড়লে শালাকে আমি দেখে নিতাম···'

'থাক, অজুহাত দেখাতে হবে না,' ধমকের সুরে বলল সলোজা। 'রানাকে নিচে নামতে সাহায্য করো।'

কম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে রানাকে নামিয়ে আনল ওরা। সেলুনের একটা বেঞ্চ সীটে ওকে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল আবার, তারপর ববিকে নিয়ে এল আফটার কেবিনে। একটা গ্লাসে খানিকটা ব্র্যান্ডি ঢেলে রানাকে দিল লিলি, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে গুঁজে দিল ওর মুখে।

'এরই নাম কি ভালবাসা?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা।

ওর মুখের সামনে গ্লাস ধরল লিলি, কিন্তু চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ করেই এমন

কাঁপতে শুরু করল রানা যে গ্লাসের অর্ধেক ব্র্যান্ডি পড়ে গেল ছলকে।

'রানা!' দ্রুত জানতে চাইল লিলি, 'তুমি সুস্থ তো?'

'রিয়্যাকশন,' বলল রানা। 'বুলেট যখন লাগে তেমন কিছু টের পাওয়া যায় না, তারপর শকটা নার্ভাস সিস্টেমকে সম্পূর্ণ অবশ করে দেয়। পরে শুরু হয় ব্যথা।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বাঁ পায়ে তীব্র ব্যথা অনুভব করল রানা। সম্ভবত ওর কাতর ধ্বনি শুনেই মেডিসিনের ব্যাগ হাতে আফটার কেবিন থেকে ছুটে এল সলোজা।

প্রচণ্ড ব্যথায় চোখ মুখ কুঁচকে উঠেছে রানার, তবু সলোজাকে দেখে প্রথমেই ববির খবর নিল, 'কেমন আছে ও?'

'এক ফোঁটা রক্ত পড়েনি,' বলল সলোজা। 'ক্ষতি যা হবার ভেতরে হয়েছে। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে একটা মরফিন দিয়েছি। আর কিছু করার নেই আমার।'

'জ্ঞান আছে?'

মাথা ঝাঁকাল সলোজা। 'আছে।' লিলির দিকে তাকাল। 'গরম এক কাপ কফি দিতে পারো ওকে।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল লিলি। রানার বাঁ পা ধরে টেবিলের ওপর তুলল সলোজা। তারপর রানাকে দুটো মরফিন ইঞ্জেকশন দিল সে। মুচকি একটু হাসল। বলল, 'এই মুহূর্তে আমাকে তুমি তোমার বুড়ি দাদীমা মনে করতে পারো।' মেডিসিন ব্যাগ থেকে নিডল আর থ্রেড বের করল সে। 'একটু সেলাই করব।'

আঁতকে উঠল রানা।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' অভয় দিয়ে বলল সলোজা। 'তুমি যত ভাল ডিনার খেয়েছ তার চেয়ে বেশি কাফন সেলাই করেছি আমি।' রানার হাঁটুর উল্টোদিকের ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষতটা ভাল করে পরীক্ষা করল সে। তারপর হাত দিল সেলাইয়ের কাজে। মরফিন তার কাজ আগেই শুরু করে দিয়েছে, কাজেই প্রায় কিছুই টের পেল না রানা, দ্রুত সেলাই শেষ করল সলোজা। তারপর আবার ফিল্ড ড্রেসিং দিয়ে বেঁধে দিল ব্যান্ডেজ। 'সব ঠিক,' বলল সে। 'আর কোন চিন্তা নেই।'

এই সময় প্রাণ ফিরে পেল ইঞ্জিন। এগোতে শুরু করল বোট।

'রওনা হতে বলে দিয়েছিলাম বনেটিকে,' বলল সলোজা। রানার চোখে চোখ রেখে খানিক ইতস্তত করল সে। তারপর আবার বলল, 'কি হবে রানা? কিভাবে কি করবে বলে ভাবছ?'

'জানি না, ভেবে দেখতে হবে। এখন আমার ঘুম পাচ্ছে।'

একটা হাত বাড়িয়ে দিল সলোজা, কিন্তু সেটা না ধরেই বেঞ্চ সীটের ওপর উঠে বসল রানা। ট্রে হাতে কেবিন থেকে ফিরে এল লিলি।

'কেমন আছে ও?' জানতে চাইল রানা।

'ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'আমিও ঘুমাতে যাচ্ছি,' আফটার কেবিনে চলে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়ল। অসম্ভব ক্লান্তিতে শরীরটা যেন ভেঙে খান খান হয়ে যেতে চাইল। একটু পর হঠাৎ খেয়াল হলো, চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ববি।

চোখাচোখি হতে মুখ খুলল ববি, 'কি থেকে কি হয়ে গেল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কি হবে এখন?'

'এখনও জানি না।'

'মি. রানা, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমি মারা যাচ্ছি?' শান্ত গলায় জানতে চাইল ববি।

'জানি না, ববি,' বলল রানা। 'তোমাকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার···'

'আর হাসপাতাল!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ববি। চোখ তুলে কেবিনের সিলিঙের দিকে তাকাল সে। 'সেখানে গিয়ে কিছু হবে না, মি. রানা। চিকিৎসার বাইরে চলে গেছি আমি। অথচ, কি আশ্চর্য, তাই না,···মারানজানা বেঁচে থাকবে!' কর্কশ সুরে হাসল সে। তারপর খক খক করে কাশল খানিক। 'উঁহুঁ, ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছি না, মি. রানা!'

কিন্তু উত্তরে কিছু বলার জন্যে তখন আর জেগে নেই রানা। গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে ও।

দশ

সেই বিকেলে ঘুম ভাঙল রানার। পায়ে তীব্র ব্যথা, তাই আবার মরফিন নিতে হলো। সন্ধের দিকে শুরু হলো তুমুল ঝড়। সারাটা রাত জেগে কাটাল সবাই। ভাগ্য ভাল যে সকালের দিকে শান্ত হয়ে এল সাগর। জোর করে শুইয়ে দেয়া হলো রানাকে। একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল ও। পায়ে ব্যথা নিয়ে নয়টার দিকে ঘুম ভাঙল রানার। মরফিনের প্রভাব শেষ হতে শুরু করেছে। বাঙ্কের ওপর উঠে বসে দেখল ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ববি। তার কপালে চিকচিক করছে ঘাম।

'ঘুমাতে পারোনি?'

'যতক্ষণ বেঁচে আছি জেগে থাকতে পারলে খুশি হই,' ম্লান হেসে বলল ববি। 'কি করবেন না করবেন এখনও কিছু ঠিক করেননি?'

'না।'

'যাই করুন, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ বোধ করব। আপনার সিদ্ধান্ত আমার জন্যে খারাপ হলেও আমি প্রতিবাদ করব না।' আবার জোর করে ম্লান একটু হাসল সে। 'অবশ্য ততক্ষণ যদি বেঁচে থাকি আর কি!'

অস্বস্তিবোধ করল রানা। বাঙ্ক থেকে নেমে দরজা খুলল, বেরিয়ে এল সেলুনে। কেউ নেই, তবে টেবিলের ওপর মেডিসিন ব্যাগটা রয়েছে। ব্যাগের ভেতরটা হাতড়ে মরফিন অ্যাম্পুলের বাক্সটা বের করল ও, এই সময় সেলুনে ঢুকল লিলি।

হলুদ রঙের অয়েলস্কিন কোট পরেছে লিলি, মুখে বৃষ্টির ফোঁটা। 'কেমন হলো ঘুমটা?' জানতে চাইল সে। রানার হাতে অ্যাম্পুলের বাক্সটা দেখতে পেল সে।

'দাও, ইঞ্জেকশনটা আমি ফুঁড়ে দিই। কেমন লাগছে পা?'

'ভাল নয়।' বসে পড়ল রানা, বাঁ পা-টা তুলে দিল টেবিলের ওপর। 'আকাশের কি অবস্থা?'

'বৃষ্টি হচ্ছে। থ্রী টু ফোর উইন্ড। রেডিওতে বলল, সন্ধের দিকে কেটে যেতে পারে মেঘ।' ইঞ্জেকশন পুশ করল লিলি।

'আমার নিজের একবার দেখা দরকার কি অবস্থা···'

উঠে দাঁড়াল রানা, কিন্তু প্রতিবাদ জানাল লিলি, বলল, 'তুমি অসুস্থ, রানা। বাড়াবাড়ি কোরো না!'

'তাজা একটু বাতাসও দরকার,' বলল রানা। 'তা নাহলে মাথাটা পরিষ্কার হচ্ছে না। ববির সাথে গল্প করো তুমি। ওর কিছু দরকারও হতে পারে।'

কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে ওঠার সময় পায়ে কোন ব্যথা অনুভব করল না রানা। ডেকে উঠে আসতেই খুদে বর্শার মত মুখে বিঁধল বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিরোমাকে। ঢেউগুলো তেমন বিরাট নয়, সেগুলোর মাথায় না চড়ে কেটে দু'ফাঁক করে এগিয়ে চলেছে বোট। পোর্ট সাইডের দিকে, মুহূর্তের জন্যে দিগন্তরেখার কাছে তীর দেখতে পেল রানা। পরমুহূর্তে ভাবল, চোখের ভুল নয় তো?

হুইলহাউসে ঢুকল রানা। চার্ট টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সলোজা। অটোমেটিক পাইলটে রয়েছে বোট।

'কেমন লাগছে তোমার?'

'খুঁড়িয়ে হাঁটছি, কিন্তু বাকি সব ঠিক আছে,' বলল রানা। 'বনেটিকে দেখছি না যে?'

'ইঞ্জিনরুমে ফুয়েল পাম্প করছে।'

হাত তুলে দিগন্তরেখার দিকটা দেখাল রানা। 'ওদিকে কি তীর দেখলাম আমি?'

'ক্রিট,' চার্টের ওপর আঙুল ঠুকল সলোজা। 'সন্ধের দিকে কাপো পাসেরোয় পৌঁছে যাব। অবশ্য আবহাওয়া যদি বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, আর বোটের এই স্পীড যদি বহাল থাকে। ফুলস্পীড দিতে পারছি না তো!'

'সবাই বসে আলাপ করা দরকার,' বলল রানা।

ভুরু কুঁচকে উঠল সলোজার। 'কি ব্যাপারে, রানা?'

'কাপো পাসেরোয় কি ঘটবে।'

'ঠিক আছে। অটোমেটিক পাইলট দেয়া আছে। চলো!'

ডেকে বেরিয়ে এল ওরা। এই সময় ইঞ্জিনরুম থেকে উঠে এল বনেটি। নিচের দিকে রওনা হয়ে সলোজা তাকে পিছু নিতে বলল।

নিচে নেমে এসে টেবিলের চারধারে বসল ওরা। গ্যালি থেকে সবাইকে গরম কফি পরিবেশন করল লিলি।

'বলো, সলোজা,' প্রথম মুখ খুলল রানা, 'কাপো পাসেরোয় কি ঘটবে?'

'আমি তো কোন সমস্যা দেখি না,' গম্ভীর সুরে বলল সলোজা। 'তুমি কিটিকে

ফেরত চাও। মারানজানা তার সৎ-ছেলেকে ফেরত চায়। আমরা একটা চুক্তিতে আসব।'

'কে বলল সমস্যা নেই? আমরা এখন জানি মারানজানা ববিকে মেরে ফেলার জন্যে চায়। খুনটা করার সময় কোন বেয়াড়া সাক্ষী রাখতে চাইবে না সে। গোটা ব্যাপারটা সামলাবার কথা ছিল জালুচির, কিন্তু ভুল করায় সে নিজেই আউট হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সে-কথা মারানজানা জানে না,' বলল লিলি। 'ঠিক হয়ে আছে, আমাদেরকে দেখতে পেলেই রেডিও যোগাযোগ করবে সে। ধরা যাক, করল। রেডিওতে কি মেসেজ আশা করবে সে? জালুচি তাকে জানাবে, ববি এবং বাকি সবাই মারা গেছে—এই তো?'

'যা বলবে পরিষ্কার, সংক্ষেপে বলো!'

'সহজ ব্যাপার। জালুচি নয়, রেডিওতে তার সাথে কথা বলবে তুমি। বলবে, জেল ভাঙার সময় খুন হয়ে গেছে জালুচি।'

'তাতে কি রিয়াকশন হবে মারানজানার?'

'রিয়্যাকশন যাই হোক,' সলোজাকে বলল লিলি, 'ববিকে ফেরত পেতে হলে কিটিকে মুক্তি দেয়া ছাড়া তার কোন উপায় থাকবে না। বে-তে ঢোকার সময় ডেকে নিয়ে আসব আমরা ববিকে, দুর্গ থেকে যাতে মারানজানা তাকে দেখতে পায়। তারপর হাই টেরেসে কিটিকে নিয়ে অপেক্ষা করবে মারানজানা, ববিকে নিয়ে সেখানে যাবে রানা। বন্দী বিনিময় শেষ করে ফিরে আসবে ভিরোমায়।'

তিক্ত হাসল সলোজা। 'মারানজানার সাথে সেই রকমই কথা হয়েছে বটে, কিন্তু সে যে তার কথা রাখবে না এ তো আমরা সবাই জানি। ববিকে সে চায় বটে, কিন্তু জ্যান্ত নয়, চায় তার লাশ। তারমানে, আমাদের মুখ বন্ধ করতে হবে তার। অবশ্যই আমাদেরকে ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ রাখার অনুরোধ করবে না সে।'

লিলির দিকে ফিরল রানা। 'আচ্ছা, বলো তো, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আসলে তুমি কি মনে করেছিলে?'

'তোমার সাহায্য পাবার জন্যে সে যা করেছে সেটা আমি মেনে নিয়েছিলাম,' বলল লিলি। 'কিন্তু তার পরের ঘটনা···' কাঁধ ঝাঁকাল লিলি। 'ববির ব্যাপারে তোমাকে যা বলেছে, আমাকেও তাই বলেছে। সৎ ছেলেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা তার নাকি পবিত্র একটা দায়িত্ব।'

দাঁতে দাঁত ঘষল ওটেলিয়ো, 'বাস্টার্ড!'

'শালাকে···'

বনেটিকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের অনুকূলে। আমরা কতটুকু কি জানি মারানজানার সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।'

'তাই কি?' বলল লিলি। 'ববি মুখ খুলতে পারে, এ ধারণা তার হবে না কেন?'

'হবে না,' বলল রানা। 'কারণ রেডিওতে আমি তাকে বলব, জেল ভাঙার সময় মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে ববি, সেই থেকে ঘোরের মধ্যে আছে। কথাটা

বিশ্বাস না করার কোন কারণ নেই।'

'তার মানে, মারানজানা আশা করবে ববিকে নিয়ে ভিলায় যাবে তুমি, ওখানে কিটির সাথে বিনিময় করবে তাকে?'

'হ্যাঁ।'

'এবং মারানজানা গোলমাল করলে তুমিও তার জন্যে তৈরি থাকবে?'

রানার মুখ খোলার আগেই টেবিলের ওপর দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল সলোজা। বলল, 'এ স্রেফ পাগলামি! এতে আসল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।'

'আসল সমস্যা?' জানতে চাইল রিলি।

'কিটি,' বলল সলোজা। 'গোটা ব্যাপারটাই তাকে নিয়ে। ভেবে দেখেছ, মারানজানা গোলমাল শুরু করলে কিটিরই বিপদ হবে সবার আগে? ভুলে যেয়ো না, হাই টেরেসে থাকবে কিটি। পাহারায় থাকছে প্রাউ পাসোডেনা। ববিকে নিয়ে ওখানে গেলাম আমরা, সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল গোলাগুলি। প্রথম গুলির আওয়াজ কানে যাওয়া মাত্র কিটিকে খুন করবে পাসোডেনা।'

সলোজার কথাই ঠিক, মনে মনে স্বীকার করল রানা।

শান্ত, নিচু গলায় কথা বলল বনেটি। 'এর একমাত্র সমাধান, ভেতরে একজন লোক দরকার আমাদের।'

লিলি বলল, 'কিন্তু তা সম্ভব নয়। সৈকত থেকে রাস্তাটা ছাড়া ভিলায় ওঠার আর কোন উপায় নেই।'

'নেই মানে?' দৃঢ়কণ্ঠে বলল বনেটি, 'নিশ্চয়ই আছে!'

বিস্ময় ফুটে উঠল সবার চেহারায়। কয়েক মুহূর্ত কথা যোগাল না কারও মুখে। সবাই তাকিয়ে আছে বনেটির দিকে।

'বনেটি?' অবিশ্বাসের সাথে জানতে চাইল রানা, 'তুমি বলতে চাইছ ওই খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে পারবে···?'

'ওটা কোন সমস্যাই নয় আমার জন্যে। একটা ছাগলও পারবে।' মামার দিকে ফিরল বনেটি। 'মি. রানা আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন বলে কথা দিয়েছেন, কাজেই ঋণী হবার আগেই কিছুটা ঋণ শোধ করে রাখতে চাই আমি।' রানার দিকে তাকাল সে। 'আমাকে ভাল একটা গান দেবেন আপনি, মি. রানা। হাই টেরেসে উঠে প্রাউ পাসোডেনাকে সামলাব আমি।'

ভাগ্নের গলা জড়িয়ে ধরল সলোজা। 'তোকে নিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে, বনেটি।'

কিন্তু প্রশ্ন তুলল লিলি, 'ববির ব্যাপারটা কি হবে? তার যা অবস্থা, প্ল্যানটা কি তাকে স্যুট করবে? কিংবা, সে কি রাজি হবে?'

কেবিনের দরজা ক্যাচ ক্যাচ করে খুলে গেল। সবাই ঘাড় ফেরাতে দেখল, কবাটে হেলান দিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ববি ইউজিন। জোর করে একটু হাসল সে। 'আপনাদের জন্যে আমি কোন সমস্যা নই, মি. রানা। আমি মারানজানার সমস্যা। মারানজানাও আমার সমস্যা। তার সাথে মুখোমুখি হবার এই সুযোগ আমি কি হাতছাড়া করতে পারি?'

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির কোন বিরাম নেই। কাপো পাসেরোয় পৌঁছুতে খুব বেশি দেরি নেই আর। নিচে ওটেলিয়ো আর ববির সাথে লিলি রয়েছে, হুইলহাউসে রানা, সলোজা আর বনেটি। হুইলহাউসের ডেকে হামাগুড়ি দিয়ে আছে বনেটি, কেউ যাতে ওকে দেখতে না পায়। পরনে ওয়েটস্যুট আর অ্যাকুয়ালাঙ, কোমরের সাথে ঝুলছে ওয়াটারপ্রুফ ক্যানভাস ব্যাগ, তাতে আছে ক্লাইম্বিং বুট আর একটা পিস্তল। চোখে একজোড়া বিনকিউলার তুলে গর্তের ভেতর দিয়ে ভিলার নিচে পাহাড়ের খাড়া গা পরীক্ষা করছে সে। প্যানেল হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে গর্তটা তাকে তৈরি করে দিয়েছে সলোজা।

'যা বলেছিলাম,' বলল বনেটি, 'এই পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা আমার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। এদিকে বে-তে ঢোকার মুখ থেকেই উঠে গেছে পাহাড়ের গা। মাথায় একবার পৌঁছুতে পারলে পিছন দিয়ে টেরেসে ওঠাও পানির মত সহজ।'

'কি রকম সময় লাগবে তোমার?'

চোখে বিনকিউলার তুলে আরেকবার পাহাড়ের গা দেখে নিল বনেটি। 'আধ ঘণ্টার বেশি নয়। আমি বরং রওনা হয়ে যাই।'

'ঠিক আছে। গুডলাক।'

'যীশুর হাতে ছেড়ে দিলাম তোকে,' ফিসফিস করে বলল সলোজা।

বে-তে ঢোকার মুখ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে বোটের স্পীড কমিয়ে আনল সলোজা, পরমুহূর্তে বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে পাহাড়ের দিকে আড়াআড়ি পজিশনে নিয়ে এল ভিরোমাকে। মুখে মাস্ক নামাল বনেটি, রেইলের নিচ দিয়ে গলে ডেক থেকে ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে। পাথরের মত নিচে নেমে গেল সে।

ঘুরে গিয়ে আবার ক্ষুর আকৃতির বে-র দিকে মুখ করল বোট। এই সময় ঘড় ঘড় করে উঠল রেডিও, একটা যান্ত্রিক গলা শোনা গেল, 'কাম ইন, ভিরোমা! কাম ইন!' গলাটা মারানজানার নয়।

হ্যান্ড মাইক তুলে নিয়ে সুইচ অন করল রানা। 'দিস ইজ ভিরোমা।'

'আপনি মি. জালুচি, স্যার?' গলাটা এবার চিনতে পারল রানা। মাইক আটানা কথা বলছে।

'জালুচি মারা গেছে।'

বিস্ময়সূচক একটা আওয়াজ ঢুকল রানার কানে, পরমুহূর্তে অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল মারানজানার গলা, 'মি. রানা, তুমি? বলো, কি খবর!'

'জেল থেকে বেরুবার সময় গুলি খেয়েছে জালুচি। সাথে সাথে মারা যায় সে। ওর সাথে বনেটি আর ওটেলিয়োও।'

অনেকক্ষণ কিছু বলল না মারানজানা। তারপর কর্কশ সুরে জানতে চাইল, 'আমার ছেলে?'

'তার অবস্থাও বেশি সুবিধের নয়। আমরা তাকে এমনিতে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করি, তার ওপর বেরুবার সময় গুলি খায় সে। এই জ্ঞান আছে, এই নেই। ঘোরের মধ্যে কি সব প্রলাপ বকছে মাথা-মুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না।'

প্রবেশ মুখ দিয়ে বে-তে ঢুকল বোট। বয়ার সাথে এখনও বাঁধা রয়েছে সেসনা।

'লিলিকে দাও,' বলল মারানজানা। 'আমার সাথে কথা বলুক।'

মুখ তুলে হাই টেরেসে তাকাল রানা। বলল, 'কিন্তু কিটিকে আমি দেখতে পাচ্ছি না!'

'পাবে,' বলল মারানজানা। 'তার আগে আমি আমার ছেলেকে দেখতে চাই।'

নিচে নেমে এল রানা। লিলিকে ওপরে নিয়ে আসার পথে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিল তাকে। হুইলহাউসে ঢুকে হ্যান্ড মাইক ধরল লিলি। বলল, 'সিনর মারামজানা?'

'জালুচির ব্যাপারটা কি?' সাথে সাথে প্রশ্ন করল মারানজানা।

'খুন হয়েছে,' বলল লিলি। 'বনেটি আর ওটেলিয়োও। গুলি ববিকেও লেগেছে, তবে বেঁচে আছে এখনও। মি. মারানজানা, তাড়াতাড়ি ওকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার...'

'সব হবে,' দ্রুত বলল মারানজানা। 'তার আগে রানাকে বলো, ববিকে ডেকে দেখতে চাই আমি।'

ববিকে নিয়ে আসার জন্যে নিচে নেমে এল রানা। আরও ম্লান হয়ে গেছে ববির চেহারা, হাঁপাচ্ছে। একটু পরপরই কাশছে খুক খুক করে। একটা রীফার জ্যাকেট আর কয়েদীর পা'জামা পরে আছে সে।

'কেমন এগোচ্ছে ব্যাপারটা, মি. রানা?' জানতে চাইল সে।

ডেকে ওঠার পথে সংক্ষেপে সব জানাল রানা। ডেকে উঠে দেখল ক্যানভাসের একটা চেয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছে সলোজা। চেয়ারটায় বসল ববি। হুইলহাউসে ফিরে এসে হ্যান্ড মাইক ধরল রানা। 'সন্তুষ্ট, মারানজানা?'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর মারানজানা বলল, 'সন্তুষ্ট, মি. রানা।'

'এবার কিটিকে দেখব আমি।'

'মুখ তোলো, স্যার!'

চোখে বিনকিউলার তুলতেই লাফ দিয়ে চোখের সামনে চলে এল কিটি। টপ টেরেসের রেলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। চোখে স্থির, শূন্য দৃষ্টি। কিন্তু মুখটা হাসি হাসি। পাশেই লেজ নাড়ছে ডোবারম্যান পিনশার। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কিটি। ওর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল প্রাউ পাসোডেনা। মাথায় খয়েরী রঙের চুল, চাঁদির ওপর মুকুটের আকৃতির খোঁপা করা। পরনে কালো আলখেল্লা ধরনের ঢোলা পোশাক, তার ওপর সাদা অ্যাপ্রন। বাঁকা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'ঠিক আছে,' হ্যান্ডমাইকে বলল রানা। 'এরপর কি?'

'নিচে ল্যান্ডরোভার পাঠাচ্ছি আমি। সবাই আসতে পারো তোমরা, তারপর বিনিময় হবে। তোমার জন্যে সবচেয়ে ভাল বিয়ার আনিয়ে রেখেছি আমি। আমার সারা জীবনে যত লোককে দেখেছি, তোমার মত কাউকে এতটা পছন্দ হয়নি

আমার, মি. রানা। জানতাম, তোমার ওপর আস্থা রাখা যায়। তুমি পারবে, সে-বিশ্বাস আমার আগাগোড়াই ছিল। ধন্যবাদ, মি. রানা।'

হ্যান্ডমাইক রেখে দিয়ে সলোজার দিকে তাকাল রানা। 'বে-তে ঢোকো, সলোজা। তৈরি হও।'

জেটিতে ল্যান্ডরোভার পৌঁছুবার আগেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল ওরা। ক্যানভাস চেয়ারে বসে আছে ববি, তার দু'পাশে রানা আর সলোজা। ওদের দু'জনের প্রত্যেকের ডান কাঁধে ঝুলছে একটা করে উজি গান। রানার হিপ পকেটে রয়েছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটা।

ব্রেক কষে থামল ল্যান্ডরোভার, হাতে স্টার্লিং সাব-মেশিনগান নিয়ে লাফ দিয়ে নিচে নামল গাটো আর বোরো। কোন কথা নয়, যে-যার অস্ত্র রানা আর সলোজার দিকে তাক করে ধরল তারা। ড্রাইভিং সীট থেকে নামল মাইক আটানা। জেটি ধরে এগিয়ে এল সে।

'এসব কি?' কঠোর সুরে জানতে চাইল রানা।

'কারও কাছে কোন অস্ত্র থাকা চলবে না! মি. মারানজানার হুকুম!'

উজি দুটো চেয়ে নিল আটানা, রানার কাছ থেকে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনটাও নিল। ওগুলো ল্যান্ডরোভারের ক্যাবে রেখে আসার জন্যে ফিরে গেল সে। রানার কাছে থাকল শুধু স্টেচকিনটা, শিরদাঁড়ার নিচে, শেষ গিঁটের কাছে লুকানো।

ওই একই জায়গায় সলোজাও একটা রিভলভার রেখেছে। এমন কি লিলিও তার স্ল্যাকসের ওয়েস্ট ব্যান্ডে গুঁজে নিয়েছে একটা অটোমেটিক। সোয়েটারের নিচে ঢাকা পড়ে আছে সেটা।

বোরো আর গাটো সাহায্য করল ওদেরকে, ধরাধরি করে ল্যান্ডরোভারের পিছনে তোলা হলো ববিকে। ক্যানভাসের চেয়ারটা আগেই নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে বসল সে। তার চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল রানা, একশো তিন সাড়ে তিনের কম নয় জ্বর। ভিলায় যাবার পথে মাত্র একবার কোটের ভেতর তাকে হাত ঢোকাতে দেখল রানা। হাতটা বের করল ববি, আঙুলগুলোয় তাজা রক্ত।

গেট পেরিয়ে উঠানে ঢুকল ল্যান্ডরোভার। প্রথম চমকটা এখানেই অপেক্ষা করছিল। ওদের অপেক্ষায় বাগানে ওঠার সিঁড়ির নিচে ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মারানজানা।

গাড়ি থেকে নামার সময় কিটিকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। হাই টেরেসের শেষ প্রান্তে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। পাশে কুকুরটা। একটু দূরেই দেখা গেল প্রাউ পাসোডেনাকে। রেলিঙের গায়ে ভর দিয়ে রয়েছে। নিচের দিকে ঝুঁকে উঠানে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখছে। বনেটির ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও।

ক্যানভাসের চেয়ার থেকে তুলে নিচে নামানো হলো ববিকে। রানা আর সলোজা তাকে বয়ে নিয়ে এল। মাথাটা ঝুলে পড়ছে ববির, থুতনি ঠেকে আছে বুকে। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে। তার মুখের কাছে কান নামাল রানা,

শুনতে পেল পরিষ্কার। 'আপনারা আমাকে ওর কাছে নামিয়ে দিয়ে পিছিয়ে যান, মি. রানা। প্লীজ! ওর সাথে একা কথা বলতে চাই আমি। যতক্ষণ পারি আপনাদের সময় পাইয়ে দেবার চেষ্টা করব।'

মারানজানার দশ ফিট সামনে আগেই ক্যানভাসের চেয়ারটা রাখা হয়েছে। তাতে বসিয়ে দেয়া হলো ববিকে। ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল রানা আর সলোজা। ছড়ির ওপর ভর দিয়ে ববির দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল মারানজানা। 'কেমন আছ, মাই বয়? তোমাকে দেখে কি আনন্দই যে লাগছে আমার···'

এগিয়ে গিয়ে ক্যানভাস চেয়ারের পাশে দাঁড়াল আটানা। হাতের স্টার্লিং সাব মেশিনগানটা রানা আর সলোজার দিকে তাক করে ধরা।

ধীরে ধীরে মাথা তুলল ববি। তীব্র যন্ত্রণায় চেহারাটা নীল হয়ে গেছে। দেখে বোঝা যায়, শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে সবটুকু শক্তি দিয়ে সচেতন থাকার চেষ্টা করছে সে।

চোখের কোণ দিয়ে বনেটিকে দেখতে পেল রানা। টেরেসের শেষ প্রান্তের কাছে, পাঁচিলের মাঝামাঝি জায়গায়।

ববিকে কি যেন বলল মারানজানা। সাথে সাথে আতঙ্কিত একটা চিৎকার বেরিয়ে এল ববির গলার ভেতর থেকে। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'দুঃখিত, মি. রানা! সময় নেই!'

রীফার কোটের ডান পকেট থেকে গ্রেনেড ধরা ববির হাতটা বেরিয়ে এল। মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে রইল সব। পরমুহূর্তে ছুটতে শুরু করল মারানজানা। হাত ফসকে পড়ে গেল একটা ছড়ি। গ্রেনেডটা ছুঁড়ল না ববি। প্রচণ্ড আওয়াজ হলো বিস্ফোরণের। আটানা সহ অপর দু'জন কংক্রিটের উঠান থেকে শূন্যে উঠে পড়ল।

এরই মধ্যে সলোজার হাতে রিভলভার বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু এত তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজন ছিল না। বোরো আর গাটো স্তম্ভিত পাথর হয়ে গেছে। রক্ত, ছেঁড়া হাত-পা আর থেঁতলানো মাংসের দিকে তাকিয়ে আছে তারা।

বিস্ফোরণের আওয়াজ হতেই ছুটতে শুরু করেছে রানা। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ টপকে মুখ তুলে হাই টেরেসে তাকাল ও, দেখল, কিটির দিকে ছুটে আসছে প্রাউ পাসোডেনা। হাতে পিস্তল, কিন্তু বনেটি এখনও ঝুল-বারান্দার নিচে রয়েছে। দেরি হয়ে গেছে বুঝতে পেরে সমগ্র অস্তিত্বে একটা থরথর কাঁপুনি অনুভব করল রানা।

কিটির কাছ থেকে দশ ফিট দূরে দাঁড়াল প্রাউ পাসোডেনা। শান্ত ভাবে লক্ষ্যস্থির করল সে। ট্রিগার টিপে দিল। আশ্চর্য! ঠিক এমনি সময় লাফ দিয়ে তার বুকে উঠে গলা কামড়ে ধরল ডোবারম্যান পিনশারটা।

মাত্র একবার চেঁচিয়ে উঠল পাসোডেনা। পরমুহূর্তে তাকে নিয়ে রেলিঙ টপকে নিচের দিকে পড়তে শুরু করল কুকুরটা। একমুহূর্ত পরই নিচের ঝুল-পাথরের আড়ালে হারিয়ে গেল দু'জন।

তিনটে করে ধাপ টপকে উঠতে শুরু করল রানা আঁধার। বনেটির সাথে এক

সঙ্গে টেরেসে পৌঁছুল ও। ওর দিকে ঘুরে দাঁড়াল কিটি। একটা হাত সামনে বাড়ানো।

'কে এখানে? এসব কি ঘটছে?'

'কিটি,' বলল রানা, 'আমি···আমি রানা!'

কিটির চেহারায় বিমূঢ় একটা ভাব ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে সামনে এগোল সে। হাত দুটো আরও বাড়িয়ে দিয়ে রানার হাত স্পর্শ করল। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

'আংকেল!' খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠল কিটি। 'এত দেরি করলে কেন!'

রানার বুকের ভেতর থেকে একটা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল কিটি। তার পিঠে একটা হাত রাখল রানা।

'কি হচ্ছে এসব, আংকেল? এত গোলাগুলির শব্দ কেন? আমার ভয় করছিল খুব।'

'আর কোন ভয় নেই,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'এসে পড়েছি আমি। তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব আজই।'

এক ঘণ্টার মধ্যে নিজেদের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিয়ে আবার ভিরোমায় চাপল ওরা। পরদিন ভোরে পালার্মো বন্দরে ভিড়ল বোট। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিটিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায় রানা। কিন্তু তার আগে বনেটির ব্যাপারটা রয়েছে, কাজেই সন্ধের ফ্লাইটে টিকিট কিনল সে। ওটেলিয়োকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হলো, বাকি সবার জন্যে তার ওখানেই রাজকীয় ব্যবস্থা করল সলোজা।

বিকেলের দিকে বিশেষ একটা নাম্বারে ডায়াল করে কয়েকটি কথা বলল রানা। দশ মিনিটের মধ্যে গেটের সামনে খোদ মাফিয়া চীফের গাড়ি এসে থামতে দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল বনেটির চোখ, দিব্যি হাসতে হাসতে তাতে চেপে চলে গেল মাসুদ রানা।

চীফকে ঠাণ্ডা করতে আধঘণ্টার বেশি লাগল না রানার। আরও মিনিট দশেক লাগল তাকে ছোঁড়া ছুঁড়ির বিয়েতে রাজি করাতে। বনেটির মনে যে শয়তানী নেই, সত্যি সত্যিই বিয়ে করে গৃহিণী করতে চায় মেয়েটিকে, মেয়েরও পুরোপুরি মত আছে এ বিয়েতে; তদুপরি সলোজা পরিবারে মেয়ের বিয়ে দিলে তার পারিবারিক সম্মান যে বাড়বে বই কমবে না···এসব বুঝতে বেশি সময় নিল না ঘড়েল চীফ। রানার টেলিফোন পেয়ে বনেটিকে সাথে নিয়ে চীফের বাড়িতে এসে হাজির হলো সলোজা। বিয়ের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব থেকে শুরু করে দিন-তারিখ ঠিক হতে সময় লাগল আরও দশ মিনিট। তারপর উঠে দাঁড়াল সবাই। বুড়ো আঙুল দিয়ে চীফকে দেখিয়ে সবাইকে শুনিয়ে ফিসফিস করে জানতে চাইল সলোজা, 'রানা! তাজ্জব কারবার! বানচোতকে রাজি করালে কি করে?'

গালি শুনে হা হা করে হাসল মাফিয়া চীফ, দুই বেয়াই জড়িয়ে ধরল দু'জনকে। বনেটিকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, ও ফিরতেই চলে এল ওরা

সলোজার বাড়িতে, সন্ধের ফ্লাইট ধরতে হলে কিটিকে নিয়ে এখুনি এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হওয়া দরকার।

লিলিও এল সি-অফ করতে। কিটি আর লিলিকে কথা বলতে দিয়ে টেরেসে চলে এল রানা ও সলোজা।

'দারুণ মজা হলো কিন্তু, তাই না, রানা?' সস্তা ইজিপশিয়ান চুরুট ধরিয়ে বলল সলোজা।

'তা বটে!' হাসল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'কর্তৃপক্ষ কিভাবে নেবে ব্যাপারটা বলো তো?'

'কিভাবে আবার? বিস্ফোরণে মারা গেছে মারানজানা, কাজেই ধরে নেবে ওরা তার কোন পুরানো বন্ধু প্রতিশোধ নিয়েছে। আর যাই হোক, শত্রুতে পরিণত হওয়া বন্ধুর তো কোন অভাব ছিল না তার!'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

একমুখ কটু ধোঁয়া ছাড়ল সলোজা। দুই হাতে ধরল রানার দু'কাঁধ। নিচু গলায় বলল, 'সবকিছুর জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, রানা।'

'হয়েছে!' লজ্জা ঢাকার জন্যে বলল রানা, 'লজ্জা দেয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। লিলির ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?'

'ও আর ভাবার কি আছে? তুমি যা বলেছ তাই হবে।' একগাল ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর ব্যস্ত হয়ে বলল, 'পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে।' টেরেস থেকে নেমে গেল সলোজা। একটু পরেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল লিলি।

'কিছু বলবে, রানা?'

'তোমার টাকা-পয়সার কি অবস্থা, লিলি?'

'পালার্মোয় আমার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। আপাতত চলে যাবে। সলোজা আমাকে একটা চাকরির অফার দিয়েছে, বলে দিয়েছি, করব।'

'কি চাকরি?' চাকরিটা যে ওরই অনুরোধে দিচ্ছে সলোজা তা বেমালুম চেপে গেল রানা।

'ওর বীচ ক্লাবে স্টেজ ডিজাইনারের কাজ। ভাল বেতন। মনে হচ্ছে, করতে ভাল লাগবে আমার।'

'শুনে খুশি হলাম…'

'কিন্তু তুমি কি করবে, রানা?' রানার একটা হাত ধরে জানতে চাইল লিলি।

'আমি? ঠিক নেই। আসলে…জানি না।'

'বনেটির বিয়েতে আসবে না?'

'উঁহুঁ, ব্যস্ত থাকব।'

'কোথায়?'

'স্পেনের কেপ ডি গাটার কোন একটা নির্জন ভিলার টেরেসে।'

'যাহ্, পাজি কোথাকার!' লাল হয়ে উঠল লিলি। 'সত্যিই আসছ তুমি ফিরে?'

'কথা দিয়েছি, মনে নেই?'

দারুণ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লিলির মুখটা। পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে

চট করে চুমো খেল রানার গালে। তারপর বলল, 'তার মানে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ!'

'সে তো কবেই…'

কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে ভেবে পেল না লিলি, রানার হাতটা ঠোঁটের কাছে তুলে চুমো খেল, তারপর চাপা কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ!'

লাউডস্পীকারের মাধ্যমে প্যাসেঞ্জারদের ডাক এল।

'দেখা হবে,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল রানা।

* * * *